ত্রিশ লক্ষ শহিদ
বাহুল্য নাকি বাস্তবতা

আরিফ রহমান

ত্রিশ লক্ষ শহিদ বাহুল্য নাকি বাস্তবতা | আরিফ রহমান

সময়

‘এ বইটি লেখার সময় আমি কাছ থেকে দেখেছি আরিফের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নিষ্ঠা, মমতা, আবেগ এবং বিশ্বস্ততা। দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে তার মতো নতুন প্রজন্মের হাত দিয়েই যেন রচিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়। তার এই বইটি ঘোর অমানিশায় আলোকবর্তিকা হয়ে বিরাজ করবে, এই আশা মোটেও বাতুলতা নয়।’

–অভিজিৎ রায়

‘ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়,
তোমার মাঝেই বেঁচে থাক ত্রিশ লক্ষ শহিদ।’

–ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

‘শহিদ সন্তান হওয়ায় ছোটকাল থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ধারার লোকেদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কুতর্ক আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে তুলতো। এই বইটি সেই লোকদের কুতর্কের মুখে এক চপেটাঘাত। আর আমার কাছে এক প্রশান্তির পরশ। এ বই আমাকে আশ্বস্ত করে যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্ষায় সচেষ্ট।’

-নুজহাত চৌধুরী

বাঙালি বড় বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। নিজেদের ইতিহাস ভুলে বসে থাকে। বিকৃত করে অহর্নিশি। বাঙালি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে শহিদের সংখ্যা নিয়ে, স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিয়ে– এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে বাঙালি বিতর্ক করে না। বিষয়টি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের এবং অস্বস্তির।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় গর্বের ফসল মুক্তিযুদ্ধ আর এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সম্ভবত শহিদের সংখ্যা নিয়ে। বলা হয়ে থাকে বঙ্গবন্ধু নাকি লক্ষ এবং মিলিয়নের পার্থক্য না বুঝে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত এই অপপ্রচারটির সঠিক জবাব দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। এখানেই এই গ্রন্থটির সার্থকতা। এই বইটিতে সংকলন করা হয়েছে প্রচুর পেপার কাটিং, মুক্তিযুদ্ধের সময় কার ছবি, গণহত্যার খতিয়ান, ডেমোগ্রাফি থেকে পাওয়া জন্ম-মৃত্যুহার সংক্রান্ত ডাটা, বীরাঙ্গনাদের জবানবন্দি, পাকিস্তানি জেনারেলদের বই থেকে উদ্ধৃতিসহ অসংখ্য রেফারেন্স। এসব থেকে যে কোনো মানুষ পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারবে ১৯৭১ সালের গণহত্যায় শহিদের প্রকৃত সংখ্যা কত। বইটির শেষ কিছু অধ্যায়ে বেশ কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর অপরাধ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলমান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ২০১৩ সালে সংগঠিত শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে দেশবিরোধী চক্রের কুযুক্তিগুলো খণ্ডন করা হয়েছে।

কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়কে জানার জন্য কিংবা ওই সময়কার ঘটনা প্রবাহকে ব্যাখ্যা করার জন্য সমসাময়িক না হয়েও যে শুধুমাত্র তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বহুমুখী পর্যালোচনার মাধ্যমে চমৎকারভাবে তা উপলব্ধি ও বর্ণনা করা সম্ভব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তরুণ মুক্তিযুদ্ধ বিশ্লেষক আরিফ রহমান ও তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা। ১৯৯২ সালের ১২ই মে ঢাকাতে জন্ম নেওয়া এই লেখকের লেখালেখি করছেন বিগত ছয় বছর ধরে। এনজিও চাকুরে বাবা, গৃহিণী মা আর একমাত্র ছোট বোনকে নিয়ে সাজানো সংসার। ছেলেবেলায় বাবার সাহচর্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইপত্রসহ সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন বই পুস্তক পড়ায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংকলন ও তা পর্যালোচনার মাধ্যমে যুক্তিনির্ভর সাবলীল লেখার জন্য অনলাইন ভিত্তিক গণমাধ্যমগুলোতে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এর মধ্যেই। দেশের প্রায় সবকটি ব্লগিং প্লাটফর্মে এবং বিডি নিউজে কলাম লেখার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় তার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। পেশাগত জীবনে তিনি এখনও ছাত্র। ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচ এসসি শেষ করে ভর্তি হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু কিছুদিন সেখানে কাটিয়েই তিনি ফিরে আসেন ঢাকাতে, ভর্তি হন জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে। বর্তমানে তিনি বস্ত্র প্রকৌশলে চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছেন।

ত্রিশ লক্ষ শহিদ : বাহুল্য নাকি বাস্তবতা
আরিফ রহমান
© লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৬

সময়

সময় ১১০২

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

কম্পোজ
লেখক কর্তৃক কম্পোজকৃত

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য: ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

TRISH LAKKAH SAHEED BAHULLO NAKI BASTOBOTA (Three Million Saheed Regression or Riality) by Arif Rahman. First Published: February Book Fair 2016 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.

Web: www.somoy.com E-mail: info@somoy.com

Price: Tk. 325.00 only

ISBN 978-984-91798-8-7 Code: 1102

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন)
ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে : www.rokomari.com, www.boi-mela.com

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

উৎসর্গ

সেই সব মায়েদের
যারা বিপদটা জেনেও
নিজের সন্তানদের ছুটে যেতে দিয়েছেন-
'৭১-সালে মুক্তিযুদ্ধে,
'৯২-সালে গণআদালতে,
'১৩-সালে শাহবাগে...

সূচি

১) বঙ্গবন্ধু কি সত্যিই তিন লাখ বলতে গিয়ে তিরিশ লাখ বলেছিলেন?

২) যুদ্ধ যখন চলছিলো বিদেশী পত্র-পত্রিকা তখন যা লিখছিল শহিদের সংখ্যা নিয়ে

৩) আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং স্বীকৃত গবেষণাপত্রে একাত্তরের শহিদের সংখ্যা

৪) যেই হারিয়ে যাওয়া ৬৫ লাখ মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি

৫) পৃথিবীময় গণহত্যার সাথে আমাদের তুলনা

৬) শরণার্থী শিবিরের শহিদেরা

৭) কেন তারা এতো ধর্ষণ করল?

৮) নির্যাতিত নারীর সংখ্যা হতে পারে ছয় লক্ষাধিক

৯) কিছু নির্বাচিত বীরাঙ্গনাদের কথা

১০) কাদের মোল্লার আসল নকল : একটি নির্মোহ অনুসন্ধান

১১) 'ভাষাসৈনিক গোলাম আযম': একটি গোয়েবলসীয় প্রচারণার ব্যবচ্ছেদ

১২) কেন আজও পাকিস্তানকে ঘৃণা করতে হয়?

১৩) 'কম্যান্ডার রেস্পন্সিবলিটি' বনাম 'কাকে হত্যার দায়ে মুজাহিদের ফাঁসি?'

১৪) হতভাগী ভাগীরথী...

রিপোর্ট ১৯৭১

আসাদ চৌধুরী

প্রাচ্যের গানের মতো শোকাহত, কম্পিত চঞ্চল
বেগবতী তটিনীর মতো স্নিগ্ধ, মনোরম
আমাদের নারীদের কথা বলি, শোনো।
এসব রহস্যময়ী রমণীরা পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে
বৃক্ষের আড়ালে সরে যায়-
বেড়ার ফোঁকর দিয়ে নিজের রন্ধনে
তৃপ্ত অতিথির প্রসন্ন ভোজন দেখে
শুধু মুখ টিপে হাসে।
প্রথম পোয়াতী লজ্জায় আনত হয়ে
কোঁচড়ে ভরেন অনুজের সংগৃহীত কাঁচা আম, পেয়ারা, চালিতা-
সূর্যকেও পর্দা করে এসব রমণী।
অথচ যোহরা ছিলো নির্মম শিকার
সকৃতজ্ঞ লম্পটেরা
সঙ্গীনের সুতীব্র চুম্বন গেঁথে গ্যাছে-
আমি তার সুরকার- তার রক্তে স্বরলিপি লিখি।

মরিয়ম, যিশুর জননী নয় অবুঝ কিশোরী
গরীবের চোমুহনী বেথেলহেম নয়
মাগরেবের নামাজের শেষে মায়ে-ঝিয়ে
খোদার কালামে শান্তি খুঁজেছিলো,
অস্ফুট গোলাপ-কলি লহুতে রঞ্জিত হলে
কার কী বা আসে যায়।
বিপন্ন বিস্ময়ে কোরানের বাঁকা-বাঁকা পবিত্র হরফ
বোবা হয়ে চেয়ে দ্যাখে লম্পটের ক্ষুধা,
মায়ের স্নেহার্ত দেহ ঢেকে রাখে পশুদের পাপ।
পোষা বেড়ালের বাচ্চা চেয়ে-চেয়ে নিবিড় আদর
সারারাত কেঁদেছিলো তাহাদের লাশের ওপর।

এদেশে যে ঈশ্বর আছেন তিনি নাকি
অন্ধ আর বোবা

এই বলে তিন কোটি মহিলারা বেচারাকে গালাগালি করে।
জনাব ফ্রয়েড,
এমন কি খোয়বেও প্রেমিকারা আসে না সহজ পায়ে চপল চরণে।
জনাব ফ্রয়েড, মহিলারা
কামুকের, প্রেমিকের, শৃঙারের সংজ্ঞা ভুলে গ্যাছে।
রকেটের প্রেমে পড়ে ঝরে গ্যাছে
ভিক্টোরিয়া পার্কের গির্জার ঘড়ি,
মুসল্লীর সেজদায় আনত মাথা
নিরপেক্ষ বুলেটের অন্তিম আজানে স্থবির হয়েছে।
বুদ্ধের ক্ষমার মূর্তি ভাঁড়ের মতন
ভ্যাবাচেকা খেয়ে পড়ে আছে, তাঁর
মাথার ওপরে
এক ডজন শকুন মৈত্রী মৈত্রী করে
হয়তো বা উঠেছিলো কেঁদে।

র‍্যাঁবো, পাউন্ড চোরের মতন
পা-টিপে পা-টিপে জ্যোতির্ময়
স্যারের কেলাস থেকে চলে গ্যালো।
কাচের গ্লাসের মতো ভেঙে গ্যালো ছাত্রাবাস।
পৃথিবীর সব চিন্তা কাগজের চেয়েও দ্রুত পুড়ে গ্যালো,
বারুদের গন্ধে ধন্য গ্রন্থাগার ব্যান্ডেজে সুন্দর।

জনাব উথান্ট,
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ।
আমাকে দেবেন, গুরু, দয়া করে তার ঠিকাদারী?
বিশ্বাস করুন রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্নহারে একমাত্র আমি দিতে পারি
যদি চান শিশুর গলিত খুলি, দেওয়ালে দেওয়ালে শিশুদের রক্তের আল্পনা
প্লিজ, আমাকে কন্ট্রাক্ট দিন।
দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ্য জবান শিখে রিপোর্ট লিখেছি- পড়, পাঠ কর।
কুড়ি লক্ষ আহতের আর্তনাদ থেকে
ঘৃণাকে জেনেছি- পড়, পাঠ কর।
চল্লিশ হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে
জুলুমের সবক নিয়েছি- পড়, পাঠ কর।

দুঃখের স্মৃতিতে ডোবা আশি লক্ষ শরণার্থী
শিখিয়েছে দীর্ঘশ্বাসে কতোটুকু ক্রোধ লেখা থাকে।
কোলকাতার কবির মতো কে পারে শোনাতে
'আমি তোর জন্ম সহোদর?'

অনাহূত বিবেকের ভ্রাম্যমান স্থায়ী প্রতিনিধি হয়ে
ক্লান্তিহীন, বিশ্রামবিহীন আমি ছুটে যাই শান্তির সভায়
কখনো দিল্লীতে, মস্কো, লন্ডন, প্যারীর
জনাকীর্ণ সমাবেশে আমি খুঁজি একজন রাসেলের মুখ,
প্রেমের লিপিকা পড়ি জেনেভার জুরীদের কাছে-
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলো রেখে
চলে আসি ক্যনাডার বিশাল মিছিলে স্লোগান শোনাতে।
মানুষের জয় হোক, নিপীড়িত জনগণ জয়ী হোক অন্তিম সমরে।
অসত্যের অন্যায়ের পরাজয়ে খুশি হোক বিশ্বের বিবেক,
পলাতক শান্তি যেন ফিরে আসে আহত বাংলার ঘরে ঘরে।

(রচনাকাল : ৫ অক্টোবর ১৯৭১)

ভূমিকা

ত্রিশ লক্ষ শহিদ : বাহুল্য নাকি বাস্তবতা

১৯৭৮ সালের দিকে আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার পিএইচডি করছি তখন স্টীভ মোজলে নামে একজন গবেষক মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বাংলাদেশ সম্পর্কে বাস্তব কিছু ধারণা নেয়ার জন্য সে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে আমাকে খুঁজে বের করেছিল। নতুন ভাষা শেখার তার এক ধরনের বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল এবং আমি তাকে কাজ চালানোর মতো বাংলা শিখিয়ে দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের জন্য তার এক ধরনের মমতার জন্ম হয়েছিল তাই একাধিকবার এখানে ফিরে ফিরে এসেছে।

স্টীভ মোজলের সঙ্গে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশ নিয়ে তার অভিজ্ঞতা সে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতো। তার একটি কথা শুনে সে সময়ে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। সে বলেছিল, ১৯৭১ সালে তোমাদের দেশে যে ভয়ংকর গণহত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ, দেশত্যাগ, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে সেটা এত অবিশ্বাস্য যে আজ থেকে দশ বিশ বৎসর পর পৃথিবীর কেউ এটি বিশ্বাস করবে না। মুক্তিযুদ্ধের পর তখন মাত্র সাত আট বছর পার হয়েছে, আমি তাই স্টীভ মোজলের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য, এই সত্যটির কথা পৃথিবীর মানুষ ভুলে যাবে এটি কিছুতেই হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের চার যুগ পার হওয়ার আগেই আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছি স্টীভ মোজলের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর কিছু কিছু গণহত্যা পশ্চিমা জগৎ জোর গলায় প্রচার করতে চায় কিছু কিছু গণহত্যা নিয়ে তাদের আগ্রহ নেই। আইরিশ চ্যাংয়ের লেখা 'রেপ অফ নানকিং' বইটির ভূমিকা পড়লে মনে হয় তিনি যেন আমাদের দেশের ঘটনাটি নিয়েই তার হতাশা ব্যক্ত করছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা বলতে গেলে কিছু হয়নি বরং শর্মিলা বোসের মতো জ্ঞান পাপীদের দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে গবেষণা করানো হচ্ছে।

আমাদের দেশের সত্যটুকু আমাদেরই প্রচার করার কথা কিন্তু এই দেশে মিলিটারি শাসনের সময় ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটি হয়েছে। একাধিক প্রজন্মের জন্ম হয়েছে যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস না জেনে বড় হয়েছে, অপপ্রচার বিশ্বাস করেছে এবং চোখে

আঙুল দিয়ে দেখানোর পরও তারা সত্যকে খুঁজে বের না করে নাকি কান্না কেঁদে অনুযোগ করেছে, প্রকৃত সত্য না বলে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে বলে তারা জানে না একাত্তরে কী হয়েছিল। আমরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছিলাম এই দেশের কয়েক প্রজন্মকে আবার নতুন করে পাকিস্তানী মিলিটারি আর তাদের এ দেশীয় অনুচরদের গণহত্যা, ধর্ষণ আর ধ্বংসযজ্ঞের কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাস আবার নতুন করে বলতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখার কথা কিন্তু আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য এই দেশের সকল বুদ্ধিজীবী সেই দায়িত্ব পালন করতে রাজি না। 'নিরপেক্ষতা', 'বাক স্বাধীনতা' এ রকম বড় বড় শব্দ ব্যবহার করে তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলোর মূল ধরে টানাটানি শুরু করেছেন।

ঠিক কী কারণ জানা নেই সাদা চামড়ার প্রতি আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীর এক ধরনের দাসসুলভ আনুগত্য আছে। বছরখানেক আগে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মানুষের সংখ্যা নিয়ে একজন সাংবাদিকের উক্তির জন্য তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত শাস্তি দিয়েছিল, এই দেশে এ রকম ঘটনা কিংবা এর কাছাকাছি ঘটনা অনেকবার ঘটেছে কিন্তু কখনই আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সেটা নিয়ে ব্যস্ত হননি। কিন্তু সম্ভবত এবারের মানুষটি সাদা চামড়া হওয়ার কারণে একজন নয় দু'জন নয় পঞ্চাশ জন বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী তার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের অত্যন্ত সুলিখিত বক্তব্যের চাছা ছোলা বাংলা অনুবাদ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক সন্দেহ প্রকাশ করে একটা বিতর্ক তৈরি করার অধিকার দিতে হবে! এই বিষয়গুলো আমাকে আহত করে কিন্তু বাংলাদেশের স্বনামধন্য এত বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিকে অস্বীকার করার সাধ্যি কার আছে?

এরপরের ঘটনাটি অবশ্য রীতিমতো কৌতুকের মতো। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যখন এই বুদ্ধিজীবীদের তাদের বিবৃতিকে ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়েছে তখন হঠাৎ করে প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীর আদর্শ এবং অধিকারের জন্য বুক ফুলিয়ে সংগ্রাম করার সাহস উবে গেল এবং তারা বিনাশর্তে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রীতিমতো হুড়োহুড়ি শুরু করে দিলেন। এই দেশের যে বুদ্ধিজীবীরা এ রকম একটি বিষয়ে এ রকম কঠিন বিবৃতি দিয়ে চোখের পলকে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুরু করে দেন তাদের জন্য নিজের ভেতরে সম্মানবোধ বজায় রাখা খুব কঠিন।

যে বুদ্ধিজীবীরা এই দেশের তরুণ প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা দেবেন তারাই যদি উল্টো তাদের বিভ্রান্ত করতে শুরু করেন তাহলে আমার হতাশা অনুভব করা উচিৎ ছিল, কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র হতাশ নই। তার কারণ একদিকে আমি যে রকম বিভ্রান্ত খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীদের দেখছি ঠিক সে রকম অন্যদিক দিয়ে নতুন প্রজন্মের কিছু তরুণদের দেখছি যাদের ভেতর নিজের দেশ নিয়ে কোন বিভ্রান্তি নেই। মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসায় তাদের কণামাত্র খাদ নেই। তারা তরুণ কিন্তু অন্য অনেক তরুণের

মতো তারা শুধু আবেগকে পুঁজি করে কথা বলে না। তারা তাদের আগ্রহের বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করে, গবেষণা করে। যারা মুক্তিযুদ্ধকে নিজের চোখে না দেখেও সেটিকে শুধু মস্তিষ্কে নয় হৃদয়েও ধারণ করে। যারা এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করেছে। 'আরিফ রহমান' ঠিক সেই রকম একজন তরুণ, যে কাজটি এই দেশের বড় গবেষকদের করা উচিৎ ছিল সেই কাজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হয়েও সে করে ফেলার সাহস পেয়েছে। 'ত্রিশ লক্ষ শহিদ : বাহুল্য নাকি বাস্তবতা' নামে এই বইয়ের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মানুষের সংখ্যা এবং আনুষঙ্গিক যে সব বিষয় নিয়ে এই দেশে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে লিখেছে। সম্ভাব্য সকল তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, বিশ্লেষণ করেছে এবং সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। এই বইটিতে সে অসংখ্য তথ্যসূত্র দিয়েছে অনেক ছবি সংযোজন করেছে, তালিকা তুলে ধরেছে। দেশদ্রোহীর যে দলটি এককভাবে মিথ্যাচার করে যে মিথ্যাগুলোকে প্রায় বিশ্বাসযোগ্য করে ফেলেছিল আরিফ রহমান সেই মিথ্যাগুলো সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছে। যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাডেমিক গবেষণা করবেন তারাও এই বইয়ের অনেক তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।

আমি আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই তরুণ গবেষক মুক্তিযুদ্ধকে নিজের গবেষণার বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কাজ করবে। পৃথিবীর তথ্য ভাণ্ডারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাডেমিক গবেষণার যে শূন্যতা আছে সেই শূন্যতা পূরণ করবে।

পঞ্চাশ জন 'নিরপেক্ষ' বুদ্ধিজীবী আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আমাকে যেটুকু মর্মাহত করেছিল, একজন তরুণ ছাত্র আরিফ রহমান একা আমার মনের সেই পুরো কষ্টটুকু দূর করে দিয়েছে। তার জন্য আমার অভিনন্দন।

তার জন্য আমার ভালোবাসা।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

-১৬/১/২০১৬

'১৯৭১ সালের যুদ্ধটা নিয়ে সবসময়ই একটু বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়। সে সময় এমন বড় কিছুই হয় নাই, সেনা বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটু সায়েস্তা করেছে এই যা। ভারত ষড়যন্ত্র করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলমান কান্ট্রিকে ভেঙ্গে দুই ভাগ করেছে। যারা দাবী করেন ৭১'রের গণ্ডগোলের সময় তিরিশ লক্ষ মানুষ মারা গেছে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। মাত্র ১৫-২০ হাজার সৈনিকের পক্ষে তিরিশ লাখ খুব করা অসম্ভব। ৯২ হাজার সৈনিকের যে হিসাব আমাদের দেখান হয় সেটা মিথ্যাচার, তখন সৈনিক সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ হাজার। এই সৈনিকদের পক্ষে এত অল্প দিনে খুব বেশী হলে ২০-২৫ হাজার বিচ্ছিন্নতাবাদীর মৃত্যু ঘটেছিল। শেখ মুজিব দেশে আসার সময় বিমানবন্দরে তাকে বিদেশী সাংবাদিকেরা যখন ক্ষয়ক্ষতির কথা জিজ্ঞাসা করে তখন অশিক্ষিত মুজিব মৃতের সংখ্যা 'থ্রি লাখ' বলতে গিয়ে 'থ্রি মিলিয়ন' বলে ফেলেন। সেই থেকে দেশের সব মানুষ এই সংখ্যাটাকে সঠিক ধরে নিয়েছে যার আসলে কোন ভিত্তি নাই।

একই কথা ধর্ষণের ক্ষেত্রেও খাটে। আমাদের দেশে অনেকেই দাবী করেন তখন নাকি ২ লাখ ধর্ষণ হয়েছিল। বলেন এটা কি সম্ভব, একজন মুসলমান কি কখনো ধর্ষণ করতে পারে। দুই একটি ধর্ষণ যে হয় নি তা না। তবে যুদ্ধের সময় কিছু ধর্ষণ তো হবেই, এটাই বাস্তবতা। সৈনিকেরা আছেন তাদের পরিবার থেকে অনেক দূরে, অমুসলিম নারীরা বেগানা হয়ে সৈনিকদের সামনে ঘোরাঘুরি করলে দুই একট ধর্ষণ তো হতেই পারে, তাই বলে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ির কিছু নাই। মুক্তি বাহিনীও অনেক ধর্ষণ করেছে।

যুদ্ধের সময় যা হয়েছিল সেটা যুদ্ধের সময়ই শেষ হয়ে গিয়েছিল সেটা নিয়ে টানাটানি করা অর্থহীন, অথচ এই সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নামের একটা সাজানো নাটক করে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জামায়াতে-ইসলামের মহান নেতা কর্মী, ইসলামের সৈনিকদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলা ঠুকে তাদের নাজেহাল করছে। এই সরকার এবং তাদের নাস্তিক দোসরেরা এই দেশে ইসলাম কে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাননি অধ্যাপক গোলাম আযমের, আলামা দেলোয়ার হোসেন সাইদী, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের মোল্লার মত আরও অনেক বিশ্ব বরেণ্য ইসলামিক ব্যাক্তিত্ব।

অধ্যাপক গোলাম আযম যে স্বাধীনতা বিরোধী ব্যাক্তি নন তার প্রমাণ ভাষা আন্দোলনে তার অপরিসিম অবদান। একজন ভাষা সৈনিক কি কখনো স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে। অধ্যাপক গোলাম আযম আসলে চেয়েছিলেন ভারতের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হতে, সে সময় যে কোন মুসলমান এটাই চাইত। এবং তার চিন্তা একদম ঠিক ভাবে মিলে গেছে, স্বাধীনতার পর ভারতের আগ্রাসন দিন দিন বেড়েই চলছে। গোলাম আযম সাহেব যে ভাষা সৈনিক সেটাই প্রমাণ করে তিনি স্বাধীনতা বিরোধী

হতে পারেন না। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে সব বানোয়াট। শহিদ কাদের মোল্লা স্বাধীনতার পর এদেশে প্রথম শহিদ, শুধু ইসলামিক রাজনীতি করার কারণে তাকে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে। অথচ কাদের মোল্লা সাহেব মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কোনদিন মিরপুর যান নি। মিরপুরে কসাই কাদেরের দোষে এই সরকার তাকে ফাঁসি দিয়েছে। এই কাদের আর সেই কাদের এক ব্যক্তি নন। কসাই কাদের যদি মোল্লা কাদেরই হবেন, তাহলে তিনি কীভাবে ১৯৭৫ সালের পর উদয়ন স্কুলে শিক্ষকতা করলেন?

উপরের লেখাটা নিয়ে যদি আপনি এদেশের ঘরে ঘরে যান তাহলে অন্তত দশ ভাগের এক ভাগ মানুষ পাবেন যারা এই লেখাটার একশত ভাগের সাথে একমত হবে। অন্তত দশ ভাগের দুই ভাগ মানুষ এই লেখার কিছুটা অংশের সাথে হলেও একমত হবে। বাকি সাত ভাগ মানুষের তিন ভাগ এই লেখাটা দেখা মাত্র ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, আর বাদ বাকি চার ভাগ মানুষ হবেন বিভ্রান্ত। এই বইটা তাদের জন্য।

আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও স্বাধীনতার অনেক মৌলিক প্রশ্নে আমরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারিনি। সরকারের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং স্বাধীনতার বিরোধীদের লাগাতার অপপ্রচারের কারণে এইসব মৌলিক প্রশ্নে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালানো হবে।

একাত্তরে শহিদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই বঙ্গবন্ধুর 'থ্রি লাখ' 'থ্রি মিলিয়ন' বিভ্রান্তির গল্প বলা হয়। আমি বইয়ের প্রথমেই এই মিথটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা খুঁজে বের করেছি এই মিথের প্রথম উৎস। আমি দেখিয়েছি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসার আগেই দেশী-বিদেশী সংবাদ পত্রে তিরিশ লক্ষাধিক শহিদের খবর। সংযুক্ত করেছি বিভিন্ন দুর্লোভ পেপার কাটিং যেগুলো এর আগে কখনোই প্রকাশিত হয় নি। যেহেতু দেশি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হলেই একটা খবর সত্য হয়ে যায় না, আর সে জন্যই বইয়ের একটি অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দৈনিকে শহিদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার তুলনামূলক চিত্র। যেটা প্রমাণ করে তিরিশ লক্ষ সংখ্যাটা কোন স্বপ্নে পাওয়া সংখ্যা নয়, বাস্তব সম্পন্ন পরিসংখ্যান।

যেহেতু সংবাদপত্র কখনোই বিভ্রান্তির ওপরে নয় সে জন্য বইটিকে সাজিয়েছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদের সংখ্যা নিয়ে করা বেশ কয়েকটি গবেষণায় ওপর। উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘের পরিসংখ্যান, বিভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ শহিদের সংখ্যা সম্পর্কে মতামত এবং কয়েকজন গণহত্যা গবেষকের পর্যালোচনা। অধ্যায়ের শেষে একজন গণহত্যা গবেষকের সম্পূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তার গবেষণার পুরো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে

বিস্তারিত ভাবে। চতুর্থ অধ্যায় আমরা সাজিয়েছি ৫০ বছর ধরে সাতটি দেশের মৃত্যুহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা অর্থাৎ ডেমোগ্রাফি। আমরা যুদ্ধ আক্রান্ত কয়েকটি দেশ এবং যুদ্ধবিহীন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা কয়েকটি দেশের গ্রাফ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যেসব দেশে গণহত্যা হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুহারের গ্রাফ দেখে সেসব দেশকে চিহ্নিত করা সম্ভব। শুধু তাই না এমনকি ঠিক কোন সময়ে এই গণহত্যা হয়েছে সেটাও বের করে ফেলা সম্ভব। এরপর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মৃত্যুহারের সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া মৃত্যুহারের তুলনা করে দেখানো হয়েছে শহিদের সম্ভাব্য সংখ্যাটি।

যারা দাবী করেন এত কম সৈনিক এত কম সময়ে এত বেশী মানুষকে মেরে ফেলতে পারে না তাদের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং সময়ের সাপেক্ষে সৈনিক ও হতাহতের তুলনা করা হয়েছে এই বইতে। এছাড়া আলোচনা করেছি শরণার্থী শিবিরে মৃত মানুষের সংখ্যা নিয়ে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা এবং গবেষকদের গবেষণা থেকে ধারণা করে নিয়েছি ১৯৭১ সালে ভারতে চলে যাওয়া প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ শরণার্থীদের ভেতর ৬ থেকে ১২ লাখের ভাগ্যে মৃত্যু নেমে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান ধারাটিও তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পরবর্তী অধ্যায় গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের বীরাঙ্গনাদের নিয়ে। একটি অধ্যায়ে বিভিন্ন উক্তি, ছবি এবং চাক্ষুস সাক্ষির বয়ান থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি পাক বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের যে আধিক্য মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ করা যায় তা আর দশটা যুদ্ধের মত নয়। পাকিস্তানী সেনা বাহিনী যুদ্ধের অংশ হিসবেই এসব ধর্ষণ করেছে। এই অধ্যায়ে এমন কিছু ছবি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে যা পাঠকদের মনসপটে প্রভাব ফেলবে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত ধর্ষণের সংখ্যা নিয়ে। দুই জন বিদেশী এবং দুই জন দেশী গবেষকের গবেষণা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের সংখ্যা কমপক্ষে ৬ থেকে ৭ লক্ষ। বইয়ের একটি পুরো অধ্যায়ে কয়েকটি নির্বাচিত নারী নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেসব অনেকেরই অজানা।

শেষের কিছু অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কয়েকজন সাজাপ্রাপ্ত রাজাকারকে নিয়ে চলমান বিভিন্ন বিভ্রান্তি নিয়র। এখানে আলোচিত হয়েছে কাদের মোল্লা মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে। মানবতা বিরোধী অপরাধে কার্যকর করা হয় কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়ার পর দেশে গড়ে ওঠে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ আন্দোলন 'শাহবাগ আন্দোলন' লক্ষ লক্ষ মানুষের দিবারাত্রি আন্দোলনের ফলে সংশোধিত আইনে আপিল বিভাগে কাদের মোল্লার শাস্তি বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সেই শাস্তি কার্যকরও করা হয়।

এর পর থেকেই প্রপাগ্যান্ডা শুরু হয় এই কাদের মোল্লা সেই কাদের মোল্লা না, বইয়ের একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা তথ্য, ছবি, রায়ের বিভিন্ন কোটেশান দিয়ে দেখানো হয়েছে নিঃসন্দেহে এই কাদের মোল্লাই সেই কাদের মোল্লা। এছাড়া শাহাবাগ আন্দোলনকে ঘিরে বিভিন্ন অপপ্রচারের কয়েকটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে ভাষা আন্দোলনে গোলাম আযমের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই বইটির লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের সর্বাধিক প্রচলিত মিথ গুলোর জবাব দেয়া। তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে লেখা বইটি বিভিন্ন প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেবে বলে আশা রাখি। আমাদের মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন, দেশটা মায়ের মত না দেশটা 'মা'। একএকটা মুক্তিযুদ্ধের গল্প প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মায়ের একএকটা আর্তনাদ। সেই আর্তনাদকে যারা অস্বীকার করে, তিরিশ লক্ষ শহিদকে যারা অস্বীকার করে তারা বাঙালী হতে পারে না।

বাতাসের হিমে তিরিশ লক্ষ শহিদের করতল
জনপদ জুড়ে হাওয়ার কোরাসে আহবান অবিচল,
আমার বুকে রৌদ্র লিখেছে নিহতজনের নাম-
গণহত্যার বিচার করবো, প্রতিজ্ঞা করলাম...

বঙ্গবন্ধু কি সত্যিই তিন লাখ বলতে গিয়ে তিরিশ লাখ বলেছিলেন?

দেশের অর্ধেক মানুষ মনে করে একাত্তরে তিরিশ লক্ষ শহিদ অতিরঞ্জন। কোন ভাবেই নাকি এত কম সময়ে এত বেশী মানুষ মেরে ফেলা সম্ভব না। মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা বড়জোর তিন লাখ, এমনকি কমও হতে পারে। আর মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ এই আষাঢ়ে গল্পের প্রবক্তা শেখ মুজিব। আর সেই আষাঢ়ে গল্পটা প্রথম মঞ্চস্থ হয় বাহাত্তরের আটই জানুয়ারি, মুজিব যখন পাকিস্তান থেকে লন্ডনে আসেন। সেখানে সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধে দেশের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে চান। শেখ মুজিব এমনিতেই ভার্সিটি আউট স্টুডেন্ট ছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজী ভালো জানতেন না। তাই ভুল মৃতের সংখ্যা ৩ Lac বলতে গিয়ে ৩ Million বলে ফেলেন।

4A THE LEDGER Monday, January 17, 1972

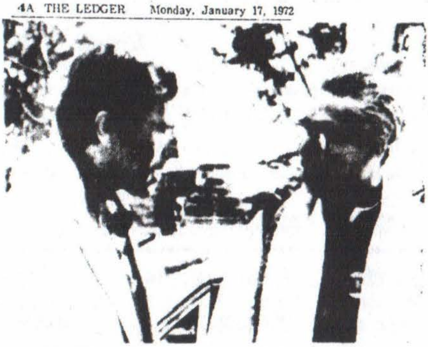

RAHMAN TERMS W. PAKISTANI TROOPS "MERCILESS"
... during interview with David Frost, left, in Dacca.

Murder Of 3 Million Charged By Rahman

By The Associated Press

Sheik Mujibur Rahman, the prime minister of Bangladesh, charged Sunday night that "merciless" West Pakistani troops slaughtered three million people during his country's fight for independence and destroyed everything they could

Sheik Mujib, interviewed in Dacca by David Frost for British television, said former President Agha Mohammed Yahya Khan "killed three million of my people—children, women, peasants, workers and students"—and burned and looted 25,000 to 30,000 houses. It was the "greatest massacre of people in history," he declared.

"Daughters were raped in front of their fathers and mothers, and mothers were raped in front of their sons," he said. "I cannot stop my tears when I think of it."

Mujib called on the United Nations to try Yahya Khan and his associates "the way the German fascist war criminals were tried ...

"This was genocide of my people," he charged. "They must be punished. They machinegunned thousands, because they considered everybody was a Mujib follower.

"They are not human beings, they are uncivilized cretins. All people have some animal qualities, but these people are worse than animals."

Mujib said he calculated the number of deaths from reports his Awami League is sending to Dacca from towns and villages throughout Bangladesh. He said the toll could go higher.

He charged West Pakistani troops with "destroying my communications, my railway, my industries. They destroyed everything humanly possible in the time they had."

Mujib estimated that 85 per cent of Bangladesh's 75 million people today face starvation.

While imprisoned in West Pakistan, Mujib said, he expected to be killed, and during the India-Pakistan war, "Prisoners in my cell were mobilized, and I knew they were told to attack and kill me. Then a jailer took me out of the prison and hid me in his bungalow for two days and saved me."

খুবই চমৎকার একটি থিউরি, এই থিউরি সমাধানের জন্য সমস্যাটার কয়েকটা গুরুতর অংশ নিয়ে আমি প্রথমেই আলোচনা করবো। কারণ এই ইস্যু নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভালোই জল ঘোলা করা হচ্ছে। বিতর্কিত সাংবাদিক ডেভিড বার্গ' ম্যান সম্প্রতি তার ব্লগেও একই কথার সমর্থন দিয়েছেন।

> **(a) Where did the 3 million figure come from?**
> It seems that the figure of 3 million may first have appeared in a daily newspaper, Purbodesh on 23 December 1971, when an editorial stated that 'enemy occupation' had resulted in the deaths of 'about 3 million innocent people.' Subsequently, the Soviet newspaper, Pravda, is reported to have published a news report quoting this figure, and then the figure was more widely distributed in the Bangladesh media, when the news agency ENA, picked up the Pravda piece and distributed an article stating that 'The communist party newspaper Pravda has reported that over 30 lakh person (3 million) were killed throughout Bangladesh by the Pakistan occupation forces during the last nine months.' This news agency article was apparently widely covered in Bangladesh newspapers, including for example, the Bangladesh observer, on 5 January 1972.
>
> The figure however only became widely popularised when Sheikh Mujib on 10 January, the day he returned to Bangladesh, stated, "Three million people have been killed. I believe there is no parallel in the history of the world of such a colossal loss of life for the struggle of freedom. He is also said to have made similar comments around this time in a number of international TV interviews.
>
> Significantly, Sayyid A Karim, Bangladesh's first foreign secretary, supports the contention that Mujib picked the figure of 3 million up from these sources, when he wrote in a footnote in his autobiography of Sheikh Mujib that, 'As for the number of Bengalis killed in the course of the liberation war, the figure of 3 million mentioned by Mujib to David Frost in January 1972 was a gross overstatement. This figure was picked up by him from an article in Pravda, the organ of the communist party of the Soviet Union.'
>
> There is, of course, another story that is often recounted which suggests that Sheikh Mujib made a mistake when he said 3 million died, and that he really meant 3 lakh (300,000) were killed. However, in light of Karim's comment, I am more willing to support the contention that he picked it up from the newspaper reports of the time.

আমরা খোঁজ করেছি এই গল্পের প্রথম প্রচারকের। এবং খুঁজেও পেয়েছি,

'বাংলাদেশীদের মৃত্যু নিয়ে মুজিবের বিভ্রান্তি ('মুজিবস কনফিউসন অন বাংলাদেশী ডেথস') শিরোনামে লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক চিঠিতে (২৪ মে, ২০১১) বিবিসির বাংলা বিভাগের সাবেক উপ-প্রধান সিরাজুর রহমান লিখেছেন, ২১ মে আইয়ান জ্যাক স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশীদের মৃত্যুর যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তা ঠিক নয়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে আসার পর আমিই ছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারী বাংলাদেশী। তাকে হিথরো (বিমান বন্দর) থেকে ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন লন্ডনে ভারতের হাই কমিশনার আপা ভাই পান্থ। এর ঠিক পরপরই আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম।

মিস্টার পান্থ তাকে 'ইওর এক্সিলেন্সি' বলে সম্বোধন করায় মুজিব অবাক হচ্ছিলেন। আমি যখন তাকে বলেছি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছে মুজিব তখন বিস্মিত এমনকি অনেকাংশে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। স্পষ্টত তিনি এমন ধারণা নিয়েই লন্ডনে এসেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের হয়তো পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে, যার জন্য

Mujib's confusion on Bangladeshi deaths

The Guardian, Tuesday 24 May 2011

Ian Jack (21 May) mentions the controversy about death figures in Bangladesh's liberation war. On 8 January 1972 I was the first Bangladeshi to meet independence leader Sheikh Mujibur Rahman after his release from Pakistan. He was brought from Heathrow to Claridge's by the Indian high commissioner Apa Bhai Panth, and I arrived there almost immediately.

Mujib was puzzled to be addressed as "your excellency" by Mr Panth. He was surprised, almost shocked, when I explained to him that Bangladesh had been liberated and he was elected president in his absence. Apparently he arrived in London under the impression that East Pakistanis had been granted the full regional autonomy for which he had been campaigning. During the day I and others gave him the full picture of the war. I explained that no accurate figure of the casualties was available but our estimate, based on information from various sources, was that up to "three lakh" (300,000) died in the conflict.

To my surprise and horror he told David Frost later that "three millions of my people" were killed by the Pakistanis. Whether he mistranslated "lakh" as "million" or his confused state of mind was responsible I don't know, but many Bangladeshis still believe a figure of three million is unrealistic and incredible.

Serajur Rahman

Retired deputy head, BBC Bengali Service

তিনি আন্দোলন করছিলেন। সেদিন আমি এবং উপস্থিত অন্য সকলে তাকে যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছিলাম। আমি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলাম, এখনো পর্যন্ত হতাহতদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের অনুমান, যুদ্ধে 'তিন লাখ' (৩,০০,০০০) মানুষ মারা গেছে।

আমাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে পরবর্তীতে ডেভিড ফস্টারকে মুজিব বলেছিলেন, পাকিস্তানীরা 'আমার তিন মিলিয়ন মানুষকে' হত্যা করেছে। তিনি 'লাখকে' 'মিলিয়নের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, নাকি তার বিভ্রান্ত মনই এজন্য দায়ী ছিল আমি জানি না। কিন্তু বহু বাংলাদেশী এখনো বিশ্বাস করেন, তিন মিলিয়নের সংখ্যাটা কল্পনাপ্রসূত এবং অবিশ্বাস্য।

এই চিঠিটি বহুল প্রচলিত যদিও তার কিছুদিন বাদেই আরেকটি চিঠি প্রকাশিত হয় একই পত্রিকায়। এই চিঠিকে উত্তর দিয়ে যেটা লেখেন রাশেদ চৌধুরী লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার।

My attention has been drawn to a recent letter from a former deputy head of the BBC's Bengali Service Serajur Rahman (Letters, 24 May) relating to casualties in the 1971 Bangladesh war of liberation and the time spent in London by Bangladesh's founding father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Bangabandhu flew to London on 8 January 1972 after being released from a Pakistani prison. He was accompanied on the plane by Dr Kamal Hossain, his confidante, who briefed him on the situation in the then East Pakistan. Records at the Indian High Commission in London show that no one from there, neither the then high commissioner Apa Bhai Panth nor any other official, went to Heathrow to receive Bangabandhu. He was received by Foreign Office officials and Bangladeshi diplomats. A further debriefing took place at the airport and on the way to Claridge's Hotel.

Bangabandhu was fully aware that Bangladesh had been liberated in December and that the provisional government formed during the war with him as the president was in control. He was also aware of the devastation wrought – he was briefed on the provisional government's estimate that millions of people had died in the war.

Dozens of journalists attended the press conference at Claridge's on 8 January. When one asked about the problems facing Bangladesh, Bangabandhu replied: "Millions of people died thousands of villages have been burnt, my economy has been destroyed..." The video is available on YouTube, proving that Bangabandhu was clear in his mind that millions had died, even before he returned to Bangladesh.

Rashed Chowdhury

Bangladesh High Commission, London

আমার এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য এটা নিরূপণ করা নয় মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা কত। সত্য মিথ্যা যাই হোক আমার উদ্দেশ্য এটা খুঁজে বের করা মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ এই গল্পের প্রথম প্রবক্তা কি সত্যিই বঙ্গবন্ধুই কি না।

যদি ধরে নেই একাত্তরে তিরিশ লক্ষ মানুষের শহিদ হওয়াটা একান্তই মুজিব সাহেবের মস্তিষ্ক প্রসূত, আসল সংখ্যাটা তিন লাখ। তাহলে প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে এই তিন লাখ ফিগারটিই বা আসলো কোথা থেকে। বঙ্গবন্ধুর আগে কি কেউ এই সংখ্যা উচ্চারণ করেছেন। করলে কোথায়

করেছেন। তিরিশ লাখ আগে এসেছে নাকি তিন লাখ। এছাড়া আর কোন ফিগার কি আছে। বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আগে প্রথম বাঙালী সিরাজ সাহেবের সাথেই কথা বলেছেন এমন উক্তির পক্ষে সত্যতা পাওয়া যায় না। কারণ পরবর্তী চিঠিতে রাশেদ সাহেব বলেছেন ডঃ কামাল হোসেন তার সাথে একই প্লেনে আসেন, তিনিই বঙ্গবন্ধুকে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ব্রিফ করেন। এছাড়াও উনি দেশে আসার পথেই যে কেউই (দেশী অথবা বিদেশী) তাকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দিতেই পারে এমন চিন্তাটা কখনোই অলীক নয়। সুতরাং এই দুজনের বিতর্কে না জড়িয়ে আমরা অন্য রাস্তা ধরি। আমরা দেখবো বঙ্গবন্ধু দেশে আসার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশী সংবাদপত্র কি বলছে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে।

একটু ঘাটাঘাটি করতেই বেরিয়ে এলো তিরিশ লাখের প্রথম উচ্চারণ। একাত্তর সালেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্নে অর্থাৎ মার্চে পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রথম সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন,

"ওদের ত্রিশ লক্ষ হত্যা কর, বাকীরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে।"

Robert Payne, Massacre, The Tragedy of Bangladesh and the Phenomenon of Mass Slaughter Throughout History; P:50; New York, Macmillan, 1973

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়েই দশ লক্ষ হত্যাকাণ্ডের কথা বলেছিলেন। খালেদ মোশারফ বলেছিলেন দশ লাখের কথা সেই মে মাসে। জুন ১৯৭১ পর্যন্ত জার্মান সরকারের ইশতেহারে লেখা আছে বাংলাদেশে নিহতের সংখ্যা ১০ লাখ। বৃটিশ এম পি ডগলাস ম্যান মে মাসে বৃটেনের কমন্স সভাকে জানান যে, ১০ লক্ষেরও বেশী লোক বাংলাদেশে নিহত হয়েছেন (পোস্ট মাস্টারি সিরিজ ২১ মে, ১৯৭১)।

কবি আসাদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় লিখেছেন তার বেশ কয়েকটি কবিতা। সেসব কবিতায় বারবার উঠে এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কথা। মুক্তিযুদ্ধকালীন তার দুটো কবিতার কথা উল্লেখ করছি। আসাদ চৌধুরী তার 'রিপোর্ট ১৯৭১' কবিতার ৫৪ নাম্বার লাইনে লিখেছেন ১০ লক্ষ গলিত লাশের কথা;

"জনাব উথান্ট,
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ।
আমাকে দেবেন, গুরু, দয়া করে তার ঠিকাদারী?
বিশ্বাস করুন রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্ন হারে একমাত্র আমি দিতে পারি

যদি চান শিশুর গলিত খুলি, দেওয়ালে দেওয়ালে শিশুদের রক্তের আল্পনা
প্লিজ আমাকে কন্ট্রাক্ট দিন।
দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ্য জবান শিখে রিপোর্ট লিখেছি- পড়, পাঠ কর।"

আসাদ চৌধুরীর লেখা যুদ্ধকালীন আরেক শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বারবারা বিডলারকে'। তার কয়েকটা লাইন তুলে দেই;

"বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে দেখো
ওটা একটা জল্লাদের ছবি
পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে সে গলা টিপে হত্যা করেছে
অদ্ভুত জাদুকরকে দেখ
বিংশ শতাব্দীকে সে কৌশলে টেনে-হিঁচড়ে মধ্যযুগে নিয়ে যায়।
দেশলাইর বাক্সর মতো সহজে ভাঙে
গ্রন্থাগার, উপাসনালয়, ছাত্রাবাস, মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ি
সাত কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ফুলকে
সে বুট জুতোয় থেতলে দেয়।"

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত "রক্তাক্ত-বাংলা" গ্রন্থে বিশ লক্ষ মানুষ হত্যাকাণ্ডের খবর। লক্ষ্য রাখবেন আগস্ট যুদ্ধ শুরুর পাঁচ মাস।

> প্রায়
> বিশ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালী নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। সত্তর লক্ষ বাঙালী গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। আর কমপক্ষে তিনশ' লক্ষের মত মানুষ নিরাপত্তার সন্ধানে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশেরই অভ্যন্তরে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হতো 'চরমপত্র'। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিলো এম আর আখতার মুকুল রচিত ও উপস্থাপিত চরমপত্র।

'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার দিন ২৫ শে মে থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে। 'চরমপত্র'-এর প্রতিটি অধ্যায় রচনা ও পাঠ করেন এম আর আখতার মুকুল। 'চরমপত্র' ছিল ব্যাঙ্গাত্মক ও শেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটি অনুষ্ঠান মূলত এটা ছিলো খবরের অনুষ্ঠান। মানসম্মত রেকর্ডিং স্টুডিওর অভাবে টেপ রেকর্ডারে

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

জয় বাংলা

'চরমপত্র' কথিকার
মূল পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ

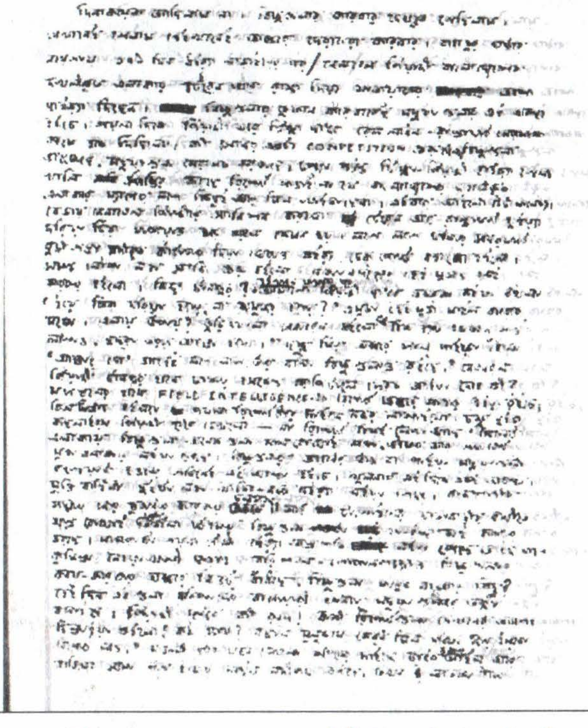

'চরমপত্র' রেকর্ডিং করা হতো এবং ৮-১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হতো। 'চরমপত্র'-এর প্রতিটি অনুষ্ঠানের রচনা ও ব্রডকাস্টিং-এর জন্য এম আর আখতার মুকুল এর পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়েছিল ৭ টাকা ২৫ পয়সা।

চরমপত্রের শেষ প্রচার দিবস অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের কিছু অংশ সরাসরি তুলে দিচ্ছি;

... ২৫ শে মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালিগো বেশুমার মার্ডার করনের অর্ডার দিয়া কি চোটপাট! জেনারেল টিক্কা খান সেই অর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ

বাঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করলো। তারপর বঙ্গাল মুলুকের খাল-খন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মইদ্দে তৈরি হইলো বিচ্ছু।

(চরমপত্র; পৃ : ৩২৫)

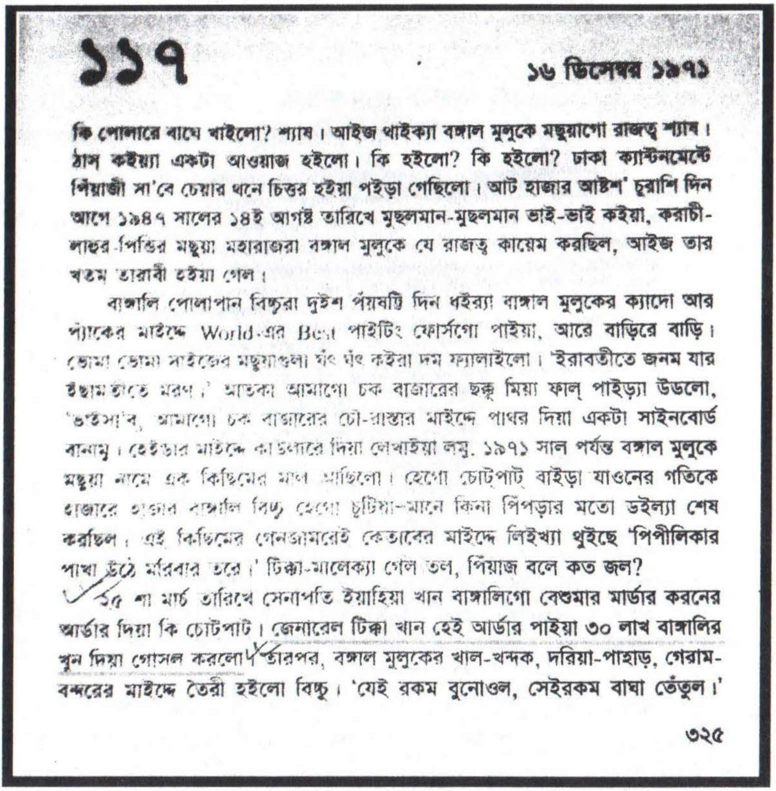

১১৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষ। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ। ঠাস কইর্যা একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পিয়াজী সা'বে চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলো। আট হাজার আষ্টশ' চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই কইয়া, করাচী-লাহর-পিন্ডির মছুয়া মহারাজরা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিল, আইজ তার খতম তারাবী হইয়া গেল।

বাঙ্গালি পোলাপান বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইর্যা বাঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাকের মাইদ্দে World-এর Best পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি। ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা ধঁৎ ধঁৎ কইরা দম ফ্যালাইলো। 'ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মরণ।' আতকা আমাগো চক বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ পাইড়্যা উডলো, 'ভাইসা'ব, আমাগো চক বাজারের চৌ-রাস্তার মাইদ্দে পাথর দিয়া একটা সাইনবোর্ড বানামু। হেইডার মাইদ্দে কাউল্যারে দিয়া লেখাইয়া লমু, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মছুয়া নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হেগো চোটপাট্ বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজার বাঙ্গালি বিচ্ছু হেগো চুটিয়া-মানে কিনা পিঁপড়ার মতো ডইল্যা শেষ করছিল। এই কিছিমের গেনজামরেই কেতাবের মাইদ্দে লিইখ্যা থুইছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।' টিক্কা-মালেক্যা গেল তল, পিঁয়াজ বলে কত জল?

২৫ শা মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালিগো বেশুমার মার্ডার করনের আর্ডার দিয়া কি চোটপাট। জেনারেল টিক্কা খান হেই আর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ বাঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করলো। তারপর, বঙ্গাল মুলুকের খাল-খন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মাইদ্দে তৈরী হইলো বিচ্ছু। 'যেই রকম বুনোওল, সেইরকম বাঘা তেঁতুল।'

৩২৫

চরমপত্রগুলো একত্রিত করে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের বই মেলায় অনন্যা থেকে। খোদ এম আর আখতার সম্পাদনায় প্রকাশিত সেই বইটি থেকে ১৬ ডিসেম্বরের অংশটুকু তুলে দিচ্ছি।

এবার আসি সংবাদ পত্রে বঙ্গবন্ধুই যদি ভুলটি করে থাকেন তাহলে ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭২ পর্যন্ত নিচের সংবাদ প্রতিবেদনগুলিতে তিরিশ লাখ শহিদের কথা কী করে এলো। দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদক ২২ শে ডিসেম্বর তার পত্রিকায় ২২.১২.১৯৭১ তারিখে "ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও" শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখে। সেখানে পরিষ্কার লেখা হয়, "হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু'শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।"

এটা প্রকাশিত হয় বাহাত্তরের আগে।

রাশিয়ার কমিউনিস্ট মুখপাত্র প্রাভদা, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ তিরিশ লাখ শহিদের কথা উল্লেখ করে।

এই নিউজটি প্রথম আন্তর্জাতিক সংবাদ যেখানে তিরিশ লক্ষ শহিদের কথা বলা হয়েছে। প্রাভদা ৩ জানুয়ারি ১৯৭২ তাদের পত্রিকায় তিরিশ লাখ শহিদের কথা উল্লেখ করে। বঙ্গবন্ধু দেশে এসেছিলেন ৮ জানুয়ারি, তিনি তখন জানতেন না যে বাংলাদেশ নামে একটা স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে তখন থেকেই পৃথিবী জানতো এই স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে। International Crimes Strategy Forum (ICSF) এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাটি রাশিয়া থেকে খুঁজে বের করেছে এবং রাশিয়ান থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করছে। তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অনুবাদটি তুলে ধরা হল সরাসরি :

СКРЫТЬ НЕ УДАЛОСЬ । লুকানো গেল না

Published/ Broadcast by Pravda

Date Monday, 3 January 1972

Author И. ЩЕДРОВ, Спец. корр. Правды, г. Дакка. । ই শেদরোভ, বিশেষ সংবাদদাতা, প্রাভদা, ঢাকা

(৩ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত পুরো প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন তাওসীফ হামীম এবং সুকান্ত রক্ষিত)

"পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী আর গোপন রাখা যায়নি"

'এখন বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী আর মিত্র বাহিনীর বীরত্বে স্বাধীনতা পাবার পরে, পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগী/দোসর রাজাকার-আল বদর বাহিনীর অত্যাচার, খুন, রাহাজানি সবার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। রাজাকার-আলবদর বাহিনীর সদস্যরা মূলতঃ ছিল ধর্মীয় মৌলবাদী, কট্টর পাকিস্তানপন্থী সমর্থক। এই ধরনের ব্যাপক খুন, হত্যা, লুটতরাজের পরে প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই ম্যাসাকার পূর্ব পাকিস্তানে তিরিশ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

আমার সাথে কথা বলার সময় আন্তর্জাতিক তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক গোলাম রসুল তার আতংক আড়াল করতে পারছিলেন না।

РАВДА

...ая информация

ТАСС передают

Скрыть не удалось

Стали известны подлинные масштабы террора пакистанских властей в Восточной Бенгалии

Е ЛЕТО

Кончина Мауро Скоччимарро

"আত্মসমর্পনের কয়েক ঘণ্টা আগে রাজাকারেরা মুখোশ পরে এসেছিল। তারা আমার ভাইকে রাতে তুলে নিয়ে যায়," গোলাম রসুল জানালেন। তারা আমার ভাইকে একটি চিঠি দেয়। এই ধরনের চিঠি তাদেরই দেয়া হয়েছিল যাদের নাম পাকিস্তান বাহিনীর খুনের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই চিঠিতে লেখা ছিল- 'আপনি শয়তান, আপনি কুকুর, ভারতের গোপন এজেন্ট যে কি না অখণ্ড পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়ছে। আপনার কর্মকাণ্ড এবং চলাফেরা আমাদের নজরে রয়েছে। এই চিঠি পাবার পর থেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন'।"

"পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের পরের দিন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হয়েছিলাম, যেখানে রাজাকারেরা তাদের ধংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। শ্রেনী কক্ষগুলো রক্তে রঞ্জিত ছিল, বিকৃত মৃতদেহগুলো মেঝেতে পড়ে ছিল, তাদের চিনবার কোন উপায় ছিল না। এরপর গঙ্গার একটি শাখা নদীর তীরে গেলাম। সেখানে যা দেখেছি তা বর্ণনা করা যাবে না। আমরা সেখানে প্রফেসর আব্দুল কালাম আজাদের নির্যাতিত মৃতদেহ আবিস্কার করি। তার পাশেই পড়ে ছিল ডাক্তার রাব্বীর মৃতদেহ। দুইজনেই আমাদের হৃদরোগ বিভাগের সেরা চিকিৎসক ছিলেন। ডাক্তার রাব্বীর দেহ থেকে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে আলাদা করে নিয়েছিল ওরা।

"পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগের রাত্রে", রসুল আরো বললেন- "রাজাকাররা মহানগরের ৮০০ জনেরও বেশী বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক,

সমাজসেবীদের হত্যা করে। বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে তারা বাংলাদেশকে নির্জীব করে দেয়। এই নৃশংসতা ঘটায় প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় দল জামায়াতে ইসলামীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাদের দ্বারা তৈরী ফ্যাসিবাদী সামরিক গোপন অঙ্গ সংগঠন 'আল-বদর'। এই ধরনের খুন-রাহাজানি আর কুকর্মের পুরস্কার ছিল কাঁচা পয়সা। যেমন আল-বদরের কমান্ডারদের প্রতি মাসে ৩৫০ রুপি করে বেতন দেয়া হতো।"

এখন এসব ম্যাসাকার-খুন-রাহাজানি বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, সরকার এদের বিচারের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, যাদের বিরুদ্ধে নিরাপরাধ মানুষ হত্যার অভিযোগ রয়েছে। আল-বদরের একজন সদস্য আব্দুল খাদেক আদালতে তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ স্বীকার করেন এবং অন্য সহযোগীদের নাম বর্ণনা করেন। তিনি নিশ্চিত্ করেন আল-বদর বাহিনীর উপর মহল থেকে কাদের খুন করতে হবে সেই মর্মে নিয়মিত চিঠি পেত, এবং সেই তালিকা ধরেই হত্যা করা হতো।

সকল কর্মকান্ডের নির্দেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর কাছ থেকেই আসতো। তারা খুনের অভিনব উপায় বের করেছিল। খুনীরা দুই দফায় আসতো– একবার চিঠি নিয়ে, একবার খুন করতে।

কিছুদিন আগে ধরা পরা পূর্ব বাংলায় নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর নেতৃ স্থানীয় একজন এজেন্টের শয়নকক্ষে কিছু চিঠি পাওয়া যায়। ঐ চিঠিতে প্রখ্যাত প্রায় ৩০০০ বুদ্ধিজীবীর নাম পাওয়া গেছে যাদেরকে হত্যার কথা ছিল। এই চিঠি প্রায় ৯০ পাতা লম্বা ছিল।

এখন ঢাকায় তদন্তের পরে জানা যায় যে, এই জেনোসাইডের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল গত বছরের বসন্তে। মে মাসে আল-বদর বাহিনীর প্রধানের কাছে দিকনির্দেশনামূলক চিঠি আসে। চিঠিতে লেখা ছিল– বাংলাদেশ শব্দটি উচ্চারণকারী যে কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টি রক্ষায় হত্যা করো। জুনে প্রথম খুনের ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়, যেখানে হাজার হাজার লোকের নাম ছিল। ইতিমধ্যেই নভেম্বরে এদের খুন করার নির্দেশ চলে এসেছিল। নির্দেশটি ছিল লিস্টের মানুষগুলিকে সরিয়ে দিয়ে (হত্যা করে) আন্ডারগ্রাউণ্ডে গিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার।

সকল আইন মেনেই অপরাধীদের বিচার করা হবে।

তবে পশ্চিমা কিছু দেশ, এবং কিছু সাম্রাজ্যবাদী প্রপোগান্ডা সংস্থা পূর্ববাংলার সরকারের আইনী এই বিচারের উদ্যোগকে 'যুদ্ধের ও ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর প্রতিশোধ' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছে, এবং সেভাবেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় উপস্থাপন করছে। এই ব্যাপারটি অবশ্যই মিথ্যা। কারণ, একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে ঐ প্রপাগান্ডাসংস্থা ও দেশগুলি বাংলাদেশে মার্চ হতে ডিসেম্বর মাস অবধি যখন বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক গণহত্যা (genocide) চলছিল, তখন এরা নিশ্চুপ ছিল।

বরং কিছু স্থানীয় সংবাদসংস্থা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানান, কিছু পশ্চিমা দেশের সরকার পাকিস্তানের সামরিক চক্রের এই অপরাধমূলক কর্মে উৎসাহও জুগিয়েছে। ঢাকা হতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 'কালান্তর' থেকে জানা যায় ওয়াশিংটন থেকে সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এতে আনুষঙ্গিক অন্য ব্যাপার বাদ দিলেও যা ঘটে তা হল– রাজাকারদের হাতে অবিলম্বে তিন হাজার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নিধন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

আজকে অনেকেই সচেতনভাবে চুপ করে আছেন। কুম্ভীরাশ্রুও ফেলছেন অপরাধীদের জন্য, যারা বিচারের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন নিরীহ, নির্দোষ যে সব মানুষ নির্যাতনের শিকার– তাদের নিয়ে কিছু বলছেন না। সমগ্র দেশ আজ কাঁদছে।'

এরপর মর্নিং নিউজ, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রাভদার কথাই আবার উল্লেখ করে সেই সংখ্যাটা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয় ঢাকার পত্রিকা দৈনিক অবজারভার শিরোনাম

Over 30 lakh killed by Pak forces ---Pravda

MOSCOW, Jan. 4 (ENA): The Communist Party newspaper *Pravda* has reported that over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistan occupation forces during the last nine months.

Quoting its special correspondent stationed in Dacca the paper said that the Pakistan military forces immediately before their surrender to Mukti Bahinis and the allied forces, had killed about 800 intellectuals in the capital city of Bangladesh alone.

The paper also criticised the pro-Pakistan stand taken by the European countries and the United States in the recent Indo-Pak war.

snid, Atiqur Rahman, Farhad; Rahman, Rehana Akhtar, Mahbuba Haider and others.

Observance of 'Mujib Day' discussed

A meeting of the Presidents and Secretaries of the Union Awami League units under Dacca Nagar Awami League was held yesterday in the office of Dacca Nagar Awami League reports BPI.

Mr. Anwar Choudhury, Vice President of Dacca Nagar Awami League, presided over the meeting and Gazi Golam Mostafa, Secretary Dacca Nagar A.L., and others took part in the discussion regarding various problems including observation of "Mujib Day" and mantaining peace and tranquillity in the city.

প্রাভদা পত্রিকায় তথ্য প্রকাশ

দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে ত্রিশ লক্ষাধিক লোককে হত্যা করেছে

শহরে ৭ ব্যক্তি গ্রেফতার

করে এভাবে, Pak Army Killed over 30Lakh people” যেটা প্রকাশিত হয় ০৫.০১.১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু দেশে আসার ৩ দিন আগে।

জল্লাদদের বিচার করতে হ

আজাদ পত্রিকাও প্রাভদার কথা উল্লেখ করে তাদের সংবাদে জানুয়ারির চার তারিখ।

দৈনিক বাংলা পত্রিকা তাদের, ৬ জানুয়ারি, ১৯৭২ ‘জল্লাদের বিচার করতে হবে’ শিরোনামে করা প্রবন্ধ তিরিশ লক্ষ শহিদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেটা প্রকাশিত হয় ৮ তারিখের আগে।

সবশেষে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু ৩০ লাখ শহিদের কথা মুখস্ত বলা হত এমন ভাবা ভুল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের নয় তারিখ দৈনিক বাংলা পত্রিকা

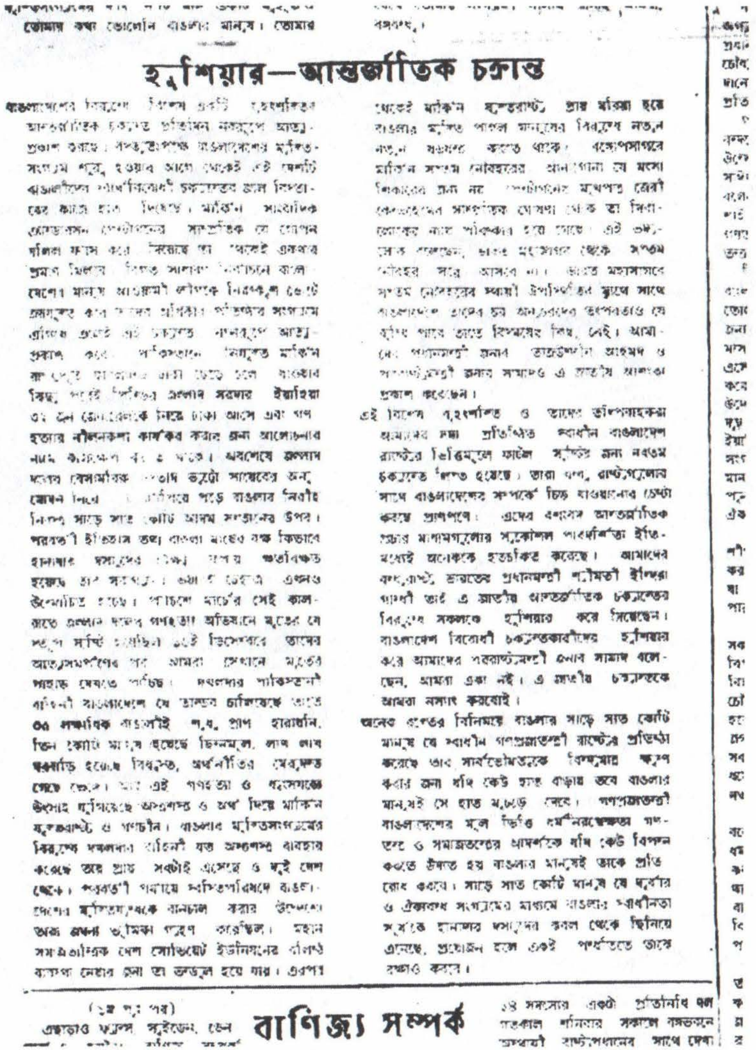

হুঁশিয়ার—আন্তর্জাতিক চক্রান্ত

বাণিজ্য সম্পর্ক

৩৫ লাখ শহিদের কথা উল্লেখ করে। বঙ্গবন্ধু লন্ডন আসার আগের খবর এটা। কারণ পত্রিকা নয় তারিখের, মানে খবর এক দিন আগের অর্থাৎ আট তারিখের।

লেখার শুরুতেই বলেছিলাম এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি চুলচেরা পরিমাপ নয় বরং এটা অনুসন্ধান করা যে শহিদের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ এই আষাঢ়ে গল্পের প্রবক্তা কি আসলেই শেখ মুজিব কি না। ফ্যক্টস এন্ড ডকুমেন্টস যাচাই করে

এই পর্যন্ত পড়ে আসা যেকোন একজন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ নিশ্চয়ই মেনে নিতে বাধ্য হবেন তিরিশ লাখ ফিগারটা মুজিবের মাথায় হঠাৎ করে আসেনি। শহিদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছিলো এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচার হচ্ছিলো। স্বাধীনতার পর দেশী পত্রিকা গুলোতেও এই সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধু জেলে থাকতে থাকতেই সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এই সত্য পৌঁছে গিয়েছিলো। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর কাছে কোন টাইম মেশিন ছিলো না সুতরাং এই কথা বলাই যায় যে বঙ্গবন্ধু জেনে এবং বুঝেই সবখানে তিরিশ লক্ষ শহিদের কথা বলেছেন।

এই পর্বটিতে উল্লেখ করা দুর্লভ পেপার কাটিংগুলো ICSF সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ওমর শোহাব ভাই, কিংবদন্তীতুল্য মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এবং মুক্তিযোদ্ধা এম এম আর জালাল ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া। তার প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা।

যুদ্ধ যখন চলছিলো বিদেশী পত্র-পত্রিকা তখন যা লিখছিল শহিদের সংখ্যা নিয়ে

খুঁজে দেখা যাক একাত্তরের বিদেশী সংবাদপত্রগুলো ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের আগ পর্যন্ত হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে কি ধারণা দেয়। প্রথমেই ঐ সময়ের মৃত মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিদেশী পত্রিকাগুলোতে কি কি সংখ্যা দেয়া আছে সেটার একটা ডাটা শীট তৈরি করবো আমরা। যদিও এ পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদের সংখ্যা নিরূপণে করা সম্ভব নয়। কারণটাও খুবই সহজ, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ছিল প্রায় বিদেশী সাংবাদিক মুক্ত। সাংবাদিকদের বড় অংশকেই বের করে দেয়া হয় ২৫ মার্চ রাতে, দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের ২৭শে মার্চ ১৯৭১ সংখ্যাটা পড়লে সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে বের করে দেয়ার ঘটনাটি। আমি ঐ রিপোর্ট থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধূলিস্যাৎ করতে সেনাবাহিনী যখন অভিযানে নামে সেই সময় থেকেই পূর্বপাকিস্তানে অবস্থানরত সকল বিদেশী সাংবাদিককে অস্ত্রের মুখে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এবং পরে সবাইকে ধরে প্লেনে উঠিয়ে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং হোটেলের ছাদে লুকিয়ে থেকে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন; যদিও তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালানো হয়েছে। সাইমন ড্রিং ছাড়া কেবল এ্যাসাসিয়েটেড প্রেস-এর ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্ট গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাইমন ড্রিং জ্বলন্ত ঢাকা শহরে ব্যাপকভাবে ঘুরে দেখার সুযোগ পান। গতকাল একটি প্লেনে করে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হন। দু'দুবার তার বস্ত্র উন্মোচন করে তল্লাশী চালানো এবং তার লাগেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলেও, কৌশলে তিনি ঢাকায় নেয়া নোটগুলোসহ সোমবার সকালে ব্যাংকক পৌঁছে এই রিপোর্ট পাঠান।

(দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ, ২৭শে মার্চ ১৯৭১)

সাইমন ড্রিং এর মত হাতে গোণা যে কয়েকজন সাংবাদিক লুকিয়ে ছিলেন তাদের কাছে আসলেও সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া অসম্ভব ছিল কারণ অভিযান চলছিল সারা দেশ জুড়ে। পুরো দেশের সমস্ত খবর একত্র করে একটা ফিগার নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ ছিল, এবং এই কথা সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলোতেও এসেছে বারবার। পড়তে গিয়ে দেখেছি যখনি একটা ফিগারের কথা বলা হচ্ছে তখনি আবার বলা হচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা আমরা জানি না, সংখ্যাটা এর চেয়েও অনেক বেশী হতে পারে। তাই প্রথম দিকে একাত্তরে আসলে কি ঘটছিল পাকিস্তানে সেটা

পৃথিবীর মানুষ খুব একটা জানত না। টুকটাক নিউজে হয়ত দেখা যেত খানিক গণ্ডগোলের কথা কিন্তু পুরো চিত্রটা মানুষের কাছে পরিষ্কার ছিল না।

পরিষ্কার করেছিলেন যে মানুষটি তিনি ছিলেন পাকিস্তানী। পাকিস্তানি সাংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাস ছিলেন প্রথম মানুষ যিনি সারাবিশ্বের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন। '৭১-এর এপ্রিলে যখন সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের ওপর নির্বিচারে নিপীড়ন চালাচ্ছিল হত্যা করছিল , ঠিক তখনই পাকিস্তানী সরকার সংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাসকে যুদ্ধাবস্থার প্রতিবেদন তৈরির জন্য সেখানে আমন্ত্রণ জানায়। শাসক শ্রেণী ধারণা করেছিল মাসকারেনহাস তাদের মিথ্যা প্রচারণায় সায় দেবে। কিন্তু তারপরে ঘটনা ইতিহাস, এন্থনি মাসকারেনহাস সেই কাজটাই করলেন যেটা একজন বিবেকবান মানুষের করা উচিত মানুষের।

"ক্যান্টনমেন্টের হেডকোয়ার্টার নবম ডিভিশনের কর্মকর্তাদের সাথে ছয় দিন ধরে আমি খুব কাছে থেকে মৃত্যু দেখেছি"। এন্থনি মাসকারেনহাস সানডে টাইমসে ১৯৭১ সালের ১৩ই জুন তাঁর 'জেনোসাইড' শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত দিয়েছিলেন

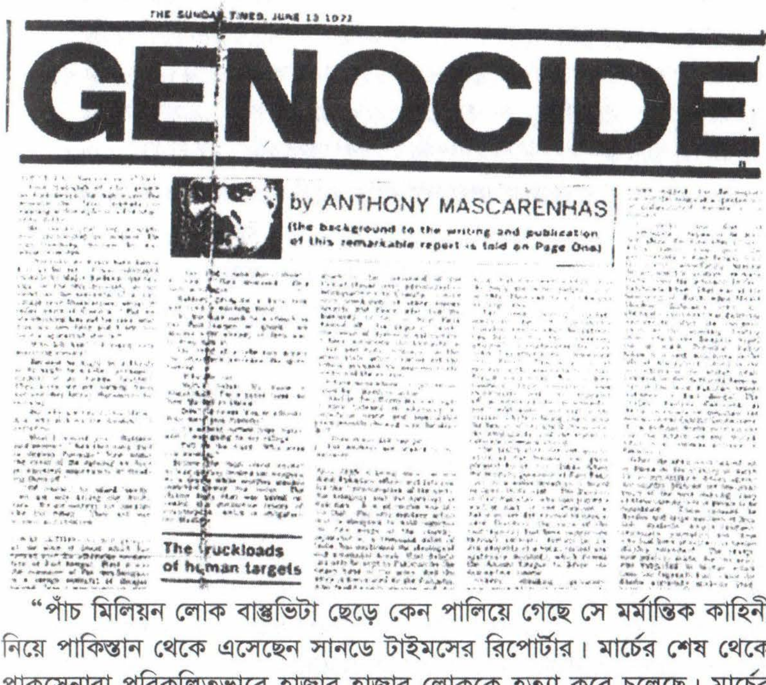
THE SUNDAY TIMES, JUNE 13 1971

GENOCIDE

by ANTHONY MASCARENHAS

(the background to the writing and publication of this remarkable report is told on Page One)

The truckloads of human targets

"পাঁচ মিলিয়ন লোক বাস্তুভিটা ছেড়ে কেন পালিয়ে গেছে সে মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে পাকিস্তান থেকে এসেছেন সানডে টাইমসের রিপোর্টার। মার্চের শেষ থেকে পাকসেনারা পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে চলেছে। মার্চের

শেষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংবাদ-ধামাচাপা-দেয়ার পেছনের মর্মান্তিক কাহিনী হলো এই। কলেরা আর দুর্ভিক্ষ নিয়েও ৫০ লক্ষ লোকের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে ভারতে চলে আসার এই হলো কারণ।

সানডে টাইমসের পাকিস্তান-প্রতিনিধি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এই প্রথমবারের মতো নিরবতার পর্দা উন্মোচন করলেন। তিনি সেখানে পাকসেনাদের কীর্তিকলাপ দেখেছেন। তিনি পাকিস্তান ছেড়ে এসেছেন বিশ্ববাসীকে সেসব জানানোর জন্য। সেনাবাহিনী শুধু স্বাধীনতা- পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ ধারণার সমর্থকদেরই হত্যা করছে না। স্বেচ্ছাকৃতভাবে খুন করা হচ্ছে হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান সবাইকে। হিন্দুদের গুলি করে বা পিটিয়ে মারা হচ্ছে তারা কেবল হিন্দু বলেই। জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের রিপোর্টের পেছনেও রয়েছে একটি দারুণ গল্প।

মার্চের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে দুই ডিভিশন পাকসেনা গোপনে পাঠানো হয় বিদ্রোহীদের 'খুঁজে বের করা'র জন্য। কিন্তু দু-সপ্তাহ পরে পাকিস্তান সরকার আটজন পাকিস্তানী সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানায় পূর্ব পাকিস্তানে উড়ে যাবার জন্য। সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে এই ধারণা দেয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশের পূর্বাংশে 'সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।' সাতজন সাংবাদিক তাদের কথামতো কাজ করেছেন। কিন্তু তা করেননি একজন– তিনি হলেন করাচির মর্নিং নিউজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও সানডে টাইমসের পাকিস্তান প্রতিনিধি অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস।

১৮ মে মঙ্গলবার তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হন লন্ডনস্থ দি সানডে টাইমসের কার্যালয়ে। আমাদের জানালেন, পূর্ব বাংলা ছেড়ে ৫০ লক্ষ লোককে কেন চলে যেতে হয়েছে তার পেছনের কাহিনী। তিনি সোজাসাপ্টাভাবে জানালেন এই কাহিনী। এই কাহিনী লেখার পর তার পক্ষে আর করাচি ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তিনি জানালেন তিনি পাকিস্তানে আর ফিরে না যাবার ব্যাপারে মনস্থির করেছেন; এজন্য তাকে তার বাড়ি, তার সম্পত্তি, এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে সম্মানীয় একজন সাংবাদিকের মর্যাদার মায়া ত্যাগ করতে হবে। তার মাত্র একটি শর্ত ছিল: পাকিস্তানে গিয়ে তার স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা যেন তার রিপোর্ট প্রকাশ না করি।

সানডে টাইমস রাজি হয় এবং তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। দশ দিন অপেক্ষা করার পর সানডে টাইমসের এক নির্বাহীর ব্যক্তিগত ঠিকানায় একটি বৈদেশিক তারবার্তা আসে। তাতে লেখা ছিল, 'আসার প্রস্তুতি সম্পন্ন, সোমবার জাহাজ ছাড়বে।' দেশত্যাগ করার ব্যাপারে স্ত্রী ও সন্তানদের অনুমতি পেতে ম্যাসকারেনহাস সফল হন। তার দেশত্যাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে তিনি কোনোরকমে

একটা রাস্তা পেয়ে যান। পাকিস্তানের ভেতরে যাত্রার শেষ পর্যায়ে তিনি প্লেনে একজন তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে দেখতে পান যাকে তিনি ভালোমতোই চিনতেন। এয়ারপোর্ট থেকে একটি ফোনকল তাকে গ্রেফতার করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে কোনো ফোনকল হয়নি এবং তিনি মঙ্গলবার লন্ডনে এসে পৌঁছান।

পূর্ব পাকিস্তানে ম্যাসকারেনহাস বিশেষ কর্তৃত্ব ও নিরপেক্ষতা সহকারে যা দেখেছেন তা লিখেছেন। তিনি গোয়ার একজন ভদ্র খ্রিস্টান, তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোনোটাই নন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন পাকিস্তানে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের উদ্ভবের পর থেকেই তিনি পাকিস্তানের পাসপোর্টধারী। তখন থেকে তিনি পাকিস্তানের অনেক নেতার আস্থা অর্জন করেছেন এবং এই রিপোর্ট লিখছেন সত্যিকারের ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে।

তিনি আমাদের কাছে বলেন, 'তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা আমাদের জানান সেনাবাহিনী যে বিরাট দেশপ্রেমের কাজ করছে, ব্যাপারটা সেভাবে উপস্থাপন করতে।' তিনি তার প্রতিবেদনের জন্য যা দেখেছেন এবং রিপোর্ট করেছেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না । তাকে একটি রিপোর্ট লেখার অনুমতি দেয়া হয় যা সানডে টাইমসে ২ মে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটিতে কেবল মার্চ ২৫/২৬-এর ঘটনার বিবরণ ছিল, যখন বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং অবাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এমনকি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার প্রসঙ্গ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সেন্সর করেছিল। এ-ব্যাপারটিই তার নীতিবোধকে পীড়া দিচ্ছিল। কিছুদিন পরে, তার ভাষায়, তিনি স্থির করলেন যে, "হয় যা দেখেছি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখবো, নয়তো লেখাই বন্ধ করে দেবো; নইলে সততার সঙ্গে আর লেখা যাবে না।" তাই তিনি প্লেনে চেপেছেন এবং লন্ডন চলে এসেছেন।

পূর্ব বাংলা থেকে আসা শরণার্থী ও নিরপেক্ষ কূটনীতিবিদদের মধ্যে যাদের এসব ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা রয়েছে তাদের দ্বারা তার প্রতিবেদন আমরা বিস্তৃতভাবে যাচাই করতে সমর্থ হয়েছি।

শরণার্থীরা কেন পালিয়েছে: সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যাবার পরের বিভীষিকার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

আবদুল বারী ভাগ্যের ভরসায় দৌড় দিয়েছিল। পূর্ব বাংলার আরো হাজার মানুষের মতো সেও একটা ভুল করে ফেলেছিলো– সাংঘাতিক ভুল–ও দৌড়াচ্ছিলো পাকসেনাদের একটি টহল-সেনাদলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে। পাকসেনারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে এই চব্বিশ বছরের সামান্য লোককে। নিশ্চিত গুলির মুখে সে থরথরিয়ে কাঁপে। "কেউ যখন দৌড়ে পালায় তাকে আমরা সাধারণত খুন করে ফেলি", ৯ম ডিভিশনের জি-২ অপারেশনস-এর মেজর রাঠোর আমাকে মজা করে বলেন, কুমিল্লার বিশ মাইল দক্ষিণে মুজাফরগঞ্জ নামে ছোট্ট একটা গ্রামে আমরা দাঁড়িয়ে

আছি। "ওকে আমরা চেক করছি কেবল আপনার খাতিরে। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, এছাড়া আপনার পেটের পীড়া রয়েছে।" "ওকে খুন করতে কেন?" উদ্বেগের সঙ্গে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ হয় ও হিন্দু, নয়তো বিদ্রোহী, মনে হয় ছাত্র কিংবা আওয়ামী লীগার। ওদের যে খুঁজছি তা ওরা ভালমতো জানে এবং দৌড়ের মাধ্যমে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে।"

"কিন্তু তুমি ওদের খুন করছো কেন? হিন্দুদেরই বা খুঁজছ কেন?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম । রাঠোর তীব্র কণ্ঠে বলেন: "আমি তোমাকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিতে চাই, তারা পাকিস্তান ধ্বংস করার কী রকম চেষ্টা করেছে। এখন যুদ্ধের সুযোগে ওদের শেষ করে দেয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়েছি।"

"অবশ্য," তিনি তাড়াতাড়ি যোগ করেন, "আমরা শুধু হিন্দুদেরই মারছি। আমরা সৈনিক, বিদ্রোহীদের মতো কাপুরুষ নই। তারা আমাদের রমণী ও শিশুদের খুন করেছে।"

পূর্ব বাংলার শ্যামল ভূমির ওপর ছড়িয়ে দেয়া রক্তের কলঙ্কচিহ্নগুলি আমার চোখে একে একে ধরা পড়ছিল। প্রথমে ব্যাপারটা ছিল বাঙালিদের প্রতি বন্য আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অবাঙালিদের হত্যা। এখন এই গণহত্যা ঘটানো হচ্ছে পাকসেনাদের দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এই সুসংগঠিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হিন্দুরাই শুধু নয়, যারা সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার ১০ শতাংশ, বরং হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানরাও। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যসহ সবাই এর মধ্যে রয়েছে। এমন কি ১৭৬,০০০ জন বাঙালি সৈনিক ও পুলিশ যারা ২৬ শে মার্চে অসময়োপযোগী ও দুর্বল-সূচনার একটা বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করতে চেয়েছিল, এর ভেতরে তারাও আছে।

এপ্রিলের শেষ দিকে পূর্ব বাংলায় দশদিনে চোখ আর কানে অবিশ্বাস্য যা কিছু আমি দেখেছি ও শুনেছি তাতে এটা ভয়াবহভাবে পরিষ্কার যে এই হত্যাকাণ্ড সেনা কর্মকর্তাদের বিচ্ছিন্ন কোনো কার্যকলাপ নয়। পাক সেনাদের দ্বারা বাঙালিদের হত্যাকাণ্ডই অবশ্য একমাত্র সত্য নয়। ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরাই একমাত্র হত্যাকারী ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্য ও প্যারামিলিটারির সদস্যদের বন্য আক্রোশের শিকার হয়েছে অবাঙালিরা। কর্তৃপক্ষের সেন্সর আমাকে এই তথ্য জানানোর সুযোগ দিয়েছে। হাজার হাজার অভাগা মুসলিম পরিবার, যাদের অধিকাংশই ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের সময় বিহার থেকে শরণার্থী হিসেবে পাকিস্তানে এসেছিল, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রমণীরা ধর্ষিত হয়েছে, বিশেষ ধরনের ছুরি দিয়ে কেটে নেয়া হয়েছে তাদের স্তন। এই ভয়াবহতা থেকে শিশুরাও রক্ষা

পায়নি। ভাগ্যবানরা বাবা-মার সঙ্গেই মারা গেছে; কিন্তু চোখ উপড়ে ফেলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ঠুরভাবে ছিঁড়ে নেয়া হাজার হাজার শিশুর সামনে ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোরের মতো শহরগুলো থেকে ২০,০০০-এরও বেশি অবাঙালির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। নিহতদের সত্যিকারের পরিমাণ, পূর্ব বাংলার সর্বত্র আমি শুনেছি ১,০০,০০০-এর মতো হতে পারে; কারণ হাজার হাজার মৃতদেহের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পাক-সরকার ওই প্রথম ভয়াবহতা সম্পর্কে পৃথিবীকে জানতে দিয়েছে। কিন্তু যা প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি তা হলো, তাদের নিজেদের সেনাবাহিনী যে-হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা ছিল দ্বিতীয় এবং ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ড। পাক-কর্মকর্তারা উভয় পক্ষ মিলিয়ে নিহতদের সংখ্যা ২,৫০,০০০-এর মতো বলে গণনা করেছে-এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারিতে মৃতদের ধরা হয়নি। দেশের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত প্রদেশে সফল ধ্বংসকাণ্ড চালানোর মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান-সমস্যাকে তার নিজস্ব 'চরম সমাধানের' দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।"

এই পুরো প্রবন্ধটি বাংলা অনুবাদের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা রইল ফাহমিদুল হকের প্রতি।

মুক্তিযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণা হয়েছে অনেক। আজকে আলোচনা করবো কিছু আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা নিয়ে। এই নিবন্ধে থাকবে যুদ্ধকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলোতে (বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানী সংবাদপত্র ব্যতিত) শহিদের সংখ্যা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। আমি সাধারনত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করার সময় বরাবরই দেশী ইতিহাসবিদ-লেখকদের কোটেশান পারতপক্ষে গ্রহণ না করে আমরা চেষ্টা করি কোন থার্ড পার্টি কিংবা পাকিস্তানী কোন লেখকের বই থেকে কোট করতে। ফলে যদি দেখানো যায় আন্তর্জাতিক অথবা পাকিস্তানী ইতিহাসবিদের মতেই পাকিস্তানিদের কথা অগ্রহণযোগ্য তখন সেই আর্টিকেলের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায় অনেক গুন, সাথে সাথে দেশ বিরোধীদের কথা বলার সুযোগও থাকে না। আসুন দেখা যাক এতকিছুর পরেও বিভিন্ন টাইম লাইনে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো কি লিখেছে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে;

১) Time সাময়িকী একাত্তরের এপ্রিলের ১২ তারিখ লিখেছে ৩ লাখ।

২) News Week এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৭১ লিখেছে সাত লক্ষ।

৩) The Baltimore sun ১৪ মে ১৯৭১ লিখেছে ৫ লাখ।

৪) The Momento, Caracas জুনের ১৩ তারিখে লিখেছে ৫ থেকে ১০ লক্ষ।

৫) কাইরান ইন্টারন্যাশনাল ২৮ জুলাই লিখেছে ৫ লক্ষ।

৬) Wall Street Journal ২৩ জুলাইয় রিপোর্ট করেছে, সংখ্যাটা ২ থেকে ১০ লক্ষ।

৭) Times সাময়িকী সেপ্টেম্বরের বলছে প্রায় ১০ লক্ষাধিক।

৮) দি হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস- লন্ডন ১লা অক্টোবর ১৯৭১ বলেছে শহিদের সংখ্যা ২০ লক্ষ।

৯) ন্যাশনাল জিওগ্রাফী ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে লিখেছে শহিদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সংখ্যাগুলো নিয়ে আমরা ক্রমান্বয়ে শহিদের সংখ্যা বেড়ে তিরিশ লক্ষ পর্যন্ত একটি গ্রাফ তৈরি করেছি :

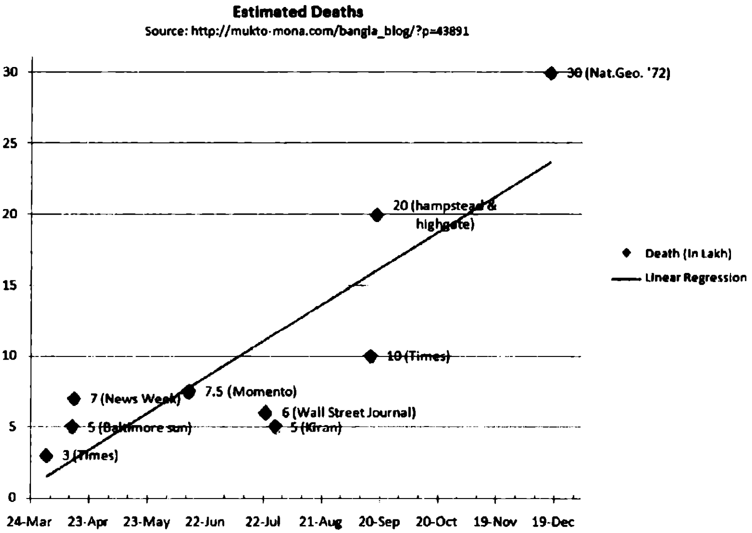

এর সাথে সাথে ১৯৮১ সালে ইউ এন ইউনির্ভাসাল হিউম্যান রাইটসের ডিকলেয়ারেশানের কথা মনে করিয়ে দেই। সেখানে লেখা হয়েছে;

"মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১- এর গণহত্যায় স্বল্পতম সময়ে এই সংখ্যা সর্ববৃহৎ. গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০-১২,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্ব্বোচ্চ নিধনের হার।"

তার পাক বাহিনী এই কাজ (দিনপ্রতি ৬০০০-১২০০০ বাঙালী নিধন) করেছে মোটামুটি ২৬০দিনে (একাত্তরের ২৫-এ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত)। বাঙালী নিধনের লোওয়ার লিমিট: ৬০০০ x ২৬০ = ১৫,৬০,০০০ (১৫ লক্ষ ৬০

হাজার)। আর নিধনের আপার লিমিট: ১২০০০ x ২৬০ = ৩১,২০,০০০ (৩১ লক্ষ ২০ হাজার)।

এছাড়া আমরা সবাই জানি 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড' বাংলাদেশের গণহত্যাকে পৃথিবীর বৃহত্তম পাঁচ গণহত্যার একটি বলে স্বীকৃতি দেয়। আন্তর্জাতিক গণহত্যা বিষয়ক ওয়েবসাইট genocide.org অনুসারে:

আমরা এখান উপরে উল্লেখিত পত্রিকাগুলো থেকে ৩টি প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি প্রতিবেদন নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করবো

১) টাইমস সাময়িকী ১২ই এপ্রিল ১৯৭১

২) হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস এর প্রতিবেদন

৩) ন্যাশনাল জিওগ্রাফীর প্রতিবেদন টাইমস ১২ই এপ্রিলের প্রচ্ছদ :

টাইমসের সেই সংবাদে দ্বিতীয় প্যারাতেই লেখা হয়েছে :

"As Round 1 of Pakistan's bitter civil war ended last week, the winner—predictably —was the tough West Pakistan army, which has a powerful force of 80,000 Punjabi and Pathan soldiers on duty in rebellious East Pakistan. Reports coming out of the East (via diplomats, frightened refugees and clandestine broadcasts) varied wildly. Estimates of the total dead ran as high as 300,000. A figure of 10,000 to 15,000 is accepted by several Western governments, but no one can be sure of anything except that untold thousands perished."

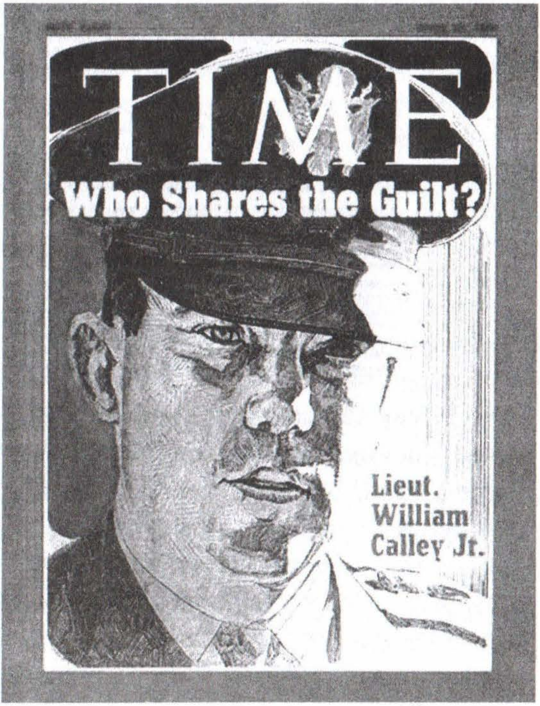

TIME

World: Pakistan: Round 1 To the West

Monday, Apr. 12, 1971

THERE is no doubt," said a foreign diplomat in East Pakistan last week, "that the word massacre applies to the situation." Said another Western official: "It's a veritable bloodbath. The troops have been utterly merciless."

As Round 1 of Pakistan's bitter civil war ended last week, the winner—predictably—was the tough West Pakistan army, which has a powerful force of 80,000 Punjabi and Pathan soldiers on duty in rebellious East Pakistan. Reports coming out of the East (via diplomats, frightened refugees and clandestine broadcasts) varied wildly. Estimates of the total dead ran as high as 300,000. A figure of 10,000 to 15,000 is accepted by several Western governments, but no one can be sure of anything except that untold thousands perished.

Mass Graves. Opposed only by bands of Bengali peasants armed with stones and bamboo sticks, tanks rolled through Dacca, the East's capital, blowing houses to bits. At the university, soldiers slaughtered students inside the British Council building. "It was like Genghis Khan," said a shocked Western official who witnessed the scene. Near Dacca's marketplace, Urdu-speaking government soldiers ordered Bengali-speaking townspeople to surrender, then gunned them down when they failed to comply. Bodies lay in mass graves at the university, in the Old City and near the municipal dump.

During rebel attacks on Chittagong, Pakistani naval vessels shelled the port, setting fire to harbor installations. At Jessore, in the southwest, angry Bengalis were said to have hacked alleged government spies to death with staves and spears. Journalists at the Petrapole checkpoint on the Indian border found five bodies and a human head near the frontier post—the remains, apparently, of a group of West Pakistanis who had tried to escape. At week's end there were reports that East Bengali rebels were maintaining a precarious hold on Jessore and perhaps Chittagong. But in Dacca and most other cities, the rebels had been routed.

The army's quick victory, however, did not mean that the 58 million West Pakistanis could go on dominating the 78 million Bengalis of East Pakistan indefinitely. The second round may well be a different story. It could be fought out in paddies and jungles and along river banks for months or even years.

Completing the Rupture. The civil war erupted as a result of a victory that was too sweeping, a mandate that was too strong. Four months ago, Pakistan's President, Agha Mohammed Yahya Khan, held elections for a constituent assembly to end twelve years of martial law. Though he is a Pathan from the West, Yahya was determined to be fair to the Bengalis. He assigned a majority of the assembly seats to Pakistan's more populous eastern wing, which has been separated from the West by 1,000 miles of India since the partitioning of the subcontinent in 1947.

To everyone's astonishment, Sheik Mujibur Rahman and his Awami League won 167 of the 169 seats assigned to the Bengalis, a clear majority in the 313-seat assembly. "I do not want to break Pakistan," Mujib told TIME shortly before the final rupture two weeks ago. "But we Bengalis must have autonomy so that we are not treated like a colony of the western wing." Yahya resisted Mujib's demands for regional autonomy and a withdrawal of troops. Mujib responded by insisting on an immediate end to martial law. Soon the break was complete. Reportedly seized in his Dacca residence at the outset of fighting and flown to West Pakistan, Mujib will probably be tried for treason.

All Normal. West Pakistanis have been told little about the fighting. ALL NORMAL IN EAST was a typical newspaper headline in Karachi last week. Still, they seemed solidly behind Yahya's tough stand. "We can't have our flag defiled, our soldiers spat at, our nationality brought into disrepute," said Pakistan Government Information Chief Khalid Ali. "Mujib in the end had no love of Pakistan."

Aware that many foreigners were sympathetic to the Bengalis, Yahya permitted the official news agency to indulge in an orgy of paranoia. "Western press reports prove that a deep conspiracy has been hatched by the Indo-Israeli axis against the integrity of Pakistan and the Islamic basis of her ideology," said the agency.

The Indian government did in fact contribute to the Pakistanis' anxiety. Although New Delhi denied that India was supplying arms to the Bengali rebels, the Indian Parliament passed a unanimous resolution denouncing the "carnage" in East Pakistan. India's enthusiasm is hardly surprising, in view of its longstanding feud with the West Pakistanis and the brief but bloody war of 1965 over Kashmir. But Western governments urged New Delhi to restrain itself so as not to provoke West Pakistan into making an impulsive response.

Hit and Run. For the time being, West Pakistan's army can probably maintain its hold on Dacca and the other cities of the East. But it can hardly hope to control 55,000 sq. mi. of countryside and a hostile population indefinitely. The kind of Bengali terrorism that forced the British raj to move the capital from Calcutta to Delhi in 1911 may well manifest itself again in a growing war of hit-and-run sabotage and arson. In modern times, the East Bengalis have been best known to foreigners as mild-mannered peasants, clerks and shopkeepers, perhaps the least martial people on the subcontinent. But in their support of an independent Bangla Desh (Bengal State), they have displayed a fighting spirit that could spell lasting turmoil for those who want Pakistan to remain united. As Mujib often asked his followers rhetorically: "Can bullets suppress 78 million people?"

"গত সপ্তাহে পাকিস্তানে তিক্ত গৃহযুদ্ধের প্রথম দফা শেষ হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজয়ী সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানের নিষ্ঠুর সেনাবাহিনী। বিদ্রোহী পূর্ব পাকিস্তানে তার ৮০ হাজার পাঞ্জাবি ও পাঠান সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। সেখানকার কূটনৈতিক, সন্ত্রস্ত উদ্বাস্তু আর গোপন-বার্তার মাধ্যমে যেসব বার্তা পাওয়া যাচ্ছে তাতে ব্যাপক গরমিল রয়েছে। সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ৩ লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে। কয়েকটি পশ্চিমা সরকার ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার মৃতের সংখ্যা গ্রহন করেছে; কিন্তু অনুচ্চারিত হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে সে বিষয়টি ছাড়া আর কোন কিছু নিয়েই কেউ নিশ্চিত নয়।"

টাইমস সাময়িকীর অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে নিবন্ধটি পাওয়া যাবে। এখানে তুলে দিচ্ছি ওয়েব সাইটের সেই মূল লেখাটির অংশবিশেষ পুরোটা পড়তে চাইলে সংগ্রহ করতে পারেন ফজলুল কাদের কাদেরীর লেখা "বাংলাদেশ জেনসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস বইটি"।

এখানে উল্লেখ্য যে টাইমস সাময়িকীর প্রচ্ছদ এবং প্রতিবেদনের মূল ছবিটি পেয়েছি লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য্যের কাছে।

মূল আলোচনায় ফিরে আসি, লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্যা হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস তাদের এক চমকপ্রদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যদিও হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেটের সেই প্রতিবেদন একটা দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে, অন্য কোন সময় এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলা যাবে। কারো আগ্রহ থাকলে আন্দালিব রাশদীর 'বিদেশীর চোখে একাত্তর' বইটা পড়ে দেখতে পারেন, সেখানে পুরো প্রতিবেদনটা দেয়া আছে। চমৎকার ব্যাপারটা হচ্ছে সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে একটা মানবধিকার সংগঠনের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে কাজ করতো অনেক বিদেশী সংগঠন, তারা যেমন খাদ্য, ঔষধের ব্যবস্থা করতো তেমনি বস্ত্র এবং থাকার জায়গা স্বাস্থ্যসেবা এসব নিয়েও কাজ করতো কিন্তু এসব সংগঠনের কেউই সেই সময় বর্ডার ক্রস করে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সাহস পায় নি, অপারেশন-ওমেগার দুঃসাহসী কর্মীরা কাজটা করলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সীমান্তে যে দুর্দশা তারা দেখতে পাচ্ছেন সেটার থেকেও অনেক খারাপ অবস্থা ভেতরের মানুষগুলোর। তা না হলে তারা দেশ ছেড়ে এই অনিশ্চিত শরণার্থীর জীবন বেছে নিতো না। তাছাড়া সীমান্তের এপাড়ে তো মাত্র এক কোটি বাকি সাড়ে ছয় কোটি তো ওপারে। দুঃসাহসী কাজটা তারা করে ফেলেন। তারাই মুক্তিযুদ্ধের সময় একমাত্র বিদেশী সংগঠন যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ত্রাণ বিতরণ করেন।

একদিন ত্রাণ বিতরণ করার সময় ৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করে পাকিস্তানীরা। তাদের যশোরের একটি কারাগারে ১১ দিন আটক রাখা হয় এবং এরপর সরাসরি লন্ডনে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। সংস্থাটির অন্যতম সদস্য বেন ক্রো হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেস কে জানায় যশোরে কারাগারে থাকাকালীন সময়ে তিনি জানতে পারেন এখন পর্যন্ত এখানে ২০ লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছে।

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে যাবার অনেক পর পহেলা অক্টোবর প্রকাশিত হয় এই খবর। তাহলে আঁচ করা সম্ভব এর মধ্যে আরও কত মানুষ মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। আর সীমান্তের ঐ পারের শরণার্থীদের কথা তো বাদই দিলাম।

এবারে আসি ন্যাশনাল জিওগ্রাফীর সেই বিশেষ সংখ্যাটি নিয়ে। যদিও পত্রিকাটি বাহাত্তরের কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পত্রিকা যখন ৩০ লক্ষ সংখ্যাটিকে মেনে নিয়েছে তখন আমাদেরও একটু খুঁজে ঘুরে আসা দরকার

প্রতিবেদনটি থেকে। ব্লগার শিক্ষানবিস সেই প্রতিবেদনটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন, আমি কেবল গণহত্যার অংশটুকু ছবি সহ তুলে দিচ্ছি;

গণহত্যা শেষে একটি জাতির উত্থান

স্লোগান দিয়ে বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কোন লাভ হয়েছে কি-না জানি না। শুধু জানি, পৃথিবীর ১৪৭তম স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ঠিকই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এদেশের মানুষ যেন নতুনভাবে জীবন সংগ্রাম শুরু করেছে। ১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা চিন্তা করলে একে সত্যিই অলৌকিক বলে ভুল হয়। বাংলাদেশীদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব সুস্পষ্ট। শহর বলি আর গ্রামই বলি, সর্বত্র একই অবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আর দেশের প্রতিটি স্থানেই পুনর্গঠনের কাজ চলছে। কিন্তু আরোগ্য লাভের এই প্রচেষ্টাও বোধ করি খুব কষ্টকর।

শেখ মুজিবের সরকার বলছে, দেশে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩০ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছে। সংখ্যাটি হয়তো অতিরঞ্জিত, কিন্তু সে সময় ঢাকাসহ এই বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক দেশের প্রতিটি প্রান্তে যে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গণহত্যার খুব কাছাকাছি।

যতদিনে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, ততদিনে পঁচে যাওয়া লাশের মাংস খেয়ে খেয়ে শকুনেরা আরও মোটাতাজা হয়ে উঠেছে। এতোই মোটা হয়েছে যে,

তারা আর আগের মতো স্বচ্ছন্দে উড়তে পারে না। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের যেন কোন প্রাণশক্তিই অবশিষ্ট নেই। থাকবে কি করে, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণশক্তির পুরোটাই যে বাঙালিরা যুদ্ধের ময়দানে ঢেলে দিয়ে এসেছে। সরকার ভিক্ষুকে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে। প্রয়োজনের খাতিরে তাকে বিশ্বব্যাপী ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াতে হয়েছে। আর এভাবেই ইতিহাসের বৃহত্তম ত্রাণ কর্মসূচির সূচনা ঘটেছে।

স্ক্যান্ডিনেভীয় এক দেশ থেকে ত্রাণ হিসেবে আসা একটি চালান এক্ষেত্রে উলেখ করার মত। তারা ভাল বুঝেই গরম কাপড় পাঠিয়েছে। ইউরোপে এই কাপড়গুলো স্ত্রি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। নাতিশীতোষ্ণ এক দেশে কি-না এলো স্কি-ক্লোদিং। ঢাকার এক ত্রাণকর্মী আমাকে বললেন, "অনেকেরই বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অনেকে মনে করে, হিমালয়ের কাছে পিঠে কোথাও হবে। আবার অনেকে ভাবে, দক্ষিণ দিকে থাইল্যান্ডের প্রতিবেশী হবে হয়তো।"

তর্কের খাতিরে যদি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ঐ সংখ্যাটাও বাদ দেই যেহেতু সংখ্যাটি বঙ্গবন্ধু দেশে আসার পর প্রকাশিত হয়েছে, তবু পরিষ্কার বলা যায় হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড হাইগেট এক্সপ্রেসের শহিদের সংখ্যা ২০ লাখ বলা সেই প্রতিবেদনটি যেটা প্রকাশ

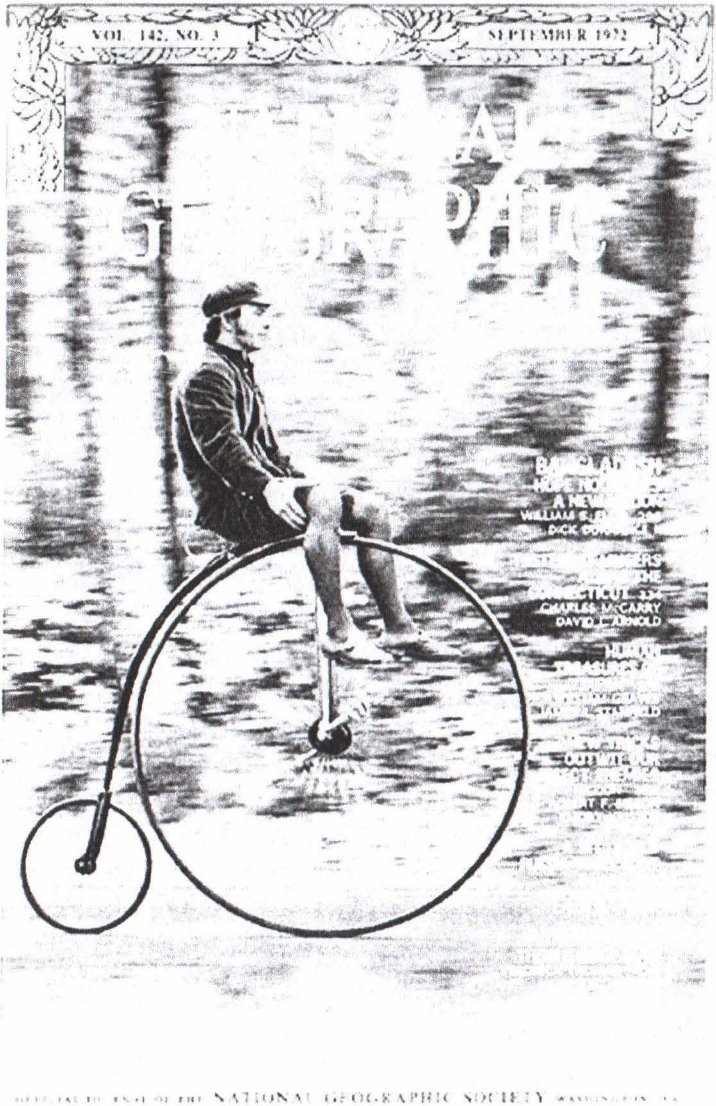

হয়েছিলো অক্টোবরের ১ তারিখ, সেই প্রতিবেদনের ঘটনা কাল সম্ভবত আগস্টের কিংবা বড়োজোর সেপ্টেম্বরে (কারণ বেন ক্রো নিজে সেই পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন না, এগারো দিন জেলে ছিলেন এবং তারপর ছাড়া পেয়ে দেশে যেতে কয়দিন

Operation Omega

THE SENTENCING of Ellen Connett and Gordon Slaven to two years' imprisonment by the Pakistani regime in Bangla Desh may be the most severe penalty ever imposed on non-violent direct actionists. They were members of the Operation Omega team, which has been attempting to take food and clothing in Bangla Desh, despite the opposition of the Pakistani Army. The Pakistani Government seem to want the population to suffer as much as possible, and will do anything they can to stop supplies being brought in to the stricken country. This policy of deliberate fiendishness is being opposed by the pacifists of Operation Omega, and pretty well nobody else. The orthodox relief agencies are content to help the refugees who have succeeded in reaching India.

The struggle will continue. Two more team members are being flown out, Joyce Kenniwell, who has already been arrested and deported to England by the Pakistanis, and Mike Thompson. A sit-in took place on October 8 at the office of the Head of Chancery at the Pakistan High Commission in London. The demonstrators were brutally handled by the police. Further demonstrations are being planned for Manchester, Derby and other provincial cities.

Yet considering the millions threatened with death by starvation, two people here, two people there, a sit-down here, a march there, does not amount to much. *Peace News* says that 'there are now about 30 part- or full-time workers in London alone'.

Thirty! The support given by left-wing movements has been hardly enthusiastic. The attitude of some people has been that the activities of the Omega team are bound to be no more than symbolical, and therefore it is better to concentrate on some form of action which can produce more solid results. And it is certainly true that there are so many horrors going on at the same time that it is hard to keep up with them. Many people must be punch-drunk after Biafra and Vietnam, and feel everything is just too much for them. On the other hand if nothing is attempted nothing is achieved.

If you feel prepared to plunge once more into the breach, details can be obtained from Operation Omega, 3 Caledonian Road, London, N.1, tel: 01-837 3860.

A.W.U.

লেগেছে আমরা জানি না কিন্তু যত কম সময়ই লাগুক ঘটনার সময়টা অক্টোবরের লেখা প্রকাশের অনেক আগে)।

এই নিউজটাকে জোর দিচ্ছি কারণ যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩০ লাখ শহিদের ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে করেন দাবী করেন সংখ্যাটা অনেক কম এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বানানো তাদের কাছে তুলে ধরতে যে সংখ্যাটা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে নি। আন্তর্জাতিক দৈনিক বলছে এপ্রিলে সাত লক্ষ, জুলাইতে দশ লক্ষ, সেপ্টেম্বরে বিশ লক্ষ তাহলে ডিসেম্বরে কত?

বাড়িয়ে বলা হচ্ছে কি?

আকাশ থেকে আসা ফিগার মনে হচ্ছে?

আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং স্বীকৃত গবেষণাপত্রে একাত্তরের শহিদের সংখ্যা

এই পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বে আমরা আলোচনা করবো পৃথিবীময় বিভিন্ন গণহত্যা, রাজনীতি, সংঘাত গবেষকের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালে হতাহতের সংখ্যা। দেখবো বিভিন্ন রিসার্চ পেপার, ডিকশনারি, এনসাইক্লোপিডিয়ায় এই গণহত্যা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে। সবশেষে আমরা দুইজন গবেষকের গবেষণা পদ্ধতি বিস্তারিত দেখবো। সংখ্যাটা তিরিশ লাখ, তিন লাখ, এক লাখ অথবা ছাব্বিশ হাজার যাই হোক না কেন এটা তো অবশ্যই এক বাক্যে মানতে হবে যে সংখ্যাটা অনেক বড়। সংখ্যাটা যে অনেক বড় সেটা এমনকি এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেনা প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা জেনারেল রাও ফরমান আলী। উল্লেখ্য এই রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীল-নকশা কারী, যুদ্ধের পর তার ডাইরি থেকে নিজ হাতে তৈরি করা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা পাওয়া যায়। সেই তালিকায় থাকা কাউকেই স্বাধীন বাংলায় খুঁজে পাওয়া যায় নি। ডক্টর মুনতাসির মামুন বছর কয়েক আগে পাকিস্তানী জেনারেলদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সেই সব দুর্লভ সাক্ষাৎকার পাওয়া যাবে তার গ্রন্থ 'সেই সব পাকিস্তানী'তে।

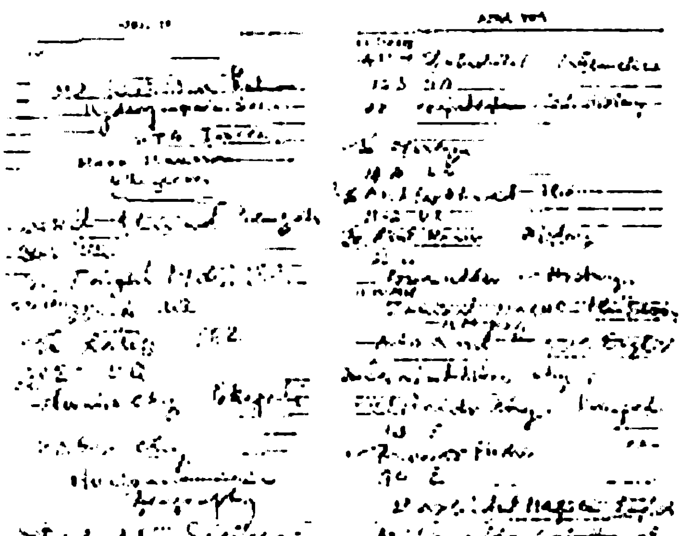

ডঃ মামুনকে সেই বইতে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রাও ফরমান আলী সেনাবাহিনীর হাতে বিরাট সংখ্যার হত্যাকাণ্ডের পক্ষে স্বীকারোক্তি দেন। সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত চুম্বক অংশ পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি :

'...মামুন ঐ সময় একজন সক্রিয় জেনারেল হিসেবে আপনি এত ব্যাপক আকারে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানতেন না?

ফরমান : আমি বিশ লাখ লোক নিহত হওয়ার হিসাব মেনে নিতে পারছি না।

মামুন : না, আমি ওটা নিয়ে তর্ক করতে চাচ্ছি না।

ফরমান : সংখ্যাটা ৪০/৫০ হাজারের মত হবে।

মামুন : তাহলে আপনার বিবেচনায় এই ৪০/৫০ হাজার বিরাট সংখ্যা নয় ?

ফরমান : না... এটা...।

মামুন : সেনাবাহিনী নিরীহ, নির্দোষ লোকদের হত্যা করেছে।

ফরমান : জি হ্যাঁ, সংখ্যাটা বিরাট। আমি স্বীকার করছি সংখ্যাটা সত্যিই বিরাট...'

এখানে স্বীকারোক্তির পাশাপাশি আরও একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মৃত মানুষের সংখ্যার ব্যাপারে বিভ্রান্তি। পাকিস্তান ১৯৭২ সালে করা তাদের হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে দাবী করে মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ২৬,০০০। ১৯৭২ সালের পর থেকে লাগাতার ভিত্তিহীন এই অপপ্রচার তারা চালিয়ে যাচ্ছে আজ পর্যন্ত, ডঃ মুনতাসির মামুন এই সাক্ষাৎকার নেন নব্বই-এর দশকে সুতরাং কমিশনের বলা ২৬,০০০ সংখ্যাটা ফরমান জানতেন না তা অসম্ভব। তারপরেও তিনি ডঃ মামুনকে বলেন সংখ্যাটা ৪০/৫০ হাজার।

এসব বিভ্রান্তির জবাব নির্মোহ ভাবে দিতে পারে মুক্তিযুদ্ধের ওপর করা বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রিসার্চ। যেখানে গণহত্যার পর হতাহতের সংখ্যা বের করার গাণিতিক সূত্র মেনে মৃত মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হওয়া অনেক গুলো গবেষণা থেকে কয়েকটি নিয়ে আজ আলোচনা করবো আমরা।

১) 'সেন্টার ফর সিস্টেমেটিক পিস'-এর ডিরেক্টর Dr. G. Marshall তাঁর 'Major Episodes of Political Violence 1946-2014' পেপারে দেখিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে।

২) Dr.Ted Robert Gurr (ছবি) এবং Dr. Barbara Harff দু'জন গণহত্যা গবেষক। এদের মাঝে Ted Robert Gurr বর্তমানে Maryland বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর Barbara Harff ইউএস নেভি একাডেমীতে পলিটিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষক। তারা দুইজনই পলিটিক্যাল সায়েন্সের দিকপাল হিসেবে পরিচিত। তাদের বিখ্যাত রিসার্চ যেটা পরবর্তীতে পুস্তক হিসেবেও সমাদৃত হয়; 'Toward Empirical

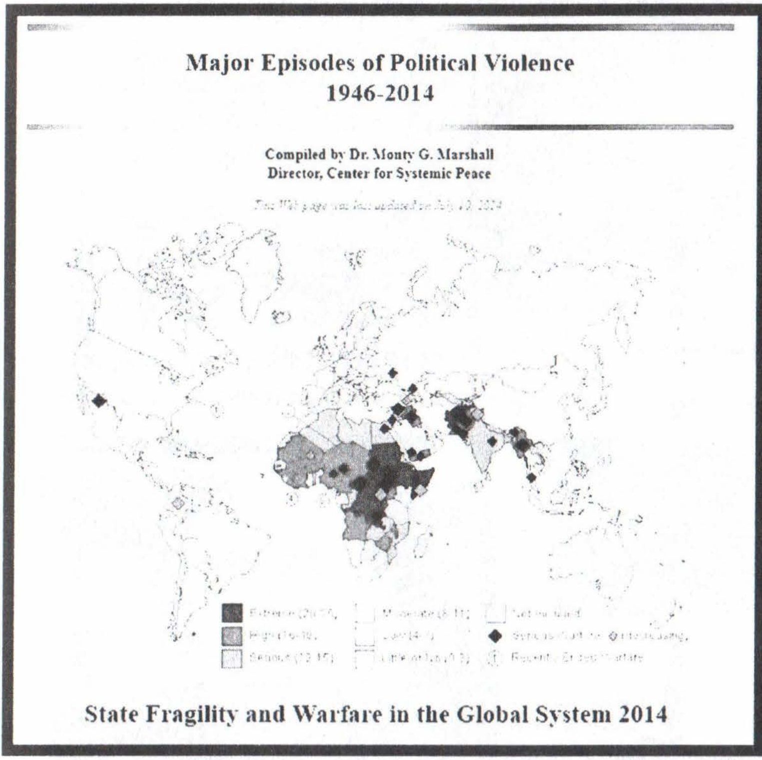

Theory of Genocides and Politicides' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। সেই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ১২,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

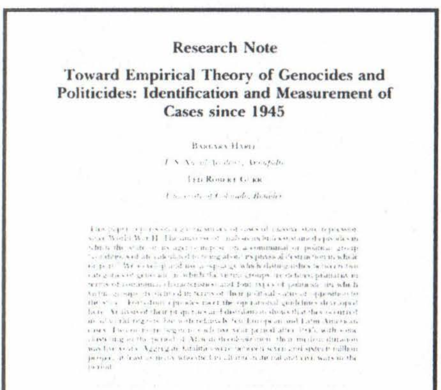

Research Note

Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases since 1945

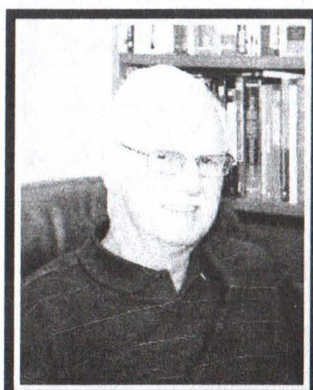

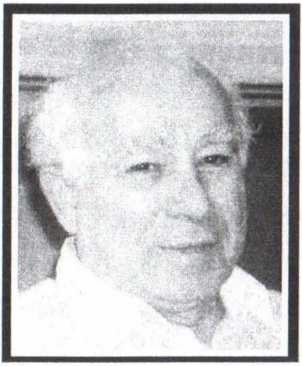

৩) Milton Leitenberg এর গবেষণা পত্র। যেটা প্রকাশিত হয় Cornell university থেকে, Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century শীর্ষক সেই পেপারে উল্লেখ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৫ লক্ষ।

৪) Dr. Jack Nusan Porter একজন লেখক গবেষক, সমাজকর্মী এবং যিনি 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অফ জেনোসাইড স্কলাস'-এর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাঁর সাড়া জাগানো বই genocide and human right। এই বইতে গুরুত্ব সাহকারে উল্লেখ করা হয়েছে ৭১

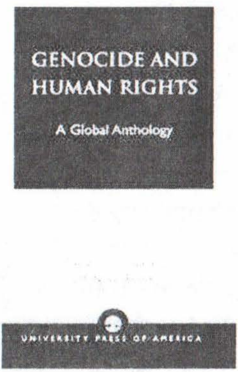

সালে বাংলাদেশে শহিদের সংখ্যা ১০ থেকে ২০ লক্ষ।

৫) ১৯৪৫ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৩০০ টি আন্তর্জাতিক সংঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে 'International Conflict: A Chronological Encyclopedia of Conflicts and Their Management, 1945-1995' বইটিতে। লেখক Jacob Bercovitch Ges Richard Jackson দু'জনেই আন্তর্জাতিক সংঘাত বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছেন সংখ্যাটা দশ লক্ষ।

৬) গণহত্যা গবেষক Tom Hartman এবং

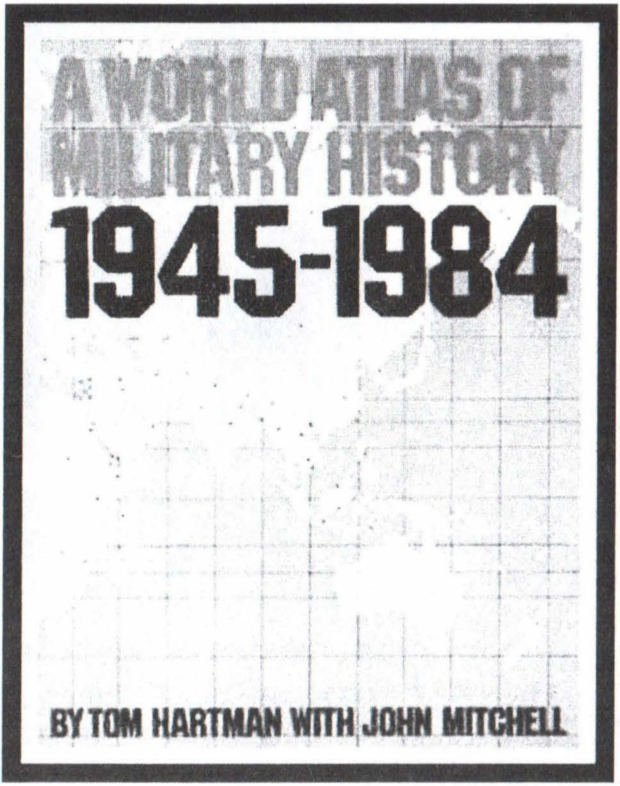

John Mitchel তাদের লেখা A world atlas of military history, ১৯৪৫-১৯৮৪ বইতে বলেছেন ৭১এর যুদ্ধে দশ লাখ মানুষ মারা যায়।

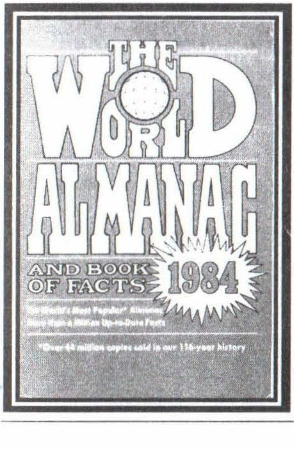

৭) World Almanac And Book of Facts ১৯৮৪। যাদের বলা হয়ে থাকে তথ্যপঞ্জির জগতে

সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা তাদের বেস্ট সেলার ১৯৮৪ সালের সংখ্যায় বলেছে ১৯৭১ সালের সংঘাতে নিহতের সংখ্যা ১০ লক্ষ।

৮) Compton's Encyclopedia তাদের গণহত্যা পরিচ্ছেদে মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা লিখেছে ৩০ লক্ষ।

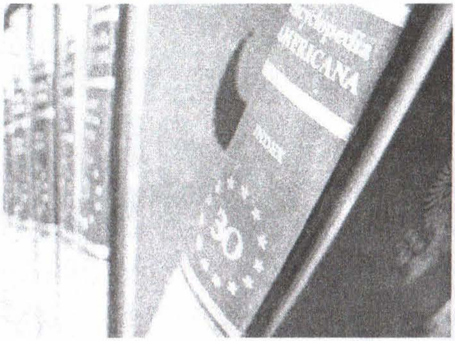

৯) Encyclopedia Americana তাদের ২০০৩ সালের সংস্করণে বাংলাদেশ নামক অধ্যায়ে একাত্তরে মৃত মানুষের সংখ্যা উল্লেখ করেছে তিরিশ লক্ষ।

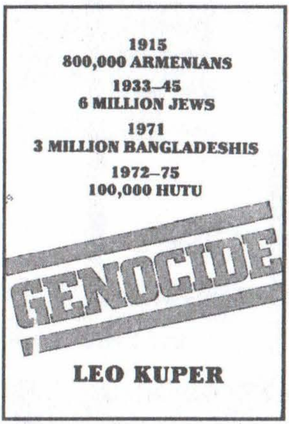

১০) গণহত্যা গবেষক লিও কুপার তাঁর বিখ্যাত জেনসাইড বইতে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছে। এই বইটি নিয়ে আমাদের এই গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১১) UN-এর ইউনির্ভাসাল হিউম্যান রাইটসের ডিকলেয়ারেশান ১৯৮১ অনুসারে: 'মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১ এর গণহত্যা সল্পতম সময়ে সর্ববৃহৎ। গড়ে প্রতিদিন ৬,০০০ থেকে ১২,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে গণহত্যার ইতিহাসে প্রতিদিনে সর্বোচ্চ নিধন হার'। এই ডিকলেয়ারেশান যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হবার প্রায় দশ বছর পরে দেয়া হয়েছে সুতরাং গণহত্যা যে ২৬৬ দিন চলেছিল তারা সেটা জানতো। রাউন্ড ফিগার ২৬০ দিন ধরে বাঙালী নিধনের হয়েছে ১৫,৬০,০০০ থেকে ৩১,২০,০০০ পর্যন্ত।

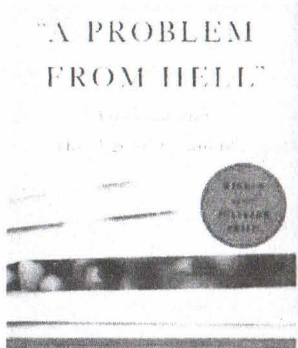

১১) পুলিৎসার পুরস্কার বিজয়ী A Problem From Hell: America and the Age of

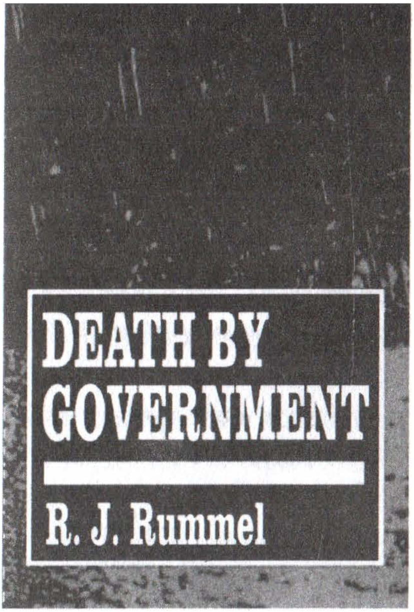

Genocide গ্রন্থের লেখিকা Samantha Power পৃথিবীর বিভিন্ন গণহত্যার খতিয়ান বের করেছে। বেস্ট সেলার এই বইটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা বলা হয়েছে ১০ থেকে ৩০ লক্ষ।

১২) বিশিষ্ট রাজনীতি বিজ্ঞানী Rudolph Joseph Rummel STATISTICS OF DEMOCIDE, বইটিকে দাবি করা হয়ে থাকে বিশ্বে গণহত্যা নিয়ে সংখ্যাগতভাবে অন্যতম কমপ্রিহেন্সিভ বই। বইটির অষ্টম অধ্যায়ে Statistics Of Pakistan's Democide Estimates, Calculations, And Sources নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে সর্বোচ্চ ৩০,০৩,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আমরা আমাদের এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে রামেলের গবেষণা এবং তাঁর গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কিছুদিন আগে আলমগীর মহিউদ্দিন জনকণ্ঠ পত্রিকায় ২০ আগস্ট ২০১৪ রামেলের গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেছেন। তিনি লিখেছেন;

"অতীত ও বর্তমানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণহত্যা, অত্যাচার, অনাচার, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও গুম চলছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। যুদ্ধ বা বিপ্লব হয় কখনো কখনো। দুই প্রক্রিয়াতেই জীবন নাশ ঘটে। একজন বিখ্যাত অনুসন্ধানকারী, ড. রুডলফ যোসেফ রামেল প্রথমবারের মতো জানার চেষ্টা করেন কোন প্রক্রিয়ায় বেশি জীবনহানি হয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, না যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিপ্লব-অভ্যুত্থানে?"

প্রথমত আমরা আলোচনা করব কয়েকটি বহুল প্রচলিত শব্দ নিয়ে, যেটার অর্থ প্রায়শ আমাদের বিভ্রান্ত করে।

Genocide বা গণহত্যা: Among other things, the killing of people by a government because of their indelible group membership (race, ethnicity, religion, language). অর্থাৎ গণহত্যা হচ্ছে এমন একটি পরিকল্পিত

হত্যাকাণ্ড যা কোন সরকার বা শাসক কোন অমোচনীয় জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা ভাষাগত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করে।

Politicide বা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড: The murder of any person or people by a government because of their politics or for political purposes. অর্থাৎ কোন সরকার বা গোষ্ঠী যদি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তবে সেইরকম হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলা হবে।

Mass Murder বা নির্বিচারে মানব হত্যা: The indiscriminate killing of any person or people by a government. অর্থাৎ একটি সরকার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যা করা।

ড. রামেল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে হত্যাকাণ্ডগুলোকে একটি নতুন নামে অবহিত করেন। যেটি ইংরেজি ভাষায় একটি নতুন সংযোজন, তাঁর আবিষ্কৃত শব্দটি 'ডেমোসাইড'। রামেল এ ক্ষেত্রে আর একটি শব্দও আবিস্কার করেছেন তা হলো, 'মরটাক্রেসি'। এ দুয়ের (Democide and mortacracy) মাঝে পার্থক্য হলো প্রথমোক্তটি হচ্ছে ক্ষমতাসীন দ্বারা ইচ্ছাকৃত হত্যা। আর অপরটি অনিচ্ছাকৃত। তবে দুই প্রকারেই হত্যার সংখ্যা বিশাল।

ড. রামেল তাঁর গবেষণায় টানা আট বছরের ধরে খবরের কাগজ, পুরনো নথি, ইতিহাস ও বক্তব্য গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে 'ডেমোসাইড: সরকারি হত্যা' নামে চারখণ্ডে একটি বই লিখেছেন।

রামেল পরিষ্কারভাবেই কোনো দল ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমকে ব্যবহার করে এবং সে প্রক্রিয়া ক্ষমতারোহণের পরেও বিরতিহীন চলতে থাকে, সে হত্যাকাণ্ডগুলোকে 'ডেমোসাইড' বলেছেন। যে দেশের সরকার যত স্বৈরাচার সেখানে এই ডেমোসাইড কর্মকাণ্ড তত প্রবল এবং এসব সরকার হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটায় সাধারণত প্রতিবাদী ও প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে। তারা এজন্য ক্ষমতায় গিয়েই সর্বাগ্রে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে একান্ত নিজের মানুষ দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রামেল দেখিয়েছেন, এই শতাব্দীতে (১৯০০-৯৯) ডেমোসাইড হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা এ সময়ের সব যুদ্ধের হতের সংখ্যার চেয়ে ছয় গুণ। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও এত মানুষের মৃত্যু ঘটেনি। তিনি লিখেছেন এই একশ বছরে বিশ্বের ২৫টি দেশে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটির ওপরে। রামেল তাঁর বই 'ডেমোসাইড : সরকারি হত্যা' শীর্ষক বইতে কোন সরকার কত হত্যা করেছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রামেল বলেছেন, সঠিক সংখ্যা নির্ণয় কঠিন, কেননা এর প্রকৃ ত তথ্য রক্ষা করা হয়নি বা করতে দেয়া হয়নি।

তার হিসাব অনুসারে বিংশ শতাব্দীতে;

চীনের সরকার (১৯২৮-৮৭) হত্যা করে ৭,৩০,০০,০০০;

সোভিয়েত রাশিয়া হত্যা করে ৬,৮০,০০০;

(জার্মানি) নাজি সরকার ১,০২,১৪,০০০;

জাপান সরকার ৫৯,৬৪,০০০;

খেমাররুজ ২০,৩৫,০০০;

ভিয়েতনাম ১৬,৭০,০০০;

পোল্যান্ড- ১৫,৮৫,০০০;

যুগোস্লাভিয়া ১০,৭২,০০০;

কোরিয়া ১৬,৬৩,০০০;

পাকিস্তান ১৫,০৩,০০০ থেকে ৩০,০৩,০০০;

মেক্সিকো ১৪,১৭,০০০।

সব মিলে রামেলের অনুসন্ধানে প্রায় ১০০ বছরে ২,৬২,০০,০০০ মানুষকে বিভিন্ন সরকার শুধু ক্ষমতার জন্য হত্যা করেছে। রামেল লিখেছেন, এ শতাব্দী (বিংশ শতাব্দী) ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের হত্যার ইতিহাস। আর যারা সহযোগী ছিল তারাও রাষ্ট্রের প্রকারান্তরে অংশ, যেমন ডেথ স্কোয়াড, ক্ষমতাসীন দলের সশস্ত্র ক্যাডার অথবা ভাড়াটে গেরিলা। এই সহযোগীরা গণহত্যায় নিয়োজিত ছিল। এরা ডেমোসাইডের এক-চতুর্থাংশ মানুষ হত্যা করে, যা গণহত্যা (Genocide) বলে পরিচিত।

রামেলের গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে লিখেছেন বগার ডঃ পিনাকী ভট্টাচার্য। তাঁর সেই লেখাতে তিনি বলেন;

"পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয়েছে সে যুদ্ধগুলোর কোনটাতেই বেসামরিক মৃত্যুর কোন নাম ধরে তালিকা নাই। এমন তালিকা এখনো করা হয়না। কারণ এটা করা সম্ভব না। যুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক অবস্থা, এটা রোড ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্ট নয়। এসময় শুধু তথ্য সংগ্রহের সমস্যা নয়, এই অস্বাভাবিক অবস্থায় আরো অনেক ঘটনা ঘটে। যেমন, ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দেশ ত্যাগ করে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফেরেনা, অনেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, পরিবার-সমাজ বিহীন ভবঘুরে মানুষরাও নিহত হন যাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়না। এছাড়াও আছে যুদ্ধের কারণে পরোক্ষ মৃত্যু। যারা হত্যা করে তারাও অপরাধ ঢাকার জন্য মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে। এসব কারণেই যুদ্ধে নিহতের পরিসংখ্যান সব সময় একটা সংখ্যা; একটা নামসহ পুর্নাঙ্গ তালিকা নয়। এটাই পৃথিবীব্যাপী গৃহীত নিয়ম। যারা মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের তালিকা চায় তাদের যে কোন একটা গণযুদ্ধের বেসামরিক নিহত নাগরিকদের তালিকা দেখাতে বলুন। যুদ্ধে মৃত বা নিখোঁজ সামরিক ব্যাক্তিদের তালিকা করা সম্ভব কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিদের নয়।"

এরপর তিনি আলোচনা করেন গবেষক রামেলের গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে। আর জে রুমেল তার 'চায়নাস বাডি পলিটিক্স' বইয়ে এবং 'লিথাল পলিটিক্স' বইয়ের পরিশিষ্টে গণহত্যার পরিসংখ্যান কিভাবে করতে হয় সেটার একটা মেথডোলজি দিয়েছেন। রামেলের পদ্ধতি অনুসারে প্রাপ্ত মৃতের সংখ্যাকে আরো সাব গ্রুপে ভাগ করতে হবে যেমন জেলা ওয়ারী, নারী পুরুষ অনুযায়ী এরপর প্রয়োজনে ধর্ম বা জাতি অনুযায়ী; ফলে একটা গ্রহণযোগ্য সংখ্যায় উপনিত হওয়া যায়। এটা অনেক সময়েই একটা রেঞ্জ, যেমন হলোকাস্টে মৃতের সংখ্যা ৪২ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ। রামেল দিয়েছেন তিনটা রেঞ্জ দিয়েছেন লো, মিডিয়াম, হাই।

রামেলের গবেষণার বাংলাদেশ অংশে এসে জেলা-থানা ওয়ারী যে হিসাব দেখানো হয়েছে তা যারপনাই বিস্ময়কর এবং কৌতূহল উদ্দীপক। ICSF গবেষক এবং দেশের বিখ্যাত বগিং প্ল্যাটফর্ম সচলায়তনের নিয়মিত লেখক কৌস্তুভ তাঁর 'তথ্য' বিনা মিথ্যা বোনা' বগে ভারতীয় গবেষক শর্মীলা বোসের প্রত্যুত্তরে রামেলের কথা লিখেছেন সবিস্তরে

রামেলের Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900, বইতে তিনি দু'শোরও বেশি শাসনকালকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন তাদের হত্যা তথ্য 'The Pakistani Cutthroat State' নামের অষ্টম চ্যাপ্টারে উনি লিখেছেন,

"In 1971 the self-appointed President of Pakistan and Commander-in-Chief of the Army, General Agha Mohammed Yahya Khan and his top generals prepared a careful and systematic military, economic, and political operation in East Pakistan (now Bangladesh). They also planned to murder its Bengali intellectual, cultural, and political elite. They also planned to indiscriminately murder hundreds of thousands of its Hindus and drive the rest into India. And they planned to destroy its economic base to insure that it would be subordinate to West Pakistan for at least a generation to come. This despicable and cutthroat plan was outright genocide.

After a well-organized military buildup in East Pakistan the military launched its campaign. No more than 267 days later they had succeeded in killing perhaps 1,500,000 people, created 10,000,000 refugees who had fled to India, provoked a war with India, incited a counter-genocide of 150,000 non-Bengalis, and lost East Pakistan."

কৌস্তুভ লিখেছেনঃ

"ওনার অধ্যাগুলোর যা ধরন দেখলাম, এই ধরনের আলোচনায় ওনার নিজের কথা খুবই অল্প, ছোট খানিক ইন্ট্রোডাকশনের পরই একটি সামারাইজড টেবিলে উনি প্রতিটি সূত্র অনুসারে নানা বিভিন্ন বিষয় যেমন বাংলাদেশী হত্যা, বিহারী হত্যা, যুদ্ধে নিহত সেনা, অসুস্থ, উদ্বাস্তু ইত্যাদি সব কিছুর উপর আলাদাভাবে সংখ্যাগুলো

TABLE 8.1
Pakistani Democide
Estimates, Sources, and Calculations

LIST #	STATES	BEGIN YEAR	M	END YEAR	M	ESTIMATED DEAD (000) LOW	MID	HIGH	SOURCE	NOTES
1	**WAR/REBELLION/COMMUNAL VIOLENCE DEAD**									
2	**SECOND KASHMIR WAR**									
3	Pakistan dead	1965	8	1965	9		3.8		Small & Singer,82,93	
4	**INDO-PAKISTAN (BANGLADESH) WAR**									
5	WAR-DEAD	1971	12	1971	12	3	5	8	[from table 8.2, line 7]	
6	**CIVIL WAR-DEAD**									
7	WAR-DEAD	1971	12	1971	12	50	70	100	[from table 8.2, line 16]	
8	**OTHER REBELLION DEAD**									
9	dead	1972		1982		9			Defense Monitor,83,14	separatist/guerrilla conflict, conflict continuing.
10	dead	1972		1986		9			SIPRA,87,312	govt. vs. separatist and anti-govt rebels.
11	dead	1973		1977			9		Brogan,89,570	Baluchi insurrection.
12	dead	1973		1977			9		Sivard,85,10	from William Eckhardt; Baluchis vs. government for separate state, 6,000 civilian dead.
13	dead	1973		1977			9		Ball & Leitenberg,91,25	3,000 military; Baluchis vs govt./Afghan. interv.
14	dead	1973		1977		8.6			TIME (3/10/80),35	Baluchistan insurrection; soldiers and guerrillas.
15	CONSOLIDATED	1972		1986		9	12	14		
16	**COMMUNAL VIOLENCE**									
17	non-Muslims killed	1964	1	1964	?	40			Roy,n.d.,33	communal violence in East Pakistan; govt. stood by and govt. agents played a role.
18	killed	1964					5		O'Donnell,84,63	in communal violence
19	CONSOLIDATED	1964				5	10	40		
22	**TOTAL WAR/REBELLION/VIOLENCE DEAD**									
23	DEAD	1956		1987		71	101	166	[sum of lines 3, 5, 7, 15, and 19]	
24	**DEMOCIDE**									
25	**BY WEST PAKISTAN**									
26	Baluchi tribesmen	1958		1974+			?		Harff and Gurr,88,364	
27	killed	1965					?		Payne,73,44-5	whole rebellious tribe of Baluchis wiped out, no survivors.
28	suppression	196?				0.2			Rafiq-Ul-Islam,81,41	Baluchistan uprising; "hundreds of unarmed Baluchis" killed.
29	executions	1977		1984?				1	ZIA'S LAW...,85,68	number of these that are of political unknowns.
30	reprisals	1983	8	1983	10		0.824		Gilbert,85,15	by police and army units in Sind Province; in response to "civil disobedience."
31	ESTIMATE	1958	10	1987		3				
32	E. PAK. DEMOCIDE	1971	3	1971	12	300	1,500	3,000	[from table 8.2, line 82]	
33	**DEMOCIDE**	1958	10	1987		303	1,503	3,003	[sum of lines 31 and 32]	
34	**BY EAST PAKISTAN BENGALIS**									
35	**DEMOCIDE**	1971	3	1971	12	50	150	500	[from table 8.2, line 167]	
36	**REFUGEES**									
37	TO INDIA	1971	3	1971	12	9,800	10,000	12,000	[from table 8.2, line 206]	
38	**POPULATION**									
39	**PAKISTAN (EAST AND WEST)**									
40	population	1960					92,727		UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1961.	
41	population	1969					111,830		DEMOGRAPHIC,72,134	UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1971.
42	population	1970					114,190		DEMOGRAPHIC,72,134	UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1971.
43	population	1971					116,600		DEMOGRAPHIC,72,134	UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1971.
44	population	1973					71,200		WORLD MILITARY...,82,53	from US Bureau of the Census.
45	POPULATION	1971	3				91,515		[average of lines 41 and 44 in order to compensate for loss of E. Pakistan's population after 1971]	
46	**EAST PAKISTAN**									
47	**DACCA**									
48	Dacca pop.	1971					1,000		Payne,73,7	
49	**HINDUS**									
50	Hindus	1961					9,950		Roy,n.d.,161	
51	Hindus	1970					15,000		Mascarenhas,71,7-8	
52	Hindus	1971					10,000		The International...,72,97	
53	Hindus	1971						10,000	Chowdhury,72,111	"nearly."
54	Hindus	1971					10,000		Choudhuri,72,68	
55	Hindus	1974					10,439		Roy,n.d.,161	
56	Hindus	1978					6,000		Roy,n.d.,4	from Bangladesh government.
57	Hindus	1981					9,500		Roy,n.d.,95	should have increased to 28m from 13m in 1947.
58	HINDUS	1971	3				10,000		[estimate]	
59	**MOSLEMS**									
60	Moslems	1961					50,840		Roy,n.d.,194	
61	Moslems	1971					65,000		Mascarenhas,71,7	
62	Moslems	1974					71,478		Roy,n.d.,194	
63	MOSLEMS	1971	3				65,000		[from line 61]	
64	**NON-BENGALIS**									
65	non-Bengalis	1971					6,000		TERROR IN...,n.d.,10	from WASHINGTON POST (5/13/71).
66	non-Bengalis	1971					5,000		TERROR IN...,n.d.,11	from THE TIMES of London (5/17/91).
67	non-Bengalis	1972					682		Muhith,78,236	from Inter'l Com. of the Red Cross.
68	NON-BENGALIS	1971	3				5,500		[average of lines 65 and 66]	
69	**OVERALL**									
70	population	1961					50,800		Johnson,75,73	from census; "now considered...considerably
71										understated."
72	population	1961					50,840		Roy,n.d.,161	
73	population	1971					75,000		Mullick,72,	from an Indira Gandhi letter to President Nixon.
74	population	1971					75,000		Mascarenhas,71,2	
75	population	1971					75,000		Payne,73,2	
76	population	1971	12				70,000		Mascarenhas,86,v	
77	population	1974					71,300		Johnson,75,73	from census; provisional.
78	population	1974					71,478		Roy,n.d.,161	
79	CONSOLIDATED	1971	3				75,000		[from lines 73 to 76]	
80	SUM TOTAL	1971	3				75,000		[Moslems plus Hindus: sum of lines 58 and 63]	
81	**DEMOCIDE RATES**									
82	**PAKISTAN**									
83	**OVER COUNTRY**									
84	**OVERALL RATE %**	1958	10	1987		.33	1.64	3.28	[(line 33/line 45)*100]	
85	**ANNUAL RATE %**	1958	10	1987		.011	.056	.112	[(line 84/28.25 years]	
86	**ANNUAL RATE %**	1969	3	1971	12	.117	.58	1.16	[(line 84/2.83 years]	
87	**OVER EAST PAKISTAN**									
88	**OVERALL RATE %**	1971	3	1971	12	2.00	4.00	4.00	[(line 32/line 80)*100; values reordered low to high]	
90	**BENGALIS (AWAMI LEAGUE) OVER EAST PAKISTAN**									
91	**OVERALL RATE %**	1971	3	1971	12	.067	.2	.667	[(line 35/line 80)*100]	

*See footnotes table 2.1

সাজিয়ে দিয়েছেন। সন-তারিখ, উৎস, টীকা তো দিয়েছেনই, সংখ্যাগুলোও তিনটে আলাদা কলামে সাজানো– যদি মূলে 'অ্যাট লিস্ট' বলা থাকে তবে 'লো', যদি 'আপ টু' বা 'অ্যাট মোস্ট' বলা থাকে তবে 'হাই', আর 'অ্যারাউন্ড' বা 'অ্যাপ্রক্সিমেট' ইত্যাদি বলা থাকলে 'মিড'।

আর তথ্য সাজানো তো বটেই, ওনার হিসেব করার পদ্ধতিটাও বেশ যুক্তিসঙ্গত। ধরুন জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর চলা একটা যুদ্ধে, ক বলেছেন জানুয়ারিতে ১০০জন মারা গেছে, খ বলেছেন ডিসেম্বরে ৫০০ জন মারা গেছে, গ বলেছেন পুরো যুদ্ধে ৩০০০ জন মারা গেছে, আর ঘ বলেছেন প্রথম ৫ মাসে ১০০০ জন মারা গেছে। তাহলে চারটে সূত্র থেকে চারটে মাসিক মৃত্যুর হার উনি বের করেছেন- ১০০, ৫০০, ২৫০, ২০০।

সবচেয়ে কমটা নিলে মোট মৃত্যুর হার ১২০০, সবচে বেশিটা নিলে ৬০০০, আর গড়ে ৩১৫০। অবশ্য, যদি কোনো সূত্রে ঠিকমত রেফারেন্স দেওয়া না থাকে, বা তথ্য অসম্পূর্ণ বা দুর্বল বা অবাস্তব মনে হয়, উনি সেসব কারণ পাশে টীকায় উল্লেখ করে দিয়ে সেগুলো বাদ দিয়েছেন।"

এখানে উল্লেখ্য রামেল কেবল প্রাইমারী সূত্রই নিয়েছেন, অর্থাৎ কোনো সংবাদ প্রতিবেদন কোনো বইয়ের তথ্যকে রেফারেন্স হিসেবে দিলে উনি সেই খবরটাকে সূত্র না বলে সরাসরি বইটাকেই বলেছেন। তাঁর গবেষণাই যেমন বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির কথা এসেছে তেমনি এসেছে বিহারী হত্যাকাণ্ড, পাকিস্তানী সেনা হত্যা, ভারতীয় সেনা হত্যার মত খুঁটিনাটি ব্যাপার গুলোও বগার তারেক লিংকন সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ "বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, প্রসঙ্গ : ৩০ লাখ বাঙালী হত্যার আইকনিক মিথ" নিবন্ধে রামেলের ছক গুলো তুলে ধরেছেন প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহ রামেলের STATISTICS OF DEMOCIDE, আট নাম্বার অধ্যায়ের Statistics Of Pakistan's Democide Estimates, Calculations, And Sources প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামে ৩০,০৩,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

31	ESTIMATE	1958	10	1987		3				
32	E. PAK. DEMOCIDE	1971	3	1971	12	300	1,500	3,000	[from table 8.2, line 82]	
33	DEMOCIDE	1958	10	1987		303	1,503	3,003	[sum of lines 31 and 32]	
34	BY EAST PAKISTAN BENGALIS									
35	DEMOCIDE	1971	3	1971	12	50	150	500	[from table 8.2, line 167]	
36	REFUGEES									
37	TO INDIA	1971	3	1971	12	9,800	10,000	12,000	[from table 8.2, line 206]	
38	POPULATION									
39	PAKISTAN (EAST AND WEST)									
40	population	1960					92,727		UN DEMOGRAPHIC YEARBOOK 1961.	
41	population	1969					111,830		DEMOGRAPHIC,72,134	UN DE
42	population	1970					114,190		DEMOGRAPHIC,72,134	UN DE
43	population	1971					116,600		DEMOGRAPHIC,72,134	UN DE
44	population	1973					71,200		WORLD MILITARY...,82,53	from
45	POPULATION	1971	3				91,515		[average of lines 41 and 44 in	

ডেমিসাইড বাংলাদেশ তালিকার ৩৩ নম্বর সারিতে R.J. Rummel ৩০ লক্ষ ৩ হাজার মানুষের প্রাণ হারানোর কথা বলেছেন উচ্চ সম্ভাবনার কলামে আর মধ্যম সম্ভাবনায় বলেছেন ১৫ লক্ষের কথা। ৩৩ নাম্বার লাইনে লাল কালির বৃত্তটিতে উল্লে-খিত ৩,০০৩ এর সাথে ছকের প্রথমে উল্লেখিত তিনটি শূন্য বসালে কাঙ্খিত সংখ্যাটি

পাওয়া যাবে। আর রিফিউজি বা শরণার্থীর ক্ষেত্রে ৩৭ নম্বর সারিতে মধ্যম এবং উচ্চ হিসেবে যথাক্রমে ১ কোটি এবং ১ কোটি ২০ লক্ষের কথা বলেছেন।

Dr.Ted Robert Gurr (ছবি) এবং Dr. Barbara Harff দুজনের কথা আগেই বলেছি। এঁদের গবেষণা নিয়েও লিখেছিলেন ডঃ পিনাকী। তিনি বলেন,

364 *Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides*

TABLE 1. Genocides and politicides since World War II.[a]

Country	*Duration of episode*	*Victimized groups*	*Number of victims*[b]	*Type of episode*
USSR[c]	1943–47	Repatriated Soviet nationals	500–1,100	Repressive
USSR[c]	Nov. 1943–Jan. 1957	Chechens, Ingushi, Karachai, Balkars, Kalmyks	230	Hegemonial
USSR[c]	May 1944 to 1967–68	Meskhetians, Crimean Tatars	57–175	Hegemonial
China	Feb.–Dec. 1947	Taiwanese nationalists	10–40	Repressive
USSR[c]	Oct. 1947–?	Ukrainian nationalists	?	Repressive
Madagascar	Apr. 1947–Dec. 1948	Malagasy nationalists	10–80	Repressive
Malaya	1948–56	Chinese	5–20	Repress./hegem.
PR China	1950–51	Kuomintang cadre, rich peasants, landlords	800–3,000	Revolutionary
N. Vietnam	1953–54	Catholic landlords, rich and middle peasants	15	Revolutionary
Sudan[d]	1952–72+	Southern nationalists	100–500	Repressive
Pakistan[d]	1958–74+	Baluchi tribesmen	?	Repress./hegem.
PR China	1959	Tibetan nationalists, landowners, Buddhists	65	Hegemonial
Iraq[d]	1959–75	Kurdish nationalists	?	Repress./hegem.
Angola	May 1961–62	Kongo, Assimilados	40	Repressive
Algeria	July–Dec. 1962	Harkis, OAS supporters	12–60	Retributive
Paraguay	1962–72	Ache Indians	0.9	Xenophobic
Rwanda	1963–64	Tutsi ruling class	5–14	Retributive
Laos	1963–65	Meo tribesmen	18–20	Revol./repress.
Zaire[e]	Feb. 1964–Jan. 1965	Educated Congolese, missionaries, Europeans	1–10	Revolutionary
S. Vietnam	1965–72	Civilians in NLF areas	475	Repressive
Indonesia	Oct. 1965–66	Communists, Chinese	500–1,000	Repress./xeno.
Burundi[d]	1965–73+	Hutu leaders, peasants	103–205	Repressive
Nigeria	May–Oct. 1966	Ibos living in the North	9–30	Xenophobic
PR China	May 1966–75	Cultural Revolution victims	400–850	Revolutionary
Guatemala	1966–84+	Indians, leftists	30–63	Repressive
India	1968–82	Naxalites	1–3	Repressive
Philippines	1968–85	Moro nationalists	10–100	Repress./hegem.
Eq. Guinea	Mar. 1969–79	Bubi tribe, political opponents of Macias	1–50	Repress./hegem.
Uganda	Feb. 1971–79	Karamojong, Acholi, Lango, Catholic clergy, Amin's political opponents	100–500	Repress./hegem.
Pakistan	Mar.–Dec. 1971	Bengali nationalists	1,250–3,000	Repress./hegem.
Chile	Sept. 1973–76	Leftists	5–30	Retributive
Ethiopia	1974–79	Political opposition	30	Revolutionary
Kampuchea	1975–79	Old regime loyalists, urban people, disloyal cadre, Muslim Cham	800–3,000	Revolutionary
Indonesia	Dec. 1975–present	East Timorese nationalists	60–200	Repress./hegem.
Argentina	1976–80	Leftists	9–30	Repressive
Zaire[d]	1977–83+	Opponents of Mobutu regime	3–4	Repressive

১৯৭১ এর গণহত্যাকে শুধু জেনোসাইড বললে সম্ভবত কম বলা হয় এটা জেনসাইডের পাশাপাশি পলিটিসাইড ও বটে। সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দু সম্প্রদায়, আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী সমর্থক ও তাঁদের পরিবার, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া বামপন্থী দলগুলোর নেতা, কর্মী সমর্থক ও তাঁদের পরিবার ছিল এই জেনোসাইডের লক্ষ্য। ধর্মীয় সংখ্যালঘুর পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াও ছিল এই জেনোসাইডের লক্ষ্য।

"পলিটিসাইড" এই টার্মটি ব্যবহার করা হয় Barbara Harff এবং Ted Robert Gurr-এর ২০০৮ সালে প্রকাশিত যৌথ গবেষণা পত্রে। ১৩ পৃষ্ঠার সেই গবেষণা পত্রে ১৯৪৫ সাল থেকে সকল জেনোসাইড এবং পলিটিসাইডের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন এই গবেষকদ্বয়। এই গবেষণা পত্রে বাংলাদেশের গণহত্যার এস্টিমেইটেড সংখ্যার হিসাব দেয়া আছে ৩৬৪ পৃষ্ঠার টেবিলে। সেখানে ১৯৭১ এ নিহতদের সংখ্যা উল্লেখ আছে ১২ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে তিরিশ লক্ষ।

আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য গবেষণা ১৩ পৃষ্ঠার পত্রটি থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে নিহত বাঙালীদের অংশটি তুলে দেয়া হল নিচে।

অনেকের মনে খটকা লেগে থাকতে পারে যে বেশিরভাগ গবেষকের মতে সংখ্যাটা ১০ থেকে ১৫ লক্ষের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, গল্পটা এখানেই শেষ হয় নি শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের বেশিরভাগ গবেষক গণনায় আনেননি। এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষের স্থানান্তরে প্রচুর মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি আমাদের ধারণা অনুসারে কেবল শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের সংখ্যাই ৬ থেকে ১২ লাখ পর্যন্ত হতে পারে।

এছাড়া হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Global Health and Population বিভাগের অধ্যাপক Dr. Richard Cash বলেছেন, "আমরা পাবলিক হেলথের লোক হিসাবে যুদ্ধের সরাসরি প্রাণহানি ছাড়াও 'কোল্যাটারাল ড্যামেজের' দিকে নজর রাখতে চাই। এবং এই যুদ্ধের ফলে প্রায় দশ মিলিয়ন মানুষকে ঘরছাড়া হয়ে ভারতে পালাতে হয়েছিল, পাঁচ লাখ মানুষ যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মারা গিয়েছিলো"

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন,

"এই সব অতিরিক্ত প্রাণহানির দায় কার,

সবই ঈশ্বরের লীলা?

নাকি যারা এই যুদ্ধ এনেছিল তাদের?"

আসলে কেউ কি কখনো ভাবেন- ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পরের দিন হাসপাতালে যে মানুষটা মারা গেলো তাকে কোন তালিকায় ধরবেন? যে বীরাঙ্গনা মানুষের গঞ্জনা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন ১৬ ডিসেম্বরের পর তাদের কোন তালিকায় ধরবেন? যেসব বীরাঙ্গনা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলেন তাদের কই রাখবেন? শরণার্থী শিবিরে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে যে শিশুটি কলেরায় মারা গেলো তার খুলির হিসাব করবে কে? শরণার্থী থেকে ফিরে আসার পথে মারা গেল যে মানুষ তাদের হিসাব কোথায়? ১৯৭১ সালে চাষাবাদ না হওয়াতে যুদ্ধের সময় যারা না খেতে পেয়ে মারা গ্যালো তাদের মৃত্যুর দায় কার ঘাড়ে দেবেন?

সব প্রশ্নের উত্তর একটাই- পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।

যেই হারিয়ে যাওয়া ৬৫ লাখ মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি

আলোচনা শুরু করবো পরিসংখ্যানের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দিয়ে, এই পর্বে যেই শব্দটাকে ঘুরে আসতে দেখবেন বারবার। কাঠখোট্টার শব্দটা হচ্ছে Demography, যার অর্থ একটা জনগোষ্ঠীর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য জন্ম, মৃত্যু, রোগব্যাধি ইত্যাদির পরিসংখ্যান এবং এতদ বিষয়ক বিদ্যা; জনসংখ্যা তত্ত্ব।

ভাবছেন মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সাথে জনসংখ্যা তত্ত্বের সম্পর্ক কি।

আছে, সেটাই বলবো আজ। উইকিপিডিয়ার কয়েকটি চমৎকার কাজ হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সবকয়টা দেশের ডেমোগ্রাফি তৈরি করে রাখা, আর উইকিপিডিয়ার সব কয়টা ডেমোগ্রাফিতেই রয়েছে জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড পপুলেশান প্রসপেক্টাস' অনুসারে একটি ডাটা সীট যেখানে অত্যন্ত গোছানো আছে সব কয়টা দেশের ১৯৫০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছরের ব্যাবধানে কত শিশু জন্ম নিয়েছে, কতজন মানুষ মারা গিয়েছে, জন্ম-মৃত্যুর ফলে মোট কত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্ম হার, মৃত্যু হার এসব।

নিচে ভূটানের ডেমোগ্রাফি তুলে ধরা হলো :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR[1]	CDR[1]	NC[1]	TFR[1]	IMR[1]
1950-1955	9 000	5 000	4 000	47.9	27.1	20.8	6.67	184.8
1955-1960	10 000	6 000	5 000	49.0	26.8	22.3	6.67	181.4
1960-1965	12 000	6 000	6 000	48.5	25.7	22.8	6.67	174.1
1965-1970	13 000	7 000	7 000	47.8	24.1	23.8	6.67	163.1
1970-1975	16 000	7 000	8 000	47.0	22.0	25.1	6.67	149.3
1975-1980	18 000	8 000	10 000	45.8	19.6	26.2	6.67	133.2
1980-1985	20 000	8 000	12 000	42.7	17.1	25.6	6.39	117.1
1985-1990	21 000	8 000	13 000	40.4	15.0	25.3	6.11	104.0
1990-1995	19 000	7 000	12 000	35.2	12.5	22.7	5.27	87.5
1995-2000	16 000	5 000	11 000	29.2	9.9	19.3	4.13	69.7
2000-2005	15 000	5 000	11 000	25.2	7.9	17.2	3.30	52.8
2005-2010	15 000	5 000	10 000	21.5	7.2	14.4	2.61	44.4

[1] CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); TFR = total fertility rate (number of children per woman); IMR = infant mortality rate per 1000 births

যাই হোক এসব পরিসংখ্যানের কাঠখোট্টা ভাষা আমরা বুঝি না। আমাদের আসলে এখান থেকে বোঝার দরকার অল্প কিছু জিনিস, যেটা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে একটা পথ দেখাতে পারে। আমাদের এই সারণী থেকে দরকার কেবল সাল গুলো, এবং ঐ বছরগুলোতে মৃত মানুষের সংখ্যা। বোঝার সুবিধার জন্য আমি

সবগুলো সারণী থেকে সাল এবং ঐ সালে মৃত্যু এই কলাম দুটো আলাদা করে ত্রিমাত্রিক গ্রাফ আকারে প্রকাশ করছি যাতে সহজেই পয়েন্ট গুলো পাঠকদের বোধগম্য হয়।

পাঠকদের জন্য আমি বিগত পঞ্চাশ বছরে গণহত্যা হয়েছে এমন তিনটা দেশ এবং গণহত্যা হয়নি এমন তিনটা দেশের ডেমোগ্রাফি এবং থ্রিডি গ্রাফ প্রকাশ করছি।

আসুন দেখি ফুটবলের দেশ ব্রাজিলের ডেমোগ্রাফি :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR*	CDR*	NC*	TFR*	IMR*	Life expectancy total	Life expectancy males	Life expectancy females
1950-1955	2 572 000	900 000	1 672 000	44.1	15.5	28.6	6.15	135	50.9	49.2	52.6
1955-1960	2 918 000	947 000	1 971 000	43.2	14.0	29.1	6.15	122	53.3	51.5	55.2
1960-1965	3 303 000	986 000	2 317 000	42.2	12.6	29.6	6.15	109	55.7	53.8	57.6
1965-1970	3 330 000	998 000	2 332 000	37.0	11.1	25.9	5.38	100	57.6	55.7	59.6
1970-1975	3 441 000	1 014 000	2 427 000	33.7	9.9	23.8	4.72	91	59.5	57.3	61.8
1975-1980	3 741 000	1 043 000	2 698 000	32.5	9.0	23.5	4.31	79	61.5	59.2	63.9
1980-1985	3 974 000	1 064 000	2 910 000	30.8	8.2	22.6	3.80	63	63.4	60 4	66 8
1985-1990	3 757 000	1 055 000	2 702 000	26.3	7.4	18.9	3.10	52	65.3	61.9	69.1
1990-1995	3 519 000	1 058 000	2 461 000	22.6	6.8	15.8	2.60	43	67.3	63.6	71.2
1995-2000	3 624 000	1 086 000	2 538 000	21.5	6.5	15.1	2.45	34	69.3	65.5	73.3
2000-2005	3 572 000	1 147 000	2 425 000	19.8	6.4	13.4	2.25	27	70.9	67.2	74.8
2005-2010	3 129 000	1 214 000	1 915 000	16.4	6.4	9.9	1.90	24	72.2	68.7	75.9

* CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); IMR = infant mortality rate per 1000 births; TFR = total fertility rate (number of children per woman)

এবার দেখা যাক ত্রিমাত্রিক গ্রাফ :

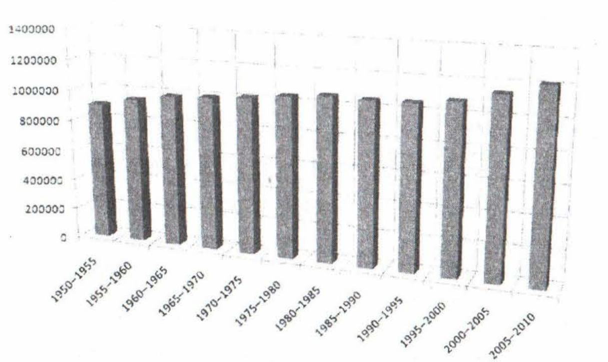

গ্রাফ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ব্রাজিলের মৃত্যু হার মোটামুটি স্বাভাবিক একটা নিরবিচ্ছিন্ন রেখা। আশি নব্বইয়ের দশকে মৃত্যু খানিকটা কমলেও দশে এসে এটা বাড়ছে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই।

আসুন এবার তাকানো যাক কম্বোডিয়ার দিকে :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR[1]	CDR[1]	NC[1]	TFR[1]	IMR[1]
1950-1955	208 000	109 000	99 000	45.4	23.8	21.6	6.29	165.1
1955-1960	232 000	113 000	119 000	45.2	22.1	23.1	6.29	152.0
1960-1965	260 000	118 000	142 000	44.9	20.4	24.5	6.29	139.5
1965-1970	287 000	127 000	160 000	43.9	19.4	24.5	6.22	130.0
1970-1975	280 000	158 000	122 000	39.9	22.5	17.4	5.54	180.9
1975-1980	227 000	272 000	- 45 000	33.4	40.0	-6.6	4.70	263.2
1980-1985	410 000	127 000	283 000	56.9	17.7	39.2	7.00	134.0
1985-1990	407 000	115 000	292 000	46.7	13.2	33.5	6.00	97.9
1990-1995	417 000	121 000	296 000	40.3	11.3	29.0	5.44	90.0
1995-2000	358 000	121 000	237 000	30.3	10.2	20.1	4.32	83.3
2000-2005	323 000	117 000	206 000	25.1	9.1	16.0	3.41	72.9
2005-2010	321 000	113 000	207 000	23.3	8.3	15.0	2.80	62.4

[1] CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); TFR = total fertility rate (number of children per woman); IMR = infant mortality rate per 1000 births

কম্বোডিয়ায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ চার বছরের গণহত্যা আর নির্যাতনে ২০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিলো খেমর-রুজ বাহিনী। বুর্জোয়া, সিআইএ'র এজেন্ট ইত্যাদি অভিযোগের ধুয়া তুলে খেমার-রুজ গেরিলা বাহিনী ধরে নিয়ে যেতো নমপেনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে। তারপর চলতো নারকীয় নির্যাতন, ধর্ষণ, অত্যাচার এবং হত্যা। আসুন দেখা যাক কম্বোডিয়ার ডেমোগ্রাফি।

এবারে মৃত্যুর সংখ্যা :

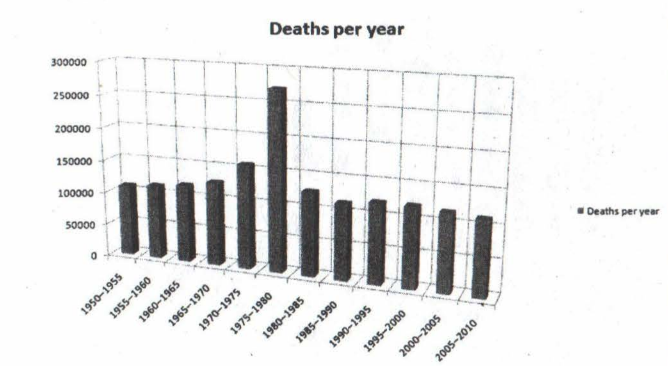

কি অবাক হচ্ছেন। অবাক তো হবারই কথা। ১৯৭৫-১৯৮০ সালের হত্যাকে নির্দেশ করা বার'টা কি একটু বেশী উঁচু দেখাচ্ছে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের ভেতর এখানে অস্বাভাবিক বেশী মানুষ মারা যায়, এবং আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত চলতে থাকা গণহত্যার কথা।

এবারে আসা যাক প্রতিবেশী ভূটানের দিকে :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR[1]	CDR[1]	NC[1]	TFR[1]	IMR[1]
1950-1955	9 000	5 000	4 000	47.9	27.1	20.8	6.67	184.8
1955-1960	10 000	6 000	5 000	49.0	26.8	22.3	6.67	181.4
1960-1965	12 000	6 000	6 000	48.5	25.7	22.8	6.67	174.1
1965-1970	13 000	7 000	7 000	47.8	24.1	23.8	6.67	163.1
1970-1975	16 000	7 000	8 000	47.0	22.0	25.1	6.67	149.3
1975-1980	18 000	8 000	10 000	45.8	19.6	26.2	6.67	133.2
1980-1985	20 000	8 000	12 000	42.7	17.1	25.6	6.39	117.1
1985-1990	21 000	8 000	13 000	40.4	15.0	25.3	6.11	104.0
1990-1995	19 000	7 000	12 000	35.2	12.5	22.7	5.27	87.5
1995-2000	16 000	5 000	11 000	29.2	9.9	19.3	4.13	69.7
2000-2005	15 000	5 000	11 000	25.2	7.9	17.2	3.30	52.8
2005-2010	15 000	5 000	10 000	21.5	7.2	14.4	2.61	44.4

[1] CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); TFR = total fertility rate (number of children per woman); IMR = infant mortality rate per 1000 births

ভুটানকে বলা হয় পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। মোটামুটি ভারতের অর্থনৈতিক সাহায্যে চলা এই দেশটির জনসংখ্যাও খুবই অল্প মাত্র ছয় লাখ নব্বই হাজার। প্রায় ৩৮ হাজার কিলোমিটার আয়তনের দেশটি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে পরিচিত।

আসুন দেখি ভূটানের ডেমোগ্রাফি এবারে গ্রাফ :

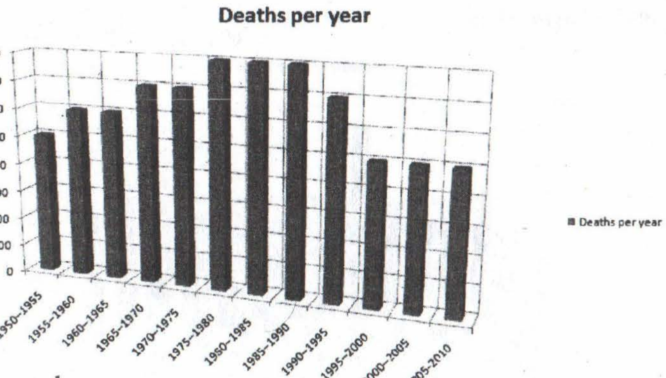

ইরাক :

এবারে আসুন কথা না বাড়িয়ে চোখ মেলে তাকাই ইরাকের দিকে। ইরাকে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই চলেছে। প্রথমের আসুক ইরাক-ইরান যুদ্ধের কথা। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সূচনা ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জাতিসংঘের মধ্যস্ততায় ১৯৮৮ সালের

আগস্টে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এর অবসান ঘটে। এরপর সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ২০০৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইরাকে চলছে গণহত্যা। আসুন দেখি আমাদের ডেমোগ্রাফি কি বলে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যুদ্ধবিগ্রহ ডেমোগ্রাফিতে একটা প্রভাব রাখে।

ইরাকের ডেমোগ্রাফি :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR[1]	CDR[1]	NC[1]	TFR[1]	IMR[1]
1950-1955	327 000	158 000	169 000	53.2	25.8	27.5	7.30	197.6
1955-1960	297 000	133 000	164 000	42.6	19.1	23.5	6.20	152.9
1960-1965	343 000	122 000	221 000	43.3	15.4	27.9	6.60	120.7
1965-1970	430 000	121 000	309 000	46.5	13.1	33.4	7.40	96.0
1970-1975	475 000	121 000	354 000	43.6	11.1	32.5	7.15	76.4
1975-1980	526 000	124 000	402 000	41.2	9.8	31.5	6.80	60.4
1980-1985	571 000	185 000	387 000	39.1	12.6	26.5	6.35	48.9
1985-1990	638 000	132 000	505 000	38.8	8.0	30.8	6.15	41.8
1990-1995	719 000	105 000	614 000	38.2	5.6	32.6	5.80	43.4
1995-2000	836 000	119 000	717 000	37.9	5.4	32.5	5.40	38.1
2000-2005	960 000	144 000	816 000	37.5	5.6	31.9	5.12	35.9
2005-2010	1 079 000	187 000	892 000	36.6	6.3	30.2	4.86	34.6

[1] CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); TFR = total fertility rate (number of children per woman); IMR = infant mortality rate per 1000 births

ডেমোগ্রাফির ব্যাসিসে করা গ্রাফ :

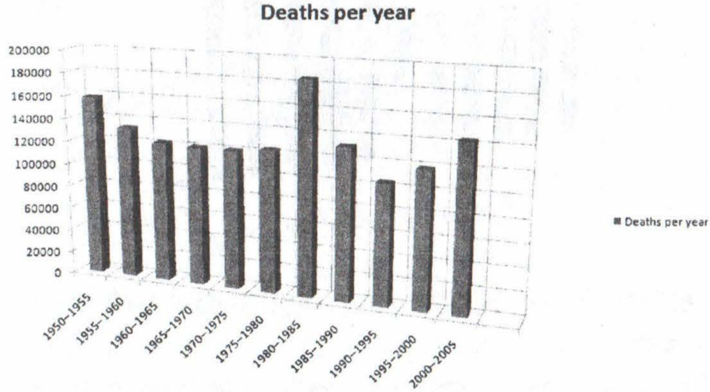

বিস্মিত হবার কিছু নেই। ইরাক-ইরানের যুদ্ধের সময়টা গণিতের ভাষায় লেখা আছে উপরের ছবিতে।

পাকিস্তান :

আসুন দেখি পাকিস্তানের ডেমোগ্রাফি। পাকিস্তান পৃথিবীর ব্যর্থতম রাষ্ট্র; অজ্ঞতা কুসংস্কার আর মৌলবাদীতে ঠাসা একটি রাষ্ট্র। যেই রাষ্ট্রে সবচেয়ে মূল্যহীন জিনিস হচ্ছে মানুষের জীবন, পাকিস্তানের ডেমোগ্রাফি ও একই কথা বলে। আর কিছুতে না পারলেও মৃত্যুহারে তারা যেন সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়।

পাকিস্তানের ডেমোগ্রাফি :

Year	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR[1]	CDR[1]	NC[1]	TFR[1]	IMR[1]
1950–1955	1 652 000	937 000	715 000	42 0	23.8	18.2	6.60	175.6
1955–1960	1 873 000	907 000	966 000	43 0	20.9	22.1	6.60	156.3
1960–1965	2 128 000	894 000	1 233 000	43.5	18.3	25.2	6.60	139.5
1965–1970	2 407 000	887 000	1 520 000	43 2	15 9	27 3	6.60	125 7
1970–1975	2 738 000	890 000	1 848 000	42 6	13.9	28.9	6.60	114.8
1975–1980	3 197 000	935 000	2 262 000	42 9	12 6	30 3	6.60	106 6
1980–1985	3 746 000	1 019 000	2 726 000	42 6	11.6	31.0	6.44	101 5
1985–1990	4 367 000	1 120 000	3 247 000	42 1	10.8	31.3	6.30	96.7
1990–1995	4 566 000	1 166 000	3 400 000	38 2	9.7	28.5	5.67	90.1
1995–2000	4 674 000	1 201 000	3 473 000	34 4	8.8	25.6	5.00	83 2
2000–2005	4 387 000	1 213 000	3 175 000	28 9	8.0	20.9	4.00	76.8
2005–2010	4 666 000	1 277 000	3 390 000	28 1	7 7	20 4	3.65	70.9

[1] CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); TFR = total fertility rate (number of children per woman); IMR = infant mortality rate per 1000 births

গ্রাফে :

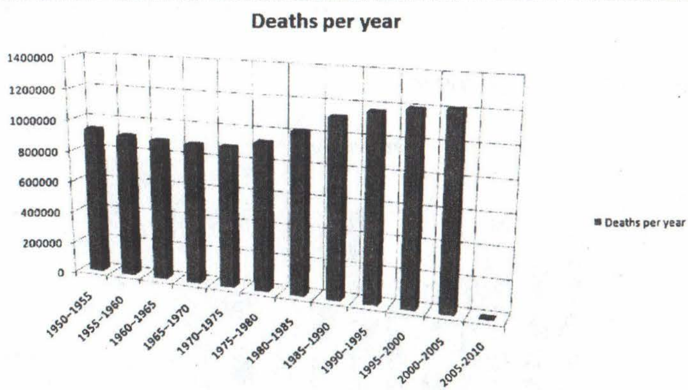

পাকিস্তান সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে দেশটাতে মৃত্যুর হার দিনদিন বাড়ছে।

রুয়ান্ডা :

রুয়ান্ডা পূর্ব-মধ্যাংশের একটি রাষ্ট্র। দেশটির সরকারী নাম রুয়ান্ডা প্রজাতন্ত্র। এর রাজধানীর নাম কিগালি। এদেশে প্রায় ৮০ লাখ লোকের বাস। আসুন একটু পরীক্ষা হয়ে যাক, রুয়ান্ডার ডেমোগ্রাফি আর মৃত্যু হারের গ্রাফ দেখে বলতে পারেন কি না সেই দেশে কোন গণহত্যা হয়েছে কি না।

রুয়ান্ডার ডেমোগ্রাফি :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR*	CDR*	NC*	TFR*	IMR*
1950-1955	118 000	55 000	63 000	52.9	24.7	28.1	8.00	160
1955-1960	137 000	60 000	77 000	53.3	23.4	29.9	8.15	152
1960-1965	155 000	65 000	90 000	51.9	21.9	30.0	8.15	143
1965-1970	178 000	72 000	106 000	51.0	20.7	30.3	8.10	137
1970-1975	211 000	82 000	128 000	51.8	20.3	31.5	8.20	134
1975-1980	250 000	92 000	158 000	52.3	19.3	33.0	8.25	132
1980-1985	294 000	92 000	202 000	52.2	16.3	35.9	8.25	124
1985-1990	326 000	123 000	203 000	49.4	18.7	30.7	7.80	120
1990-1995	258 000	263 000	- 5 000	40.7	41.5	-0.8	6.30	128
1995-2000	278 000	136 000	142 000	40.7	19.9	20.8	6.00	118
2000-2005	344 000	125 000	219 000	39.8	14.4	25.4	5.60	108
2005-2010	404 000	122 000	281 000	40.7	12.3	28.4	5.43	100

* CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); IMR = infant mortality rate per 1000 births; TFR = total fertility rate (number of children per woman)

এবং গ্রাফ :

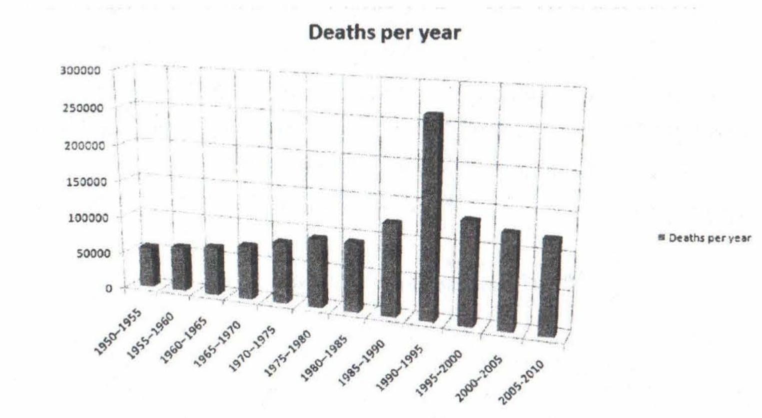

জী, আপনি ঠিকই ধরেছেন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের ভেতরে এই দেশে নিশ্চিত কিছু একটা হয়েছে। বাড়াবাড়ি রকমের গণহত্যা হয়েছে। এটাই সায়েন্স, কেউ যদি আজকে প্রথম রুয়ান্ডার নাম শুনে থাকেন এবং কষ্ট করে এই লেখাটা পড়ে থাকেন তাহলে তার নিশ্চিত ভাবে মেনে নিতে কোন আপত্তি থাকবে না যে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই দেশে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে।

আসুন জেনে নেয়া যাক কি ঘটেছিলো অভাগা এই মানুষদের ভাগ্যে।

আমরা জানি, ১৯৯৪ সালে সেদেশের সংখ্যালঘু তুতসি গোষ্ঠীর মানুষ এবং সংখ্যাগুরু হুতু গোষ্ঠীর মধ্যে উদার ও মধ্যপন্থীদের নির্বিচারে হত্যার ঘটনাকে রুয়াভার গণহত্যা বলা হয়ে থাকে। ৬ই এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই গণহত্যা সংঘটিত হয়। অন্তত ৫,০০,০০০ টাট্সি এবং এক হাজারেরও বেশি হুটু নিহত হয়। অধিকাংশ সূত্রমতে মোট নিহতের সংখ্যা ৮,০০,০০০ এর কাছাকাছি বা ১০,০০,০০০ এর কাছাকাছি। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নানান খবরের ভিড়ে এই গণহত্যার সংবাদ আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে খুব কমই স্থান পেয়েছিলো। এই সুযোগেই গণহত্যা বিভৎস রূপ ধারণ করেছিলো।

জাতিসংঘ এই হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিল। মিডিয়ায় সচিত্র সংবাদ পরিবেশন সত্ত্বেও জাতিসংঘের এমন ব্যবহারে সবাই মর্মাহত হয়েছিলেন এবং জাতিসংঘকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই অনীহার কারণেই রুয়াভায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে গণহত্যা মোকাবেলার মত যথেষ্ট সৈন্য ও কর্মকর্তা ছিল না। Roméo Dallaire-এর নেতৃত্বে এই শান্তিরক্ষী দলটি তাই কার্যকরী কিছু করতে পারেনি। একসময় রুয়ান্ডা থেকে সব বিদেশী লোকদেরকে সরিয়ে আনা হয়। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের রক্ষার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স সরকারকে এ কারণে এখনও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। রুয়াভায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছিল United Nations Assistance Mission for Rwanda। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত না হওয়ায় তারা কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। এক সময় সমগ্র রুয়ান্ডার জন্য মাত্র ৩০০ শান্তিরক্ষী মোতায়েন ছিলো।

বাংলাদেশ :

Period	Live births per year	Deaths per year	Natural change per year	CBR[1]	CDR[1]	NC[1]	TFR[1]	IMR[1]
1950-1955	1 963 000	852 000	1 111 000	48.3	20.9	27.4	6.36	165.0
1955-1960	2 252 000	921 000	1 332 000	48.2	19.7	28.5	6.62	156.5
1960-1965	2 560 000	994 000	1 566 000	47.5	18.4	29.1	6.80	151.2
1965-1970	2 950 000	1 090 000	1 860 000	47.3	17.5	29.8	6.91	144.4
1970-1975	3 193 000	1 847 000	1 346 000	46.5	26.9	19.6	6.91	175.6
1975-1980	3 381 000	1 153 000	2 229 000	44.7	15.2	29.5	6.65	138.3
1980-1985	3 670 000	1 151 000	2 519 000	42.4	13.3	29.1	5.99	122.5
1985-1990	3 767 000	1 115 000	2 652 000	38.1	11.3	26.8	5.02	104.4
1990-1995	3 709 000	1 057 000	2 653 000	33.3	9.5	23.8	4.10	90.6
1995-2000	3 598 000	986 000	2 612 000	29.1	8.0		3.41	73.8
2000-2005	3 432 000	934 000	2 498 000	25.4	6.9		2.87	59.3
2005-2010	3 107 000	905 000	2 202 000	21.5	6.3		2.38	49.0

[1] CBR = crude birth rate (per 1000); CDR = crude death rate (per 1000); NC = natural change (per 1000); TFR = total fertility rate (number of children per women), IMR = infant mortality rate per 1000 births

চোখ বন্ধ করে চলুন চলে যাই আমার প্রাণের দেশটার ডেমোগ্রাফিতে :

UN estimates[5] [edit]

	Total population	Population aged 0–14 (%)	Population aged 15–64 (%)	Population aged 65+ (%)
1950	37 895	41.2	54.8	3.9
1955	43 444	42.4	54 1	3.5
1960	50 102	43.6	53.1	3.3
1965	57 792	44.7	52.0	3 3
1970	66 881	44 7	51 8	3 4
1975	70 582	45.8	50 7	3 5
1980	80 624	45.0	51 4	3.6
1985	92 284	43.9	52.5	3 6
1990	105 256	42.5	53 8	3.7
1995	117 487	40 3	55.9	3.8
2000	129 592	37.3	58.7	4.0
2005	140 588	34.3	61 4	4 3
2010	148 692	31.3	64.1	4.6

এবারে আসুন আরেকটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখি :

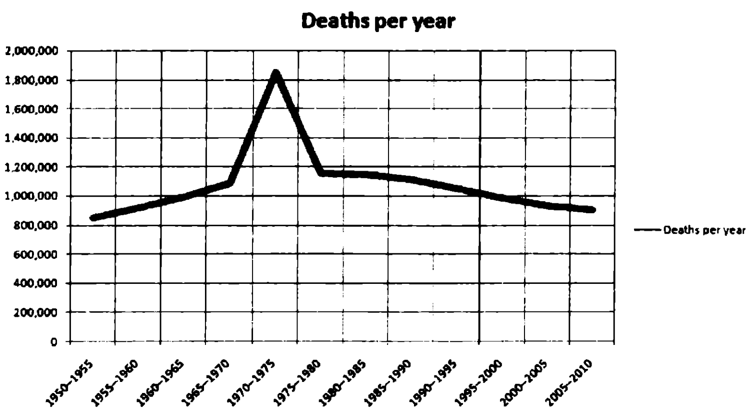

আরেকটু ভালো করে :

প্রিয় পাঠক খুব কি কষ্ট হচ্ছে দেখতে যে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। গল্পটা এখানেই শেষ হয় না, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ওপর জাতিসংঘের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ৫০-৫৫ সালে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৬, ৫৫-৬০ সালে ১৫.৩, ৬০-৬৫ সালে ১৫.৩, ৭০-৭৫ সালে হঠাৎ এটা হয়ে যায় ৫.৫, আবার ৭৫-৮০ সালে ১৪.২, ৮০-৮৫ সালে ১৪.৫ এভাবে চলছে।

জাতিসংঘের হিসাব মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা-

সাল	১৯৫০	১৯৫৫	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০
জনসংখ্যা (লক্ষ)	৩৭৯	৪৩৪	৫০১	৫৭৮	৬৬৯	৭০৬	৮০৬	৯২৩	১০৫৩
বৃদ্ধির হার (%/৫ বছরে)	১৪.৬	১৫.৩	১৫.৩	১৫.৭	৫.৫	১৪.২	১৪.৫	১৪.১	

১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতি ৫ বছরে জনসংখ্যা গড়ে ১৫.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদি ১৯৭০-১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা এই হারে (~১৫.৩%/৫ বছর) বৃদ্ধি পেত তাহলে ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াত ৭৭১ লক্ষ।

অর্থাৎ ১৯৭০-১৯৭৫ সালে আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা

৭৭১-৭০৬ = ৬৫ লক্ষ

সত্তর থেকে পচাত্তরের ভেতর স্বাভাবিক জন্মহার বিবেচনায় তাহলে হারিয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫ লক্ষ!

আসুন আরেকটা গ্রাফে দেখি হারিয়ে যাওয়া মানুষদের :

আচ্ছা এই মানুষগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। আসুন দেখি উল্লেখযোগ্য কি কি ঘটনা ঘটেছিলো এই পাঁচ বছরে, যেটা এত মৃত্যু কিংবা হারিয়ে যাবার কারণ হতে পারে;

১) সত্তরের ঘূর্ণিঝড়

২) চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ

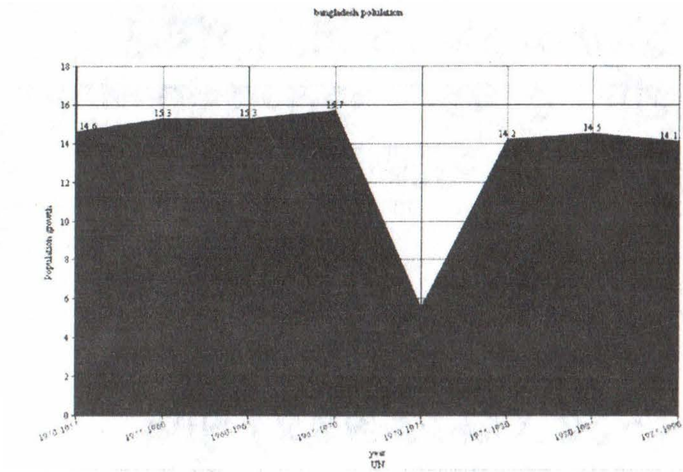

৩) যুদ্ধের পর ভারত থেকে ফিরে না আসা শরণার্থী

৪) একাত্তরের যুদ্ধ+অন্যান্য আনুসাঙ্গিক

১) সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ে বলা হয়ে থাকে নিহতের সংখ্যা তিন লাখ, যদিও উইকিপিডিয়া অনুসারে সর্বোচ্চ ফিগার ধরা হয় ৫ লাখ। এর বেশী কাউকে আমি দাবী করতে শুনিনি।

২) ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটা সামান্য গরমিলের ব্যাপার আছে। ঘটনা হচ্ছে তৎকালীন সরকারের মতে সেই দুর্ভিক্ষে ২৭ হাজার মানুষ মারা যায়, যদিও বিভিন্ন সূত্র অনুসারে সংখ্যাটা মোটমাট ১০ থেকে ১৫ লক্ষ। আমরা যদি এর মাঝামাঝি একটা সংখ্যা ধরি তাহলে সাড়ে বারো লক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে আসলে মানুষ মারা গিয়েছে অনেক পরে, যেটাকে বলে পোস্ট ফেমিন। মোট মৃত মানুষের ৫ লক্ষই এই post-famine-এ মারা যায়। বলা বাহুল্য এই দুর্ভিক্ষ ৭৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে সুতরাং post-famine-এ মৃত মানুষেরা আমাদের টাইম লাইনে পড়বে না। অর্থাৎ আমাদের টাইম লাইনে ৭৪ দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত মানুষের সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে সাড়ে সাত লক্ষ।

৩) শরণার্থী শিবিরে সত্যিকার অর্থে থেকে যাওয়া মানুষের সংখ্যাটা বের করা আসলে সম্ভব না, যদিও দ্যা হিন্দু পত্রিকায় রিপোর্ট থেকে আমরা জানি ৯২ লক্ষ শরণার্থী দেশে ফিরেছে ৭২ সালের মার্চের ভেতরেই। এদিকে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট আমাদের বলছে

"পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি

শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯,৮৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গে ৭,৪৯৩,৪৭৪, ত্রিপুরাতে ১,৪১৬,৪৯১, মেঘালয়ে ৬৬৭,৯৮৬, আসামে ৩১২,৭১৩ ও বিহারে ৮৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।" অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ শরণার্থী ফিরে আসেননি।

৪) এই তিন উৎস থেকে আমরা দেখি মোট হারিয়ে যাওয়া/ মৃত মানুষের সংখ্যা (৭+৭.৫+৫) অর্থাৎ ১৯.৫ লক্ষ। এবারে আমাদের হাতে থাকা ৬৫ লক্ষ থেকে বাদ পাচ্ছি ৪৫.৫ লক্ষ মানুষ নিখোঁজ/ নিহত।

এর বেশী ক্যালকুলেশান আমি করবো না। বিহারী হত্যাকাণ্ড আর তৎকালীন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সর্বোচ্চ লিমিট ধরে হিসাব করে দেখুন সবকিছুর বিবেচনায় শহিদের সংখ্যা কত হয়?

না, আপনারা ভাববেন না আমি ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে বলে সবগুলো ডাটা যোগ-বিয়োগ করে আমার তিরিশ লাখ তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। তবএ এটুকু শুধু বলবো আপনি মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া বাদাবকি প্যারামিটারে সর্বোচ্চ মান গুলো গ্রহণ করুণ যে কোন সোর্স থেকে। এরপর দেখুন মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা কত আসে, আপনার হিসেবের সংখ্যাটা আমি বলে দিতে পারবো না ঠিকই তবে এটুকু নিশ্চিত বলে দিতে পারি সংখ্যাটা তিরিশ লাখের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হবে। এই পর্বে ব্যাবহার করা সকল সারণীর মূল তথ্য "Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision" থেকে সংগৃহীত।

এই লেখাকে আর দীর্ঘ করবো না, শুধু একটা কথাই বলতে চাই কাঠখোট্টা পরিসংখ্যানের সারণীতে যখন মৃত্যু আর রক্তের জোয়ারকে অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে চলতে দেখি, তখন আর এতটুকু সন্দেহ থাকে না শহিদের রক্তের ব্যাপারে।

পৃথিবীময় গণহত্যার সাথে আমাদের তুলনা

এ পর্বে আমরা আলোচনা করবো কিছু গাণিতিক হিসেব নিয়ে। আমরা দেখবো পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে মাত্র নয় মাসে তিরিশ লাখ বাঙালীকে মেরে ফেলা আদৌ সম্ভব কি না। কারণ এধরনের কথা আমরা হর-হামেশাই শুনে এসেছি যে এত কম সময়ে এত বেশী মানুষকে হত্যা করা নাকি অসম্ভব। আমরা এজন্য তুলনা করবো একাত্তর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া কয়েকটি যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা, হতাহতের সাথে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত সেনাবাহিনীর অনুপাত, মোট জনগোষ্ঠী হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির শতকরা হার ইত্যাদি।

একটা কথা মাথায় রাখবেন ১৯৭১ পৃথিবীতে কিন্তু একবারই এসেছিলো, অর্থাৎ আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবীতে ১৯৭১ সালের আগে বা পরে এমন কোন যুদ্ধ আশা করতে পারেন না যে যুদ্ধ ঠিক নয় মাসই টিকেছিলো এবং যে যুদ্ধে ঠিক তিন মিলিয়ন মানুষই মারা গিয়েছিলো বিরানব্বই হাজার এক্টিভ সৈন্য এবং লাখ খানেক প্যারামিলিটারি আলবদর রাজাকারদের হাতে। আমরা হয়ত এরকম যুদ্ধ পাবো যেখানে যুদ্ধটা আরও কম অথবা বেশী আরও সময় টিকেছে, কিন্তু প্রতিমাসে বাংলাদেশের চেয়ে বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। আবার হয়ত এমন যুদ্ধ পাবো যেখানে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা হিসেবে আমাদের চেয়ে বেশী মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিদিনের হত্যাকাণ্ডের হার হয়ত আমাদের চেয়ে কম। আবার এমন যুদ্ধ পাওয়া যাবে যেখানে কম সৈনিকের হাতে বেশী গড়ে আমাদের চেয়ে বেশী মানুষের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এভাবে যুদ্ধগুলো তুলনা করলেই বোঝা যাবে আমাদের দেশে মৃতের সংখ্যায় কি অতিরঞ্জন করা হয়েছে নাকি এটা একটা স্বাভাবিক ধারণা।

প্রথমেই আমাদের জানা দরকার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈনিকের সংখ্যা কত। অনেকের কাছেই তিরানব্বই হাজার একটিভ সেনাবাহিনীর ব্যাপারটা তো মীমাংসিত। আসলে ব্যাপারটা নিয়েও আজকাল বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে একটি চক্র।

ভারতীয় লেখিকা শর্মিলা বোস, পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজিসহ অনেকেই ৯৩,০০০ সৈন্যের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর ডেড রেকনিং বইতে লিখেছেন

"১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে সৈনিক সংখ্যা ছিলো ১২,০০০। সংকট মোকাবেলায় আরও সৈন্য আনা হয়েছিলো ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে. জে. এ এ কে নিয়াজি এ ব্যাপারে লিখেছেন :

'আমার হাতে মোট সৈনিক বা যোদ্ধা ছিল ৪৫,০০০ এর মাঝে ৩৪,০০০ ছিল সেনাবাহিনী থেকে ও এগারো হাজার সিএএফ (সিভিল আর্মড ফোর্সেস এবং প্যারা মিলিটারী) ও পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক পুলিশ ও অস্ত্রধারী নন-কমব্যাট্যান্টস। ৩৪,০০০ নিয়মিত সেনার মধ্যে ২৩,০০০ ছিল পদাতিক বাহিনীর সৈন্য, বাকিরা ছিল সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যালস ও অন্যান্য সহায়ক বাহিনী।"

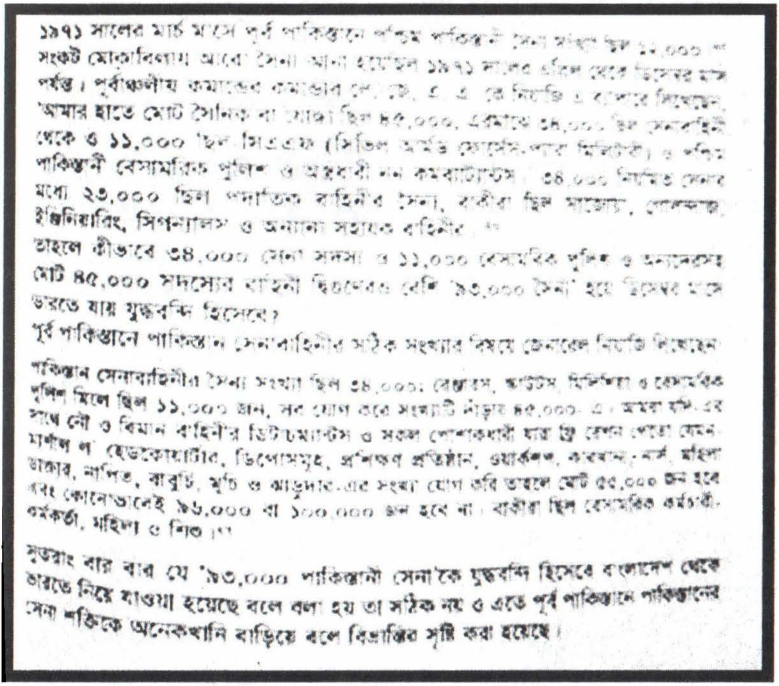

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা সংখ্যা ছিল ১২,০০০ [illegible] সংকট মোকাবিলায় আরো সেনা আনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে নিয়াজি এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'আমার হাতে মোট সৈনিক বা যোদ্ধা ছিল ৪৫,০০০, এরমাঝে ৩৪,০০০ ছিল সেনাবাহিনী থেকে ও ১১,০০০ ছিল সিএএফ (সিভিল আর্মড ফোর্সেস-প্যারা মিলিটারী) ও পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক পুলিশ ও অস্ত্রধারী নন কমব্যাট্যান্টস। ৩৪,০০০ নিয়মিত সেনার মধ্যে ২৩,০০০ ছিল পদাতিক বাহিনীর সেনা, বাকীরা ছিল সাঁজোয়া, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যালস ও অন্যান্য সহায়ক বাহিনী।' [illegible]

তাহলে কীভাবে ৩৪,০০০ সেনা সদস্য ও ১১,০০০ বেসামরিক পুলিশ ও অন্যান্যসহ মোট ৪৫,০০০ সদস্যের বাহিনী দ্বিগুণেরও বেশি '৯৩,০০০ সৈন্য' হয়ে ডিসেম্বর মাসে ভারতে যায় যুদ্ধবন্দি হিসেবে?

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঠিক সংখ্যার বিষয়ে জেনারেল নিয়াজি লিখেছেন

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেনা সংখ্যা ছিল ৩৪,০০০। রেঞ্জার্স, স্কাউটস, মিলিশিয়া ও বেসামরিক পুলিশ মিলে ছিল ১১,০০০ জন, সব যোগ করে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৪৫,০০০-এ। আমরা যদি এর সাথে নৌ ও বিমান বাহিনীর ডিটাচমেন্টস ও সকল পোশাকধারী [illegible] মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টার, ডিপোসমূহ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, কারখানা, নার্স, মহিলা ডাক্তার, নাপিত, বাবুর্চি, মুচি ও ঝাড়ুদার-এর সংখ্যা যোগ করি তাহলে মোট ৫৫,০০০ জন হবে এবং কোনোভাবেই ৯৬,০০০ বা ১০০,০০০ জন হবে না। বাকীরা ছিল বেসামরিক কর্মচারী-কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু।' [illegible]

সুতরাং বার বার যে '৯৩,০০০ পাকিস্তানী সেনা'কে যুদ্ধবন্দি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে বলা হয় তা সঠিক নয় ও এতে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সেনা শক্তিকে অনেকখানি বাড়িয়ে বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে।

শর্মিলা এরপর পাঠকের কাছে প্রশ্ন রাখেন :

"তাহলে কিভাবে ৩৪,০০০ সেনা সদস্য ও ১১,০০০ বেসামরিক পুলিশ ও অন্যদের সহ মোট ৪৫,০০০ সদস্যের বাহিনীর দ্বিগুণেরও বেশী ৯৩,০০০ সৈন্য হয়ে ডিসেম্বর মাসে ভারতে যায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে?"

তার মতে বারবার যে ৯৩,০০০ পাকিস্তানী সৈন্যের কথা বলা হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, তা সঠিক নয়। এবং এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সেনা শক্তিকে অনেকখানি বাড়িয়ে বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু ১৯৭১ সালের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো কিন্তু সে কথা বলে না। ৭১ জুড়ে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলোতে বারবারই উঠে এসেছে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা। কিছু প্রতিবেদনের বিবরণ একটু দেখে আসা যাক :

১) টাইমস ১৫ মার্চ ১৯৭১ বলছে বর্তমান সৈন্য সংখ্যা ৬০,০০০

২) লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইকনোমিস্ট পত্রিকা ৩ এপ্রিল ১৯৭১ তাদের প্রতিবেদনে তাদের সৈন্য সংখ্যা উল্লেখ করেছে ৭০ হাজার

৩) টাইমস পত্রিকা ৫ এপ্রিল ১৯৭১ লিখেছে বর্তমান সৈন্য সংখ্যা ৮০ হাজার

৪) সিঙ্গাপুরের দ্যা নিউ নেশন পত্রিকা ৬ এপ্রিল সৈন্যের সংখ্যা উল্লেখ করেছে ৭০ হাজার।

৫) ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ ২৫ আগস্ট ১৯৭১ লিখছে সৈন্য সংখ্যা এখন ১ লাখ।

সবার শেষে বলি, বাংলাদেশ ও ভারতের সরকারী নথিপত্রে তো আছেই খোদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উইকিপিডিয়ার পেইজে তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দীর কথা পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে।

> The original plan envisioned taking control of the major cities on 26 March 1971, and then eliminating all opposition, political or military,[15] within one month. The prolonged Bengali resistance was not anticipated by Pakistani planners.[16] The main phase of Operation Searchlight ended with the fall of the last major town in Bengali hands in the end of May.
>
> Soon heavy fighting broke out between the Pakistan Army and the Indian-backed Bengali rebels. In this period the Pakistan Army killed an estimated 3 million people. In December 1971, Pakistan attacked India's western air bases, in an attempt to thwart Indian support for the rebels. This officially led to start of the Pakistan India War of 1971 (also called the Bangladesh Liberation War). In the eastern theatre, the Pakistan Army was decimated by the Indian Army and rebels, while in the western front the Pakistan Army was defeated in the battles of Basantar and Longewalla.
>
> On 16 December 1971, Lt. Gen A. A. K. Niazi, CO of Pakistan Army forces located in East Pakistan signed the Instrument of Surrender. Over 93,000 Pakistani personnel surrendered to the Indian and Bengali forces making it the largest surrender since World War II.
>
> In 1997 R. J. Rummel published a book (available on the web) called "Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900". In Chapter 8 called "Statistics Of Pakistan's Democide Estimates, Calculations, And Sources" he looks at the 1971 Bangladesh Liberation War. Rummel wrote:
>
> > In East Pakistan (now Bangladesh) [the President of Pakistan, General Agha Mohammed Yahya Khan, and his top generals] also planned to murder its Bengali intellectual, cultural, and political elite. They also planned to indiscriminately murder hundreds of thousands of its Hindus and drive the rest into India. And they planned to destroy its economic base to insure that it would be subordinate to West Pakistan for at least a generation to come. This plan may be perceived as genocide -

প্রশ্নটা হচ্ছে কেন; কেন বারবার একটি মহল থেকে এই নিস্পত্তি হওয়া পাকিস্তানী ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা কমিয়ে ২০-২৫ হাজারে নিয়ে আসার একটা তীব্র প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করছি? কি তাদের স্বার্থ?

এক কথায় উত্তর খুবই সহজ, সৈনিক সংখ্যা কম দেখানো সম্ভব হলে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি, হতাহত, ধর্ষণের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো যাবে। সৈন্য সংখ্যা কম হলে জনপ্রতি খুন/ধর্ষণের হার বেড়ে যায়। আর তখন সেটাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়া যায়। এবং ভারতীয় লেখিকা শর্মিলা বোস তাঁর বিভিন্ন বইয়ে এই কাজটা অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই করেছেন। Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War শীর্ষক এক বিতর্কিত নিবন্ধে (এই নিবন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে) তিনি লিখেছেন; "For an army of 34,000 to rape on this scale in eight or nine months (while fighting insurgency, guerrilla war and an invasion by India), each would-be perpetrator would have had to commit rape at an incredible rate." (Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War প্রকাশিত হয় Economic and Political Weekly September 22, 2007 পৃষ্ঠাঃ 3865)

শর্মিলা বলতে চাইছেন মাত্র ৩৪,০০০ সৈন্যের এত ধর্ষণ করতে হলে প্রত্যেক সৈন্যকে অবিশ্বাস্য সংখ্যক ধর্ষণ করতে হবে।

আসুন একটু খাতা কলম নিয়ে কেবল বাংলাদেশে সংগঠিত ধর্ষণের জন্য হিসেব করে দেখি সংখ্যাটা। সরকারী হিসেবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে দুই লক্ষ ধর্ষণ হয়েছে, যদিও পরবর্তীতে দেশী-বিদেশী গবেষণায় সংখ্যাটা ৪ থেকে ৭ লাখ ধারণা করা হয়। এই সম্পর্কে এই গ্রন্থের পরবর্তী কিছু অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদি আমরা তর্কের খাতিরে সংখ্যাটা কমিয়ে দুই লাখও চিন্তা করি তাহলে বিরানব্বই হাজার সৈন্যের হাতে গড়ে প্রায় দুটো করে ধর্ষণ হতে হয়। সৈন্য সংখ্যা ৩৪,০০০ হলে সৈনিক প্রতি গড়ে ধর্ষণ সংখ্যা হয় ৬ থেকে ৭টি। এদিকে বিবেচনার বাইরে রয়ে যাচ্ছে মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত পাকিস্তানী সৈন্যরা রামেলের মতে সংখ্যাটা প্রায় ১১ হাজার। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরাও খুন ধর্ষণের সাথে জড়িত ছিল। আর স্থানীয় রাজকার, আল-বদর, আল-শামসদের কথা না বললেই নয়। এদেরকে লোকাল কিংবা সাধারন বলে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই কারণ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রাজাকারদের বিচারে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেক রাজাকারের বিরুদ্ধেই একাধিক ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জামায়াতে ইসলামের নায়েবে আমির দেলোয়ার হোসেন সাইদীর বিরুদ্ধে হোগলাবুনিয়ার মধুসূধন ঘরামীর স্ত্রী শেফালী ঘরামীর ধর্ষণের ঘটনা সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে শাস্তি দিয়েছে। এবং আরেক যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামের সাবেক সেক্রেটারি কাদের মোল্লা ওরফে কসাই কাদেরের বিরুদ্ধে বীরাঙ্গনা মোমেনা খাতুনের ধর্ষণ এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদ্যদের হত্যার ঘটনা আদালতে প্রমাণিত। বীরাঙ্গনা মোমেনা খাতুন স্বয়ং কাদের মোল্লাকে শনাক্ত করেন। সেই মামলায় গত ২০১৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সুতরাং একটা কথা আদালতের মাধ্যমে সন্দেহাতীত ভাবে পরিষ্কার পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী জামায়াত ইসলামীর সদস্যরা সক্রিয় ভাবে খুন ও ধর্ষণের সাথে জড়িত ছিল। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির হিসাব অনুসারে এই রাজাকার আলবদরদের সংখ্যা দুই লক্ষাধিক। সমস্ত রাজাকার, আলবদর এবং ৯৩,০০০ পাকিস্তানী খুনী, ধর্ষকদের বিবেচনায় আনলে এই পরিমাণ ধর্ষণকে অবাস্তব অলিক সংখ্যা বলে মনে হয় না। সুতরাং হত্যাকারী ও ধর্ষকদের নামের তালিকায় তাদের নামটিও যুক্ত করে হিসাব করতে হবে, এর সাথে আছে অবাঙালী বিহারীরা। এসব কিছু বিবেচনায় আনলে এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় পাকিস্তানী সেনা বাহিনী ও তাদের এদেশি দোসরদের হাতে ঘটে যাওয়া ধর্ষণগুলো কোন অলিক রূপকথা নয়, বাস্তবসম্মত প্রমাণযোগ্য ঘটনা।

বধ্যভূমি :

আমরা জানি আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে ৩৫টি স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে সরকারী ভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মোট কতগুলি বধ্যভূমি আছে সেটা এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। তবে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি (WCFC) এদেশে প্রায় ৯৪২টি বধ্যভূমি চিহ্নিত করে শনাক্ত করেছে। এবং তারা জানিয়েছে এই সংখ্যাটা এখানেই শেষ হয়নি। এরমধ্যে কেবল চট্টগ্রামেই আছে ১১৬টি। এছাড়াও দেশের আনাচে কানাচে সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে আরও অগণিত বধ্যভূমি। এর মধ্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বধ্যভূমি স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন জানান, স্বাধীনতার পর এ বধ্যভূমির শুধু একটি গর্ত থেকেই প্রায় ১ হাজার ১০০ মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়। সংগৃহীত কঙ্কাল এখনও সংরক্ষিত রয়েছে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের স্মৃতি অম্লান জাদুঘরে। একাত্তরের এপ্রিল থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে ২০ হাজারের মতো বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকায় হত্যা করে রায়েরবাজারে এনে ফেলে রাখা হতো। আর চট্টগ্রামে লোকজনদের ধরে এনে হত্যার কাজটি চলত পাহাড়তলীতে। যেখানে বধ করা হয় সেটাই বধ্যভূমি। সে হিসেবে পাহাড়তলী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। ড. সুকুমার বিশ্বাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের অন্যতম গবেষক। বাংলা একাডেমীতে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি সারা দেশে ঘুরেছেন এবং একাত্তরের বধ্যভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার অনেক লেখায় তিনি বলেছেন রাজশাহীর একটি বধ্যভূমিতে একশটি গণকবর থেকে দশ হাজার মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গলামারী বধ্যভূমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে পাশেই অবস্থিত। একাত্তরে খুলনা শহর মুক্ত হবার পর গলামারী খাল ও এর আশেপাশের স্থান থেকে প্রায় পাঁচ ট্রাক ভর্তি মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় ঐ স্থানে আনুমানিক ১৫,০০০ মানুষ হত্যা করা হয়। বরিশাল সদরের পানি উন্নয়ন বোর্ড সংলগ্ন কীর্তনখোলা তীরে সরকারিভাবে স্তম্ভ নির্মিত বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয় এক থেকে দেড় হাজার লোক। এরকম অনেক অনেক আছে, অথচ রায়েরবাজার এবং জল্লাদখানার মত বিখ্যাত বধ্যভূমির মোট লাশের সংখ্যা কখনই নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। তারপরেও আমরা যদি না পাওয়া বধ্যভূমির কথা হিসেব করে সর্বসাকুল্যে মোট ১০০০ বধ্যভূমির সংখ্যা ধরে নেই এবং প্রতি বধ্যভূমিতে ১০০০ করে লাশ থাকলে তাহলেই বধ্যভূমিতে মোট প্রাণ হারানো বাঙালীর সংখ্যা হয় ১০ লক্ষ। এছাড়া নদীমাতৃক দেশে হাজার হাজার মানুষকে নদীর পাড়ে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়েছে এরকম চাক্ষুস তথ্য আমাদের দিয়েছেন সাব সেক্টর কমান্ডার রুহেল আহমেদ চৌধুরী। তার ব্যক্তিগত মতে;

'তিরিশ লক্ষ শহিদ একটা মুখের কথা, বিলিভ মি সংখ্যাটা চল্লিশ লাখ ছাড়িয়ে গেলেও আমি অবাক হব না। আই ওয়াস দেয়ার এন্ড আই প্রক্লেইম দ্যাট'

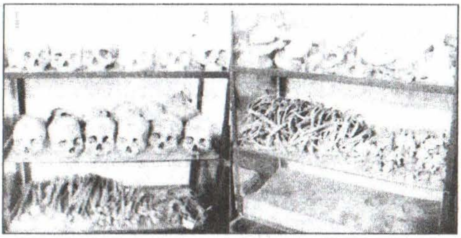

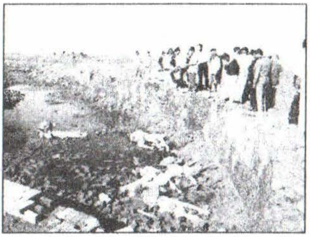

এ পর্যায়ে এসে আমাদের সবার জানা কিছু ডাটার বিষয়ে সত্যতা নিশ্চিত করি।

আমরা জানি, একাত্তরে বাংলার জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। পাক বাহিনী মোট আত্মসমর্পণকৃত সদস্য সংখ্যা ৯২ থেকে ৯৩ হাজার এবং মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে মোট ২৬৬ দিন।

এবার একটু ক্যালকুলেটর নিয়ে বসি। যদি, আমরা ধরি শহিদের সংখ্যা ৩ লক্ষ, তাহলে পাক বাহিনীর প্রতি সদস্যকে। প্রতিদিন হত্যা করতে হয়; ৩ লক্ষ/ ৯২ হাজার/ ২৬৬ দিন = ০.০১২২৫৮৯০৮১৩জন কে। অর্থাৎ প্রতিদিন শহিদ হয়; ৩০০,০০০/২৬৬=১,১২৮ জন। আর যদি, শহিদের সংখ্যা ধরি ৩০ লক্ষ, তাহলে পাক বাহিনীর প্রতি সদস্যকে প্রতিদিন হত্যা করতে হয়; ৩ লক্ষ/ ৯২ হাজার/ ২৬৬ দিন = ০.১২২৫৮৯০৮১৩ জন কে। অর্থাৎ প্রতিদিন শহিদ হয়; ৩০০০,০০০/২৬৬=১১,২৮০ জন।

একটু লক্ষ্য করুন আগেই বলেছি, জাতিসংঘের দেয়া তথ্য অনুসারে ১৯৬৫ সাল থেক ১৯৭০ সালে প্রতি বছর আমাদের দেশে গড়ে ১১ লক্ষ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করে। সে হিসেবে গড়ে প্রতিদিন ৩০১৩ জন মানুষ মারা যেত স্বাভাবিক অবস্থায়ই, একটা বিরাট যুদ্ধের মধ্যে আমরা যদি দাবী করি প্রতিদিন ১,১২৮ জন মারা যাচ্ছে তাহলে সেটা হাস্যকরই মনে হয়। মৃত্যুহারের বিবেচনায় ১১,২৮০ অর্থাৎ ৩০ লক্ষই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আজকের দিনে প্রতি দুই থেকে তিন বছরে আমাদের দেশে তিরিশ লক্ষাধিক মানুষ মারা যাচ্ছে দেশের প্রতিটা পরিবারের একাধিক সদস্যের মৃত্যু ছাড়াই। এছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৮১ সালে UN Universal Human Rights Declaration ৩৩তম বছর উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক রিপোর্টের মতে মানব ইতিহাসে যত গণহত্যা হয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশের ১৯৭১-এর গণহত্যা স্বল্পতম সময়ে সর্ববৃহৎ সংখ্যা। গড়ে প্রতিদিন ৬০০০-১২০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। দেখা যায় যে ২৫-এ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, এই মোটামুটি ২৬০ দিনে দিনপ্রতি ৬০০০-১২০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এই তথ্যটি দিয়ে একটু হিসাব করলে দেখা

যাবে হত্যার Lower Limit: ৬০০০x২৬০=১৫,৬০০০০ (পনের লক্ষ ষাট হাজার) এবং Upper Limit: ১২০০০x২৬০=৩১,১২০০০ (একত্রিশ লক্ষ বারো হাজার)। আমরা যদি এই পরিসংখ্যানের মাঝামাঝি ধরে হিসাব করি তাহলে এ সময় মৃত্যুর সংখ্যা ২৩,৪০,০০০ (তেইশ লক্ষ চল্লিশহাজার)। এখন একাত্তরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। প্রতি পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৫ জন করে ধরলে পরিবার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। তাহলে প্রতি পরিবারে মারা গিয়েছে প্রায় ০.১৬ জন, অর্থাৎ ১৯৭১ এ শতকরা ১৬% পরিবারের কেউ না কেউ মুক্তিযুদ্ধে মারা গিয়েছিল। এখানে অন্তত শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এমন অনেক পরিবার আছে যারা মুক্তিযুদ্ধে একাধিক সদস্য হারিয়েছে, একইভাবে বলা যায় এমন পরিবারও আছে যারা কোন সদস্য হারায়নি। আবার একই সাথে এটাও বলা যায় কোন কোন পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা বিষয় লক্ষ করবেন এই পরিবার গুলো একাত্তরের পরিবার, আজকে ২০১৪ সালের পরিবার নয়। ২০১৪ সালের হিসাবে এখন একাত্তর পরবর্তী তৃতীয় প্রজন্ম। সহজ ভাষায় বললে একাত্তরের পরিবার থেকে তার পরবর্তী পরিবার এবং সেই পরিবারের পরবর্তী পরিবার এখন চলছে। অর্থাৎ এখনকার শতকরা ষোলটা পরিবারে আপনি একাত্তরের ভিকটিম পাবেন না। আপনাকে যেতে হবে আপনার দাদার পরিবারে, দাদার পরিবারের ভেতর দাদার ভাই বোনও বিবেচনায় আসবে (তিরিশ উর্ধ্বদের ক্ষেত্রে বাবার পরিবার)। আপনার দাদার-বাবার পরিবারের সাপেক্ষে বিবেচনা করে দেখুন একশ পরিবারে শহিদের খোঁজ পান কি না।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ সাইট জেনোসাইড ডট ওআরজি বলছে :

একাত্তরের ২২ শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আওয়ামীলীগ ও তার সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। প্রথম থেকেই স্থির করা হয় যে (এদের) হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনকে নির্মূল করতে হলে সামরিক হত্যার অভিযান শুরু করতে হবে: "ওদের ত্রিশ লক্ষ্য লোককে হত্যা কর", ফেব্রুয়ারী সম্মেলনে নির্দেশ দিয়েছিলেন রিয়াসৎ ইয়াহিয়া খান, "এবং বাকিরা আমাদের থাবার মধ্যে থেকেই নিঃশেষ হবে"। (রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫০)। ২৫ শে মার্চ তারিখে গণহত্যার রকেট উৎক্ষিপ্ত হল এবং শত শত ছাত্রকে নির্মূল করা হল (পাকিস্তানী বর্বর সেনাদের হাতে)। দলে দলে এই নৃশংস হত্যাকারীরা সারা ঢাকা শহরের রাজপথ অলি গলি চষে বেড়িয়ে একই রাতে কম করেও ৭,০০০ নিরীহ মানুষকে হত্যা করল। কিন্তু এটা তো 'শুরু' মাত্র। এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার অর্ধেক পালিয়ে বাঁচল, এবং অন্তত ৩০,০০০ মানুষ এর মধ্যে পাকবাহিনীর হাতে নিহত হল। চট্টগ্রামেও জনসংখ্যার অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হল। সারা পূর্ব পাকিস্তানে জনগণ পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং হিসাব করে দেখা গেছে এপ্রিলেই সারা পূর্ব পাকিস্তানে

অন্তত তিন কোটি মানুষ সামরিক নরপিশাচদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়িয়েছে (রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, পৃষ্ঠা ৪৮)। এক কোটিরও ওপর পূর্ব পাকিস্তান বাসী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল- যা তাদের অর্থনীতির ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে, এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতকে সামরিক হস্তক্ষেপে বাধ্য করেছিল (গণহত্যার শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৭.৫ কোটি)।

আমরা এখন অন্য একটা রাষ্ট্রের গণহত্যার খতিয়ান হাজির করবো। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে গাণিতিক যুক্তি আগে হাজির করা হয়েছে ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে সেই দাবিটা পর্যালোচনা করা। মূলত এটাই প্রকৃত গবেষণার পদ্ধতি। আমরা আজ ইতিহাসের যে গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করবো সে গণহত্যার নির্মমতা আর ভয়াবহতায় বাংলাদেশেরও ছাড়িয়েছে ।

কম্বোডিয়াঃ

এখন আমরা তুলনা করে দেখব যে ১৯৭৫-১৯৭৯ সালের মধ্যে কম্বোডিয়ার খেমাররুজরা যে গণহত্যা চালিয়েছিল তার সাথে ১৯৭১এর গণহত্যার। কম্বোডিয়ায় চার বছরের গণহত্যায় খেমাররুজরা প্রতিদিন মেরেছিল একজনের উপরে, আর বাংলাদেশে পাকবাহিনী প্রতি দশ দিনে মেরেছিল একজন। বাংলাদেশের গণহত্যায় ০.১৬টি পরিবার নির্যাতিত হয়েছে (কমপক্ষে), যেখানে কম্বোডিয়ায় হয়েছিল শতকরা ১.১৮টি।

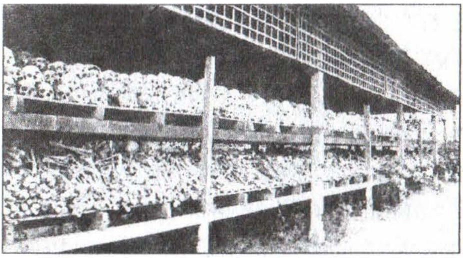

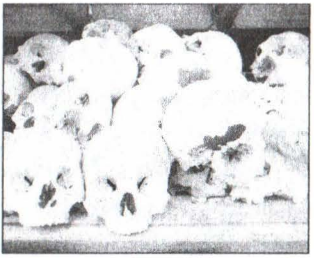

কম্বোডিয়ায় খেমাররুজরা ক্ষমতায় ছিল চার বছর, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। এই চার বছরে তারা হত্যা করেছে প্রায় ১৭ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ। হ্যাঁ, অনেকে বলতে পারেন কোথায় চার বছর আর কোথায় ২৬০ দিন, তারপরেও তো কম্বোডিয়ার গণহত্যা ৩০ লক্ষ ছাড়ায়নি। যারা এরকম ভাবছেন তাদের বলি, দাঁড়ান, একটু ধৈর্য্য ধরুন। তখন কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা বাংলাদেশের মত সাড়ে সাত কোটি ছিলনা, খেমাররুজরা ক্ষমতায় যাবার সময় কম্বোডিয়ার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৬ লক্ষ। তাহলে ভাবুন, ৭৬ লক্ষের মধ্যে ১৭-৩০ লক্ষকে মেরে সাফ করে ফেলেছে!

১৯৭৪-৭৫ সালে কম্বোডিয়ায় ১৫ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের বসবাস ছিল। কাজেই প্রত্যেক পরিবারে মারা গিয়েছে ১.১৮ জন করে, যেখানে বাংলাদেশের

হিসাবটা ছিল ০.১৬। তাহলে বলতে হয় গড়ে কম্বোডিয়ার প্রত্যেক পরিবারই কাউকে না কাউকে হারিয়েছে যা বাংলাদেশে ঘটেনি। জনসংখ্যার ২২ ভাগ মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করতে খেমাররুজরা সময় নিয়েছিল ৪৮ মাস (৪x১২=৪৮), তাহলে সেই হারে জনসংখ্যার ৪ ভাগ নিশ্চিহ্ন করতে খেমাররুজরা সময় লাগতো সাড়ে আট মাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কাজ পাকবাহিনী নয় মাসে করেছে খেমাররুজরা প্রায় সাড়ে আট মাসেই সেটা করতে পারতো। তুলনামূলকভাবে খেমাররুজরা পাকবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি নৃশংস ছিল, আগেই বলা হয়েছে কম্বোডিয়ায় এক পরিবারে মারা গিয়েছিল ১.১৮ জন, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিসাব ০.১৬, সুতরাং খেমাররুজরা পাকবাহিনীর তুলনায় ৭ গুণেরও বেশি নৃশংস ছিল (১.১৮/০.১৬)।

অথচ কম্বোডিয়ার গণহত্যার ফিগার নিয়ে কিন্তু এত বিতর্ক হয়নি আজও।

কম্বোডিয়ার গণহত্যার খতিয়ানের সাথে বাংলাদেশের তুলনা নিয়ে সবার আগে লেখেন অস্ট্রেলীয় প্রবাসী লেখক আবুল কাশেম তাঁর 'The Mathematics of a Genocide' নিবন্ধে, পরবর্তীতে ব্লগার 'যুদ্ধিক্ত' এই লেখার অনুবাদ করেন 'মিথ নাকি বাস্তবতা' শিরোনামে। দীর্ঘ অর্ধযুগ এই লেখা অনলাইনে একাই রাজত্ব করে। 'যুদ্ধিক্ত' এবং 'আবুল কাশেম'কে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রথম এই ইস্যুতে আলোকপাত করার জন্য।

নাইজেরিয়া :

৬ জুলাই ১৯৬৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চলা নাইজেরিয়ার যুদ্ধের দিকে এবারে একটু আলোকপাত করব। প্রায় আড়াই বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। নাইজেরিয়ার অচল অবস্থায় 'ইগবো' নিয়ন্ত্রিত মিলিটারি বাহিনী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের তেল সমৃদ্ধ অঞ্চল 'বায়াফ্রা' কে ৩০ মে ১৯৬৭ সালে 'দ্যা রিপাবলিক অব বায়াফ্রা' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। কেবল মাত্র পাঁচটি দেশ বায়াফ্রা-কে একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে চিহ্নিত করেছিলো। লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে তাদের আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মত ছিলো না মোটেও। যুদ্ধে হতাহত এই তিরিশ লক্ষ জনগোষ্ঠী আবার আমাদের মত একই গোত্রের বা অঞ্চলের ছিলো না, বিভিন্ন অঞ্চলে মোট হতাহতের সংখ্যা ছিল এটা।

ব্রিটিশ শাসনামলের পর ১৯৬০ সালে স্বাধীনতার পর কার্যত তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় দেশটি এবং তাঁর পরিণতিতেই এই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। যদিও 'বায়াফ্রা' নামক রাষ্ট্রটির পতন ঘটে তারপরেও বিশ্ব গণহত্যার মানচিত্রে নাইজেরিয়ার গৃহ যুদ্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের সক্রিয় সৈন্য ছিলো ৩৫,০০০ থেকে ৭৫,০০০। তাহলে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ যে কোন হিসেবের সৈনিক সংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা বলতে নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে পরিষ্কারভাবে বলা যায় ৯০ হাজারের কম সৈনিক নিয়ে তিরিশ লক্ষাধিক মানুষকে মেরে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়।

রুয়ান্ডা :

রুয়ান্ডা গণহত্যার কথা আমরা সবাই জানি, কারণ রুয়ান্ডা তাদের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু করতে পেরেছে আমাদেরও আগে, রুয়ান্ডায় যে মূল দুই গ্রুপের অস্তিত্ব আছে তারা হচ্ছে হুতু এবং তুতসি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হুতু এবং তুতসিরা সংখ্যালঘু। ১৮৯৪ সালে জার্মানরা রুয়ান্ডা দখল করে নেওয়ার পর প্রথম বিশ্বযুদ্বের সময় তা বেলজিয়াম দখলে নেয়। রুয়ান্ডা দখলের পর তারা তুতসিদের রুয়ান্ডার ক্ষমতায় বসায়। রুয়ান্ডা ব্যবসা বাণিজ্য এই তুতসিরা নিয়ন্ত্রন করতো। ১৯৬২ সালে বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা ছেড়ে চলে যাবার সময় ক্ষমতা চলে যায় সংখ্যাগুরু হুতু সম্প্রদায়ের কাছে।

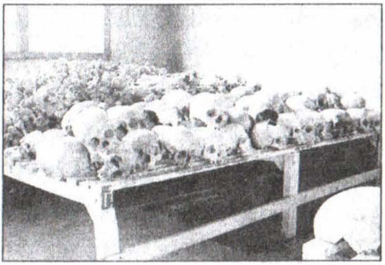

এবার হুতুরা তুতসিদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যায়। এ অবস্থা দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৯৯৪ সালের সতেরোই এপ্রিল এই দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং ১৯৯৪ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। মাত্র ১০০ দিনের যুদ্ধে হুতুরা প্রায় ১০ লক্ষ তুতসি হত্যা করে। যা ছিল পুরো দেশের জনসংখ্যার ২০ ভাগ। এই যুদ্ধ থেকে আমরা দেখি মাত্র ১০০ দিনে দশ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা খুবই সম্ভব। যেটা আমাদের দেশে সংগঠিত গণহত্যার প্রায় সমান। আমরা জানি পাক বাহিনী তাদের সংগঠিত অভিযানে ২৬৬ দিনে তিরিশ লক্ষাধিক বাঙ্গালীকে হত্যা করে। এর সাথে সাথে রুয়ান্ডার গণহত্যা থেকে আমরা আরও দেখতে পাই ১০০ দিনের ভেতরে একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ২০% কে শেষ করে ফেলে অর্ধশিক্ষিত বর্বর একটি

সেনাবাহিনী। সুতরাং ২৬৬ দিনে একটি জনগোষ্ঠীর সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে তিরিশ লাখ অর্থাৎ ৪% মেরে ফেলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধবাজ একটি সেনাবাহিনীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

চীন :

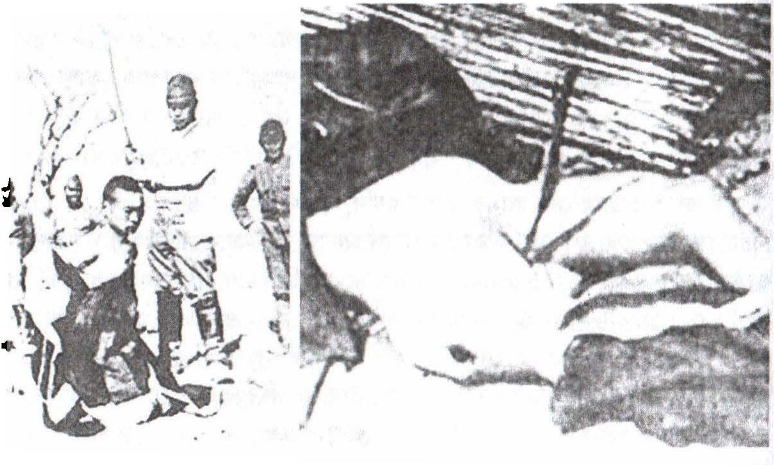

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা আসলে সবাই 'দ্যা নানকিং মাসাকার' কিংবা 'রেইপ অব নানকিং' এর কথা বলে থাকে। ১৯৩৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারীর শেষ সময়ের ভেতর জাপানী সেনাবাহিনী চীনের রাজধানী নানকিন শহরটিকে একদম গুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রচুর পরিমাণে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড এবং লুটতরাজ চলতে থাকে। শেষে হিসেব করে দেখা যায় এই অল্প সময়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ। বলা হয়ে থাকে সেই যুদ্ধে এক তলোয়ারে ১০০ মানুষকে জবাই করা হত। এই হত্যার বিচারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে গঠিত হয় 'নানকিং ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল'। জাপানের এই হত্যাকাণ্ড থেকে আমরা দেখতে পাই এক মাসেরও কম সময়ে কিভাবে একটি জনগোষ্ঠীর প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব।

আর্মেনিয়া :

আর্মেনিয়া ইউরোপের একটি রাষ্ট্র। জর্জিয়া ও আজারবাইজানের সাথে এটি দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের স্থলযোজকের উপর অবস্থিত। ইয়েরেভান দেশটির রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। জাতিগত আর্মেনীয়রা নিজেদের "হায়" বলে থাকে। আর্মেনিয়ার ৯০% লোক এই 'হায়' জাতির লোক। ১৯২২ সালে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রটি স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কিরা আর্মেনিয়াদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা

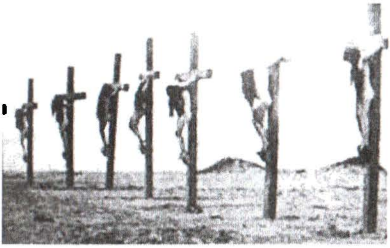

চালায়। একটি রাষ্ট্রে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক ধরে নিলে তাদের ওপর গণহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হয়। ১৯১৫ সালের আর্মেনিয়া গণহত্যা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। ষাটের দশকে আমরাও ছিলাম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চোখে দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক। সামরিক রাষ্ট্র অটোমানদের সঙ্গে পাকিস্তানের অনেক মিল। তিন বছরে ধরে চলা এই গণহত্যায় সেই দেশে ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

সে সময় আর্মেনিয়ার জনসংখ্যা ছিলো মাত্র ৪৩ লক্ষ। তার মানে এই যুদ্ধে ৩৪% জনগোষ্ঠী নিঃশেষে হয়ে যায় তিন বছরে। আর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আমাদের জনগোষ্ঠীর ৪% ভাগকে হত্যা করে নয় মাসে। আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড থেকেও বোঝা যায় জনসংখ্যার শতকরা হারে আমাদের গণহত্যাকেও ছাড়িয়ে যায় আর্মেনিয়ার গণহত্যা।

এরকম আরও অনেক আছি। আমি কেবল দৈবচয়নে গণহত্যা হয়েছে এমন কয়েকটি দেশ নির্বাচিত করেছি এবং এই অল্প কয়েকটি দেশে চলা গণহত্যাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি আমাদের গণহত্যা নির্মমতার দিক দিয়ে অন্যতম হলেও পৃথিবীময় চলা বিভিন্ন গণহত্যায় এই শতকেই আমাদের গণহত্যাকেও ছাড়িয়েছে অনেক দেশ। সাধারণ জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের যে নির্মমতর নজির বর্বর তুর্কিরা, খেমাররুজরা, হুতুরা কিংবা পাকিস্তানীরা স্থাপন করেছে সে ক্ষত পুষিয়ে যুদ্ধহীন একটা সমাজ তৈরি করে নিতে এই জাতিগুলোর আরও সময় লাগবে।

শরণার্থী শিবিরের শহিদেরা

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক অদিতি ফাল্গুনীর বড় ভাই শরণার্থী শিবিরে মারা যান। অদিতি জানিয়েছেন তখন তাঁর বড় ভাই অনেক ছোট ছিলেন। শরণার্থী শিবিরে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে তাঁর বড় ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে। জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কি শরণার্থী শিবিরে নিহত আপনার বড় ভাইকে ৩০ লক্ষ শহিদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন?

তিনি বললেন, আমি শহিদই মনে করি, তাঁর মৃত্যুর জন্য পাক আর্মিই দায়ী। আমার আরেক বড় ভাই তাঁর বয়স তখন চার, মাইলের পর মাইল বাবা-মার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলত 'বাবা পাক আর্মি কখন আসবে? ওরা কখন গুলি করবে? আমাদের গুলি করে না কেন?' সে ভাবত গুলি করাটা বোধয় কোন মজার খেলা। তিনি এখন একজন কবি এবং স্থপতি কানাডায় থাকেন। তাঁর নাম তুষার গায়েন'

শরণার্থী শিবিরে নিহত ভাগ্যাহত মানুষগুলো কি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। যদিও সেসব নিহত মানুষদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের শহিদই মনে করেন কারণ এই মৃত্যুর জন্য কোন বুলেট না লাগলেও এই মৃত্যু ঘটেছিল পাক বাহিনীর নির্মমতার কারণে। এই নিবন্ধে আমরা দেখব শরণার্থী শিবিরে শরণার্থী হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কত আর তাদের মাঝে শহিদ হয়েছিল কত।

আমাদের দেশের মানুষদের কাছে দেশ ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে চলে যাওয়া মানুষদের সংখ্যাটা নিয়ে তেমন কোন দ্বিমত নেই। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় শরণার্থীদের একেবারে সঠিক পরিসংখ্যান। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে;

"পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরচিত আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে গমন করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪১টি শরণার্থী শিবির স্থাপিত করা হয়। এই শিবিরগুলিকে মোট ৯৮,৯৯,৩০৫ বাংলাদেশী আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গে ৭৪,৯৩,৪৭৪, ত্রিপুরাতে ১৪,১৬,৪৯১, মেঘালয়ে ৬,৬৭,৯৮৬, আসামে ৩,১২,৭১৩ ও বিহারে ৮,৬৪১ সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

কিন্তু ৭১ সালে ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের সংখ্যায় নিয়ে প্রচণ্ড মিথ্যাচার করেন। নিউজউইকের সিনিয়র এডিটর Arnaud de Borcgrave প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাতকারটি তাৎক্ষনিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল

হেরাল্ড ট্রিবিউন সহ অনেক পত্রিকায় অনূদিত হয়। সেখানে শরণার্থী ইস্যুতে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়। সাক্ষাৎকারটির চুম্বক অংশ তুলে ধরছি পাঠকের উদ্দেশ্যে;

প্রশ্ন এখনো প্রতিদিন ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে যাচ্ছে- এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

উত্তর না, তারা যাচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যেভাবে ভারতীয়রা গোলা নিক্ষেপ করছে সীমান্তবর্তী মানুষদের এমনিতেই প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। সীমান্ত চীনের প্রাচীরের মত নয়। সীমান্তে চিহ্ন নেই। ভারতীয়রা বিদেশী সাংবাদিকদের ভারতের ভেতরের ভূখণ্ড দেখিয়ে বলে এটাই সীমান্ত

প্রশ্ন : মাত্র কয়েক মাসে ৯০ লাখ মানুষ কীভাবে নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়?

উত্তর সংখ্যাটা আমি মানতে নারাজ। ২০ থেকে ৩০ লাখ হতে পারে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দিয়ে গুনলে ৪০ লাখও পাওয়া যেতে পারে।

ইয়াহিয়া খানের এই চরিত্র অজানা নয় আমাদের। যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম দেখানোর জন্য এরা মরিয়া হয়ে ছিল। আপনারা হয়ত জানেন মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে নিহত মানুষের সংখ্যা ২৬,০০০। তিরিশ লাখকে যারা ছাব্বিশ হাজার বানিয়ে দিতে পারে তারা এক কোটি শরণার্থীকে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ বললে আমরা বরং একটু অবাক হই, এতটা বড় ফিগার তারা স্বীকার করে নিলো কি করে! আসলে ইয়াহিয়া খানের হাতে আর কোন উপায়ও ছিলো না। ৭১ সালে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি ছিল আমাদের দিকে। বিশ্বময় সংবাদপত্রগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে আসলে যে কোন মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে ১৯৭১ সালে ভারতে বাঙ্গালী রিফিউজির সংখ্যা ছিলো এক কোটি কিংবা তার চেয়েও বেশী। মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্বময় প্রকাশিত প্রায় দেড়-শতাধিক পত্রিকা থেকে আসুন একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করি শরণার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা। প্রত্যেকটা রিপোর্ট একটা একটা করে পড়ে দেখা অসম্ভব সেজন্য আমি সবগুলো প্রতিবেদন থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি আলাদা করে বের করেছি। একটা কথা খেয়াল রাখবেন সমস্ত শরণার্থী কিন্তু এক দিনেই ভারতে পাড়ি জমাননি আর তাই সংখ্যাটা বেড়েছে ক্রমান্বয়ে।

ডেইলি টেলিগ্রাম ৩০ মার্চ ১৯৭১ লিখেছে; ২৫ মার্চ ১৫,০০০ মানুষ দেশ ছেড়ে পালায়।

নিউইয়র্ক টাইমসের ২৪ মে ১৯৭১ সালের তাদের পত্রিকায় বলেছে এখন ভারতে শরণার্থী সংখ্যা ১৫ লাখ।

একই পত্রিকা ৬ জুন ১৯৭১ লিখেছে ২০ লক্ষ।

এরপর একই পত্রিকার ১৩ জুন ১৯৭১ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে শরণার্থী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখ।

সাপ্তাহিক ইকোনমিস্ট বলেছে প্রতিদিন ৬০,০০০ মানুষ পালাচ্ছে।

দ্যা স্পেক্টেটর তাদের পত্রিকায় ১৯ জুন ১৯৭১ বলছে ৫০ লাখ।

সানডে টাইমস ২০ এবং ২১ জুন ১৯৭১ লিখেছে ৬০ লাখ

ইকোনমিস্ট নিউজ উইক ২৬ জুন বলেছে ৬০ লাখ।

ওয়াশিংটন ডেইলি নিইউহ ৩০ জুন ১৯৭১ লিখেছে ৬০ লক্ষ।

দ্যা পালাভার উইকলি ৮ জুন ১৯৭১ বলেছে প্রতিদিন ৫০,০০০ মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে

১৭ জুলাই ১৯৭১ ইকনোমিস্ট বলছে ৬৮ লাখ।

হেরাল্ড ট্রিবিউন ৯ আগস্ট ১৯৭১ বলেছে শরণার্থী এখন ৭০ লক্ষ।

কাইহান ইন্টারন্যাশনাল ২ আগস্ট ১৯৭১ রিপোর্ট করেছে ৭৫ লক্ষ।

সেনেগালের লে সেলাই ৭ সেপ্টেম্বর বলেছে ৮০ লক্ষ।

টরেন্টো টেলিগ্রাম ১৩ই সেপ্টেম্বর বলছে ৮০ লক্ষ।

দ্যা ইভিনিং স্টার ৩০ সেপ্টেম্বর লিখেছে ৮০ লক্ষ শরণার্থীর কথা।

ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ ২৫ সেপ্টেম্বর বলছে ৮৫ লক্ষ।

দ্যা এডভান্স মরিশাস ২৭ সেপ্টেম্বর বলেছে ৮৫ লক্ষ।

দ্যা ওয়েস্টার্ন মেইল ২৮ সেপ্টেম্বর বলেছে ৯০ লক্ষ

নিউইয়র্ক টাইমস ১১ই অক্টোবর বলছে ৯০ লক্ষ।

লস এঞ্জেলস টাইমস ১৮ই অক্টোবর বলেছে ৯০ লক্ষ।

লা লিবর বেলজিক ১৮ অক্টোবর বলছে সংখ্যাটা ১ কোটি ছাড়িয়েছে।

নিউজউইক ৬ ডিসেম্বর বলেছে ১ কোটি।

টাইমস ২০ ডিসেম্বর বলেছে ১ কোটি।

একটু বিশেষণী দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করলে দেখবেন ২৫ মার্চ অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকেই শরণার্থীরা দেশ ত্যাগ শুরু করেন এবং সেই সংখ্যাটা মে মাসে এসে দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ। জুনের মাঝামাঝি সংখ্যাটা হয় প্রায় ৫০ লাক্ষ যেটা আগস্টে এসে ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরে ৮৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায় এবং বাদবাকি সময়ে সংখ্যাটা ছাড়িয়ে যায় কোটির ঘর। পৃথিবীর ইতিহাসে এত কম সময়ে এত বেশী শরণার্থী হবার ঘটনা বিরল।

সংখ্যাটা গ্রাফে দেখলে এরকম দেখায় :

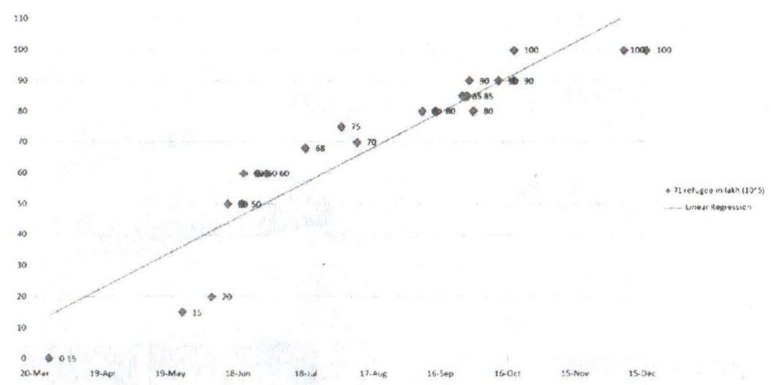

পৃথিবীর কোন দেশই হঠাৎ করে এক কোটি শরণার্থীকে একসাথে খাওয়াতে-পরাতে পারে না। এটা এক কথায় অসম্ভব। আর যখন এই শরণার্থীদের বড় অংশই শিশু এবং বৃদ্ধ তখন একটা অনিবার্য জিনিস ছিল মৃত্যু। এছাড়া গাদাগাদি করে থাকার কারণে মহামারির মত ছড়িয়ে পড়ে কলেরা প্রাণ হারায় লাখ লাখ শিশু। মাঝখানে শীতের প্রকোপেও অনেক শিশু মৃত্যু ঘটে। এই অধ্যয়ে আমরা একটু ধারণা নেয়ার চেষ্টা করব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে।

লা ফিগারো :

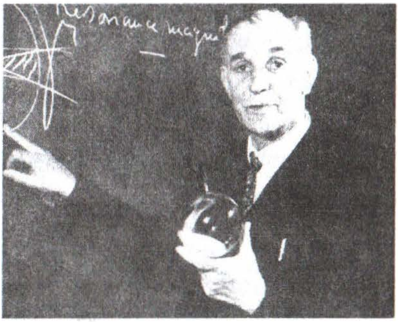

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলফ্রেড কাস্টলার লা ফিগারো, প্যারিস পত্রিকায় ৮ অক্টোবর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যাকে হিরোশিমার পারমানবিক বোমা হামলার চেয়েও ভয়াবহ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা হিরোশিমা ঘটনার শিকার তারা ছিলেন ভাগ্যবান কারণ কিছু বুঝে ওঠার আগের তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কিন্তু পাকিস্তানের শরণার্থীদের দুর্দশা তার মতে এর চেয়েও ভয়াবহ তিনি লিখেছেন, পাকিস্তানি (বাংলাদেশ) শরণার্থীদের জন্য যে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে তা ফুরিয়ে গেছে। খাবারও রসদ সরবরাহ থেমে গেছে- এটা নিশ্চিত এখন থেকে কয়েকদিনের মধ্যে হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটবে তিনি জোর দিয়ে বলেন,

"এখনই যদি খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা না যায় তাহলে ৩ থেকে ৫ লাখ বা তার চেয়েও বেশী শিশু মৃত্যু বরণ করবে"

আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সেই ট্রেজিডিতে লক্ষাধিক শিশু প্রাণ হারায়।

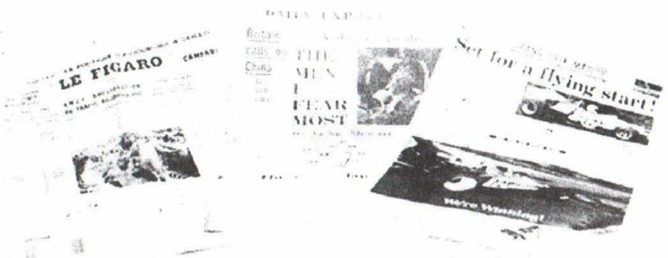

দ্যা স্ট্রেইট টাইমস

এরপর দেখি মালয়েশিয়ার দ্যা স্ট্রেইট টাইমস ৮ জুন লিখেছে কলেরার মহামারির কথা। সেখানে বলা হয়েছে মহামারিতে শরণার্থী শিবিরে এখন পর্যন্ত মৃত মানুষের সংখ্যা ৮ হাজার। দ্যাগবাতে নরওয়ে লিখেছে ৩ লক্ষাধিক শিশু তীব্র অপুষ্টিজনিত মৃত্যু ঝুঁকিতে রয়েছে। দ্যা অর্ডিন্যান্স নরওয়ে ২৭ সেপেম্বর লিখেছে শুধু ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

ব্রিটিশ এমপি বার্নার্ড ব্রেইন দ্যা টাইমস পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রতিবেদন লেখেন শরণার্থী ইস্যুতে যেটা আলোচনার দাবী রাখে;

A8- Palm Beach Post, Wed., June 9, 1971

Death, Despair Follow Pakistan Refugees

By SYDNEY SCHANBERG
(c) New York Times

KARIMPUR, India – His mother had died of cholera an hour before, but her infant son, Gonesh, less than a year old, continued to nurse on her breasts until a doctor came upon the scene and pulled him gently away.

A few feet away, also laid out on the cold cement porch of the health center in this Indian town near the East Pakistan border, another person had died – a 70-year-old grandfather, Abinash Malakar.

His son sat, crumpled and crying, beside the stiffening, emaciated body. Flies had begun to gather. A granddaughter hung, wailing, in the arms of an aunt. This family, from the Jessore district in East Pakistan, had walked for 13 days to reach safety in India.

These are common scenes now along India's 1,350-mile border with East Pakistan. Millions of Bengalis – unofficial figures put the number over five million – have fled East Pakistan to escape the Pakistani army, which since March 25 has been trying to crush the Bengali independence struggle.

With them, the Bengalis have brought cholera. Official figures put the death toll here in West Bengal State at 3,600 but reports indicate that it is much higher – probably well over 5,000. And another thousand or more have died in the three other border states where the Bengalis have taken refuge.

The toll continues to rise steadily and, with new waves of refugees pouring into India daily, there's no way to predict when the epidemic will end. Tons of additional supplies arrived by plane yesterday and a relief movement appeared to be gaining worldwide momentum.

Cargo planes from Britain and the United States led in bringing in vaccine, medical equipment and tents while other nations prepared to join in.

In Geneva, the office of the United Nations high commissioner for refugees said world governments and U.N. agencies have contributed more than $17 million in relief.

The Bengalis have been dying faster than they can be buried. Along the sides of many roads lie the bodies of cholera victims, left there by friends and relatives too frightened of catching the disease themselves to take the time to bury them.

Hordes of vultures fight over the corpses – as well as dogs and crows.

In some towns, attempts have been made to bury the bodies in mass graves. In Karimpur, which is about 120 miles north of Calcutta by road, five relief workers buried several hundred bodies in such graves in one 24-hour period. But even at these sites, packs of hungry stray dogs dig in the earth to try to uncover the bodies.

The tiny, jammed health center at Karimpur – it has 20 beds and more than 100 cholera patients – is typical of the impossibly overworked health stations along the border.

The sounds of the epidemic – coughing, vomiting, groaning and weeping – echo through the small brick building and across the lawn, also crowded with prostrate victims.

Shatish Malakar – the father of Gonesh, the infant who had gone on nursing after his mother had died – stood on the porch in tattered clothes, sobbing out his story.

"No words can describe what has happened to me," the 45-year-old rice farmer wailed. "My wife is dead. Three of my children are dead. What else can happen?"

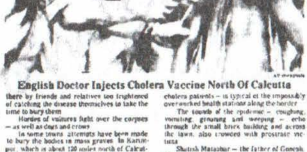

English Doctor Injects Cholera Vaccine North Of Calcutta

Rush on Banks In E. Pakistan

(c) New York Times

KARACHI – Pakistani citizens, close to panic, tried to jam into banks yesterday to trade in huge amounts of paper currency suddenly without value as the result of a government decree Monday night.

The decree demonetized all 500-rupee and 100-rupee notes, respectively worth $106 and $21 at the legal exchange rate. These two types of bills represent approximately 60 per cent of Pakistan's circulating currency.

According to the government, militant Bengali separatists who briefly controlled the administration of East Pakistan in March and April left the banks of East Pakistan empty when the army reoccupied the province. The amount of money that thus disappeared represented about one-tenth of the nation's circulating currency.

The government is seeking to undercut the economic resources of Bengali separatists believed by the government to have taken a large part of the East Pakistani currency into clandestine camps in India.

The demonetization measure is also aimed at crippling the vast currency black market developed as the result of the disparity between the legal exchange rate of the rupee and the rupee's real value in international markets. The differences between these rates is nearly three to one.

Customs inspectors at all ports of entry into East and West Pakistan were instructed yesterday to conduct rigorous searches of all arriving passengers who might be bringing Pakistani currency into the country, especially from neighboring Afghanistan and India and from Hong Kong.

Large quantities of Pakistani rupees are believed to be held by speculators in all these places.

তিনি লিখেছেন দিনের পর রাত আসবে এটা যেমন সত্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ না আসলে পাকিস্তানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসবে এটাও তেমনি সত্য কথা। তিনি লিখেছেন, পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে এর মধ্যে ৭৫ লক্ষ শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমিয়েছে এবং এই সংখ্যাটা বেড়েই চলছে। খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি দেখিয়ে তিনি বলেন শুধু খাবারের জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে।

শরণার্থী ইস্যুতে জাতিসংঘের টনক নাড়ানোর জন্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সহায়তা প্রতিষ্ঠান অক্সফোম এগিয়ে আসে। তারা প্রকাশ করে 'টেস্টিমনি অব সিক্সটি'। ষাট জন বিশ্ব বরেণ্য মানুষের সাক্ষ্য। সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে আছেন মাদার তেরেসা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। সাংবাদিক জন পিলজার, মাইকেল ব্রানসন, নিকোলাস টোমালিন, এন্থনি মাসকারেনহাস এবং আরও অনেকে।

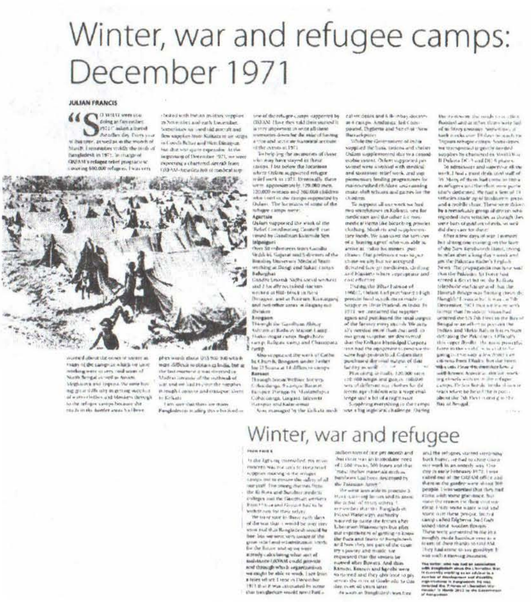
Winter, war and refugee camps:
December 1971
JULIAN FRANCIS
Winter, war and refugee

বিরাট সেই দলিলে সাংবাদিক নিকোলাস টেমালিনের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি;

'যদি এই শিশুদের অতিরিক্ত প্রোটিন দেওয়া না হয়, তাহলে এরা অবশ্যই মারা যাবে। শিশুদের চার ভাগের তিন ভাগ নয় মাসের মধ্যে অবশ্যই মারা যাবে। তার মানে "দশ লাখ শিশু"।'

ষাটজনের সাক্ষ্য থেকে সিনেটর কেনিডির লেখাটি উল্লেখযোগ্য, উল্লেখ্য সিনেটর কেনিডি বেশ কয়েকটি শরণার্থী শিবিরে যান। তিনি লিখেছেন;

গত তিরিশ বছরে পৃথিবী যত দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে তার মধ্যে ভয়াবহটি হচ্ছে পাকিস্তানের সংকট। তিনি লিখেছেন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়াচ্ছে আর মৃত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কেউ কেউ ভারতে যাচ্ছেন আর ৯০ লাখের মধ্যে মাত্র কয়েকশ জনকে খাওয়াচ্ছেন এবং শুশ্রুষা দিচ্ছেন।

কোলকাতার সল্ট লেকের শরণার্থী শিবির ঘুরে এসে তিনি জানান ওখানকার ২ লাখ ৫০ হাজার শরণার্থী মোটামুটি ভালো আছেন তারপরেও তার মতে সেখানকার শিশুদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বিদেশী ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মতে এই অবস্থা চলতে থাকলে মোট শিশুদের তিন চতুর্থাংশ নয় মাসের মধ্যেই মারা যাবে সংখ্যাটা ১০ লাখ!

তিনি লিখেছেন, ৩০ হাজার শরণার্থীর দিয়ারা ক্যাম্পের কথা যেখানে বন্যার পুরো ক্যাম্পটাই তলিয়ে যায়। সেখানকার পরিবারগুলো কাঁদায় ডাকা, নিজেদের মল-মুত্র কখনোই ঠিকমত পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। পানি ভেঙ্গে খাবার আনতে হয়, ওষুধ থেকেও তারা বঞ্চিত পুরোপুরি। বন্যার পর আসছে শীত, এই মুহূর্তে ৯০ লক্ষ মানুষের চাই ৩০ লক্ষ কম্বল। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় ও তাবু এরসাথে বাড়ছে কলেরার প্রকোপ।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির লেখাটি থেকে খানিকটা উদ্ধৃত না করলে এই লেখা সম্পূর্ণ হবে না। আমি তার লেখা থেকে অল্প কিছু উদ্ধৃত করছি তিনি লিখেছেন,

আমি দেখেছি এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পের অবস্থার মধ্যে বায়পক পার্থক্য। কিন্তু অধিকাংশই বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। ক্যাম্প গুলোতে শিশু এবং বৃদ্ধের সংখ্যা মোট শরণার্থীর ৫০ শতাংশ। যাদের বয়স পাঁচ থেকে কম এবং যারা বয়স্ক বৃদ্ধ তারাই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী, এরকম বয়সের মানুষের সংখ্যাই শিবির গুলোতে বেশী, এরা মোট শরণার্থীদের পঞ্চাশ শতাংশ। এদের বেশীরভাগই মৃত্যুবরণ করছে। শরণার্থী শিবিরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলে দেখে দেখে সনাক্ত করা সম্ভব এক ঘণ্টার মধ্যে কারা মারা যাবে আর কাদের ভোগান্তি চিরতরে শেষ হওয়াটা কেবল কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। শিশুদের দিকে দেখুন, তাদের ছোট্র হাড় থেকে আলগা হয়ে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়া ত্বক, এমনকি তাদের মাথা তোলার শক্তিও নেই। শিশুদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন পা ও পায়ের পাতার পানি নেমে অপুষ্টিতে ফুলে আছে। তাদের মায়ের হাতও নিস্তেজ। ভিটামিনের অভাবে তারা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের মায়ের হাতও নিস্তেজ। আর সবচেয়ে সবচেয়ে বেশী কঠিন দৃশ্য, গতরাতে যে শিশুটি মারা গেছে, তার মৃতদেহও এখানেই।

আমি যখন একজন শরণার্থী শিবিরের পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম তার সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনটি কি। জবাব এল "একটি শব-চুলি" পৃথিবীর অন্যতম বৃহত একটি ক্যাম্পের তিনি পরিচালক"

সবশেষে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মাদার তেরেসার সাক্ষ্য থেকে খানিকটা তুলে ধরছি।

তিনি বলেছেন, আমরা যেখানেই থাকিনা কেন অনুধাবন করার চেষ্টা করি আমাদের লাখ লাখ শিশু অপুষ্টি ও ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছে, পৃথিবী যদি এগিয়ে না আসে তাহলে এই শিশুরা মৃত্যুবরণ করবে। আমি ৫-৬ মাস ধরে শরণার্থীদের মাঝে কাজ করছি আমি এই শিশু আর প্রাপ্তবয়স্কদের মরতে দেখেছি।

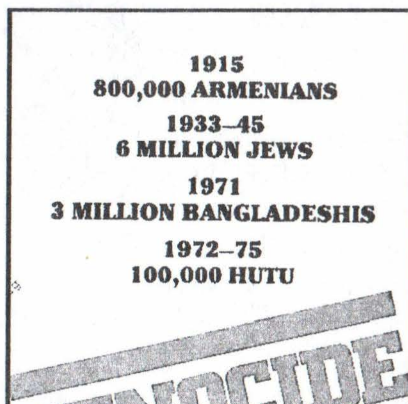

এবারে আসুন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টটি নিয়ে। আর সেই ডকুমেন্ট নিয়ে আমার আগেই দুইজন যোগ্য মানুষ কাজ করেছেন তাদের একজন কুলদা রায় আরেকজন কিংবদন্তী তুল্য মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এম এম আর জালাল

জেনোসাইড নামের একটা বই আছে যার লেখক প্রখ্যাত গণহত্যা

গবেষক লিও কুপার। বইটির প্রচ্ছদ করা হয়েছে কিছু সংখ্যা দিয়ে। লেখা হয়েছে ১৯১৫ : ৮,০০,০০০ আর্মেনিয়ান। ১৯৩৩-৪৫ : ৬০ লক্ষ ইহুদী। ১৯৭১ : ৩০ লক্ষ বাংলাদেশী। ১৯৭২-৭৫ : ১,০০,০০০ হুটু। নিচে লাল কালিতে বড় করে লেখা জেনোসাইড। এই অংকের মানুষ গণহত্যার শিকার। এই আট লক্ষ, ৬০ লক্ষ, ৩০ লক্ষ, এক লক্ষ সংখ্যাগুলো এক একটি প্রতীক। গণহত্যার প্রতীক। ক্যালক্যালেটর টিপে টিপে হুবহু মিলিয়ে দেয়া পূর্ণ সংখ্যার হিসেব এখানে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে পরিকল্পিত গণহত্যার মানবিক বিপর্যয়ের ইতিহাসের প্রতীক। জেনোসাইড বইটি নিয়ে অসাধারন একটি প্রবন্ধ লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এম এম আর জালাল এবং কুলদা রায়। তাদের প্রবন্ধ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ তুলে ধরছি;

১৯৭১ সালে জুন মাসে লাইফ ম্যাগাজিনের সাংবাদিক জন সার কোলকাতায় এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ফটোগ্রাফার মার্ক গডফেরি। তাঁরা দু'জনে একটি গাড়িতে করে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন শরণার্থীদের চিত্র।

সময়টা জুন মাসের মাঝামাঝি। জন সার গিয়েছেন করিমপুরে। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রবক্তা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের এই গ্রামটি পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। এখানে রাস্তা দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যার শিকার হয়ে এরা হারিয়েছেন এদের স্বজন, গবাদিপশু, ঘরবাড়ি, সহায়সম্পদ। ধারাবাহিক মৃত্যুর তাড়া খেয়ে এইসব ভয়ার্ত মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে জন্য ভারতে ছুটে আসছে। সরাসরি গুলির হাত থেকে ঈশ্বরের দয়ায় এরা বেঁচে এসেছে। কিন্তু নতুন করে পড়েছে নতুন নতুন মৃত্যুর ফাঁদে। এদের পিছনে মৃত্যু। সামনে মৃত্যু। বায়ে মৃত্যু। ডানে মৃত্যু। সর্বত্রই মৃত্যুর ভয়ঙ্কর থাবা এদের তাড়া করে ফিরছে।

সাংবাদিক জন সার করিমপুরের রাস্তায় দেখতে পেলেন অসীম দৈর্ঘের লম্বা শরণার্থী মানুষের মিছিল। তাদের কারো কারো মুখে রুমাল গোঁজা। একটা লোকের কাছে তিনি গেলেন। কোনোভাবে রুমালটি মুখ থেকে সরিয়ে লোকটি শুধু বলতে পারলেন, কলেরা। কলেরা। আর কিছু বলার নেই। পিছনে পাক সেনাদের গুলি। আর সঙ্গে কলেরা। সামনে অন্ধকার। কোথায় চলেছে তারা কেউ জানে না। মৃত্যুকে সঙ্গী করে তবু তারা এগিয়ে চলেছে।

করিমপুরের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে কোলকাতা বরাবর, তার বামদিকে শরণার্থী শিবির। এখানে আশ্রয় নিয়েছে ১৫,০০০ মানুষ। এই শরণার্থী শিবিরে কলেরা নির্মমভাবে হানা দিয়েছে। ৭০০ জন ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে। বাকীরা শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? কলেরাও তাদের সঙ্গে চলেছে। খোলা জায়গায় পড়ে আছে মরা মানুষ।

জন সার দেখতে পাচ্ছেন

ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন নেমে এসেছে। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ছিড়ে খুড়ে খাচ্ছে মরা মানুষের দেহ। তাদের চোখ চক চক করছে। কিন্তু মৃত মানুষের সংখ্যা এত বেশী যে শকুনের খেয়ে শেষ করতে পারছে না। শকুনদেরও খাওয়ায় অরুচি এসে গেছে। মরা মানুষের গা থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছে জামা কাপড়। তাদের অনেকের তখনো গা গরম। সবেমাত্র মরেছে। পথে ঘাটে নালা নর্দমায় সর্বত্রই কলেরায় মরা মানুষ পড়ে আছে। জন সার দেখতে পেয়েছেন একটি শিশুর মৃতদেহ। শিশুটির গায়ে একটি শাড়ির অংশ পেঁচানো। তাঁর হতভাগী মা পেঁচিয়ে পুটুলি বানিয়েছে। ট্রাকের চলার সময় অসুস্থ শিশুটি মারা গেছে। চলন্ত ট্রাক থামেনি। মৃত ছেলের জন্য ট্রাক

থামানো কোনো মানেই হয় না। আরও অনেক মৃতপ্রায় মানুষ এই ট্রাকেই ধুঁকছে। আগে পৌঁছাতে পারলে হয়তো কোনো হাসপাতাল পাওয়া যেতে পারে। তাদের সুযোগ মিলতে পারে চিকিৎসার। বেঁচেও যেতে পারে। এই আশায় সময় নষ্ট করতে কেউ চায় না। শিশুটির পুটুলী করা মৃতদেহটিকে ট্রাক থেকে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে ছুড়ে ফেলা দেওয়া হয়েছে।

OLD AND YOUNG COMFORTED EACH OTHER. I SAW A BOY TENDERLY FEEDING HIS DYING GRANDMOTHER WITH LUMPS OF RICE MOISTENED IN WATER. I ALSO SAW THE STARK LONELINESS OF THOSE ALL ALONE ▸

একটি ওয়ান ডেকার বাসের ছবি তুলেছে জন সারের সঙ্গী ফটোগ্রাফার মার্ক গডফেরি। বাসটির হাতল ধরে ঝুলছে কয়েকজন হতভাগ্য লোক। আর ছাঁদে বসে আছে সব মিলিয়ে জনা সত্তর জন। কেউ কেউ বমি করছে। কারো কারো মুখে রুমাল চাপা। কেউ কেউ রুমালের অভাবে হাতচাপা দিয়েছে। ছাঁদের মানুষের বমি জানালা দিয়ে বাসের মধ্যে

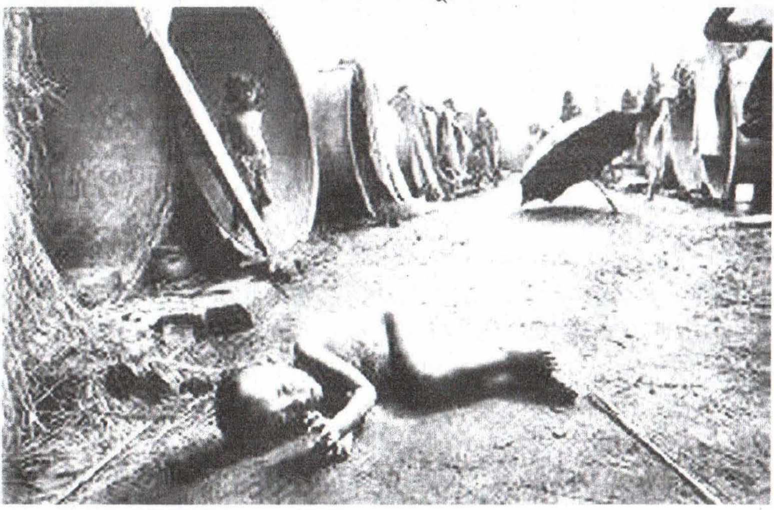

ঢুকে পড়েছে। আর বাসের মধ্যের বমি জানালা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে। পথে। ঘাটে। মাঠে। খালে। জলাশয়ে। হাটন্ত মানুষের গায়ে। বমির সঙ্গে জীবনবিনাশী কলেরার জীবাণু। এইসব হতভাগ্য মানুষের চোখ গর্তের মধ্যে ঢোকানো। আর তার মধ্যে জ্বল জ্বল আতঙ্ক। বাস ভর্তি করে কলেরা চলেছে। বাইরে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ।

'এই সব মানুষ এত বেশী সংখ্যায় মরেছে যে আমরা গুণতে পারিনি। গোণা সম্ভব নয়।' একজন স্বেচ্ছাসেবক সাংবাদিক জন সারকে বলছেন, এরা জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। তারা চলছে তো চলছেই। তীব্র রোদে হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত-অবসন্ন। তৃষ্ণার্ত হয়ে পথের পাশ থেকে আঁজলা ভরে কলেরা দুষ্ট পানি পান করছে। তারা এত দুর্বল হয়ে পড়ছে যে, আক্রান্ত হওয়ার পর একদিনও টিকতে পারছে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

তিনি লিখেছেন, কাঁটাখালি গ্রামে রাস্তার পাশ থেকে হৈ চৈ করে একটি ট্রাক থামাতে চেষ্টা করছে একদল শরণার্থী। তারা করুণ স্বরে আবেদন করছে ট্রাকচালককে তাদেরকে ট্রাকে তুলে নিতে। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা রাস্তার পাশে মাটির উপরে শুয়ে আছে। তাদের পরিবার অসহায় হয়ে চেয়ে। তাদের হেঁটে যাওয়ার শক্তি নেই। যাদের সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা আছে তারা কোনোমতে ট্রাকে উঠে পড়েছে। ট্রাকে করে তারা কৃষ্ণ নগর হাসপাতালে যেতে পারবে। সেখানে চিকিৎসা পাওয়ার চেষ্টা করবে।

করিমপুরের আশেপাশে গ্রামগুলোতে কোনো ডাক্তার নেই। কলেরা ভ্যাক্সিন নেই। নেই কোনো প্রতিষেধক ওষুধপত্র। কাছাকাছি কৃষ্ণনগরে একটি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের উদ্দেশ্যে অসুস্থ মানুষ চলেছে মানুষের কাঁধে চড়ে। ঝোড়ায় করে। কেউবা বা বাঁশের তৈরি টেম্পোরারী স্ট্রেচারে করে। গরুর গাড়িতে। কেউবা রিকশায়।

কৃষ্ণ নগর হাসপাতালে তিল ধারণের জায়গা নেই। যারা হাসপাতালে এর মধ্যে এসে পড়েছে তখনো বেঁচে আছে, তাদের রাখা হয়েছে বাইরে খোলা মাঠে। যাদের

চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাদের রাখা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনিতে। বাঁশের কাঠামোতে কাপড় বসিয়ে ছোটো ছোটো শিবির করে চাউনি তৈরি হয়েছে।

সেখানে কিছু কিছু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাঁদের চোখ গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। অর্ধচেতন বা অচেতন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়ে আছে। তাদের মুখে মাছি পড়ছে। মশা ঘুরছে। অনন্তবিদারী দুর্গন্ধ। স্বজনদের কেউ কেউ হাত দিয়ে, তালে পাখা দিয়ে বা কাপড়ের আঁচল দিয়ে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করছে। সাদা এপ্রোন পরা নার্সরা তাদের শিরায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে স্যালাইন। তাদের চেষ্টার কমতি নেই। কিন্তু নার্সের বা ডাক্তারের সংখ্যা হাতে গোণা। অপ্রতুল।

এই হতভাগ্যদের অর্ধেকেই শিশু। সাংবাদিক জন সার একটি সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে শিশুকে তুলে এনেছে রাস্তা থেকে। তার চোখ বড় করে খোলা। তার হাত ঝুলে পড়েছে। নার্স এক পলক দেখেই বলছে, সব শেষ। কিছু করার নেই। মেয়েটি মরে গেছে। একজন ক্লান্ত ডাক্তার বলছেন, এর চেয়ে কুকুর-বেড়ালেরাও ভালো করে মরে। কিছুটা হলেও তারা চেষ্টা তদ্বির পায়। আর এই শরণার্থী মানুষদের কলে পড়া ইঁদুরের মত মরা ছাড়া কপালে আর কিছু লেখা নেই।

এতক্ষণ তো দেখলেন বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর আশংকা নিয়ে অনেক অনেক লেখা, কিন্তু আদতে ঠিক কত মানুষ মারা গিয়েছিলো শরণার্থী শিবিরে সেটা আমাদের জানা নেই। আর জানা সম্ভব হবে কি না তাও জানি না। তবুও একটু রিসার্চের রাস্তা ধরে আইডিয়া করা যায় সংখ্যাটা।

The Lancet কে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে পুরনো মেডিকেল জার্নাল। এটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক মেডিকেল জার্নালও বলা

হয়ে থাকে। তাদের রিসার্চ জার্নালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েও সচেতনতা তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবির নিয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে তারা তাদের একটি জার্নালে

তাদের ভাষ্য কোলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপকে নিয়ে, যারা একাত্তরের জুনের শেষ থেকে বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি শুরু পর্যন্ত পাঁচ মাস চালু থাকা একটা রিফিউজি ক্যাম্পের ওপর সার্ভে চালায়। এবং তাদের সার্ভেটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য কারণ সেইসব ডাটা প্রত্যেকটি ঘর থেকে আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই সার্ভের উদ্দেশ্য ছিলো ক্যাম্পের জনসংখ্যা, সেখানকার মানুষের বয়সের ধরণ আর মৃত্যুহার নিয়ে।

তাদের ভাষ্য মতে ১,৭০,০০০ শরণার্থীর ঐ ক্যাম্পে কম করে হলেও ৪০০০ মানুষ মারা যায়। তারা বলেছে সংখ্যাটা আরও অনেক বেশী হতে পারে, স্বাভাবিক মৃত্যুকে তারা বিবেচনা করেনি এবং নিহতদের বড় অংশই ছিলো শিশু। এই প্রবন্ধে আরো তথ্য আছে তবে আমার দরকার এটুকুই।

আমাদের কাছে যে ডাটা আছে সেটা থেকে আমরা আগেই দেখছি জুনের আগে থেকেই প্রচুর শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমায়। টাইম পত্রিকার ২৪ মে ৭১ সংখ্যা থেকে জানা যায় শরণার্থীর সংখ্যা তখন ছিলো ১৫ লক্ষ এরপর একই পত্রিকার ১৩ জুন ৭১ সংখ্যা অনুসারে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ লাখে। সানডে টাইমস ২১ জুন ৭১ লিখেছে শরণার্থীর সংখ্যা ৬০ লাখ, ইকনোমিস্ট লিখেছে ২৬ জুন তারিখে যে শরণার্থীর সংখ্যা ততদিনে ৬০ লাখ ছাড়িয়েছে।

এখানে দেখলাম সেই শরণার্থী শিবির খোলার আগেই প্রচুর মানুষ দেশ ছেড়েছেন এবং তাদের অনেকে অবশ্যই মারা গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নিউজ উইকের ৬ ডিসেম্বর ৭১ থেকে জানা যায় শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়েছে।

আমার পড়ালেখায় যতটুকু জানি ভারতের শরণার্থী শিবিরের মধ্যে কোলকাতার শিবিরগুলোই মোটামুটি ভালো বলে বিবেচিত হয়, অন্য অনেক শরণার্থী শিবিরের অবস্থা ছিলো অনেক ভয়াবহ, ছিলো না নূন্যতম খাদ্য আর চিকিৎসা সেবা, সুতরাং সেসব শিবিরে মৃত্যুহার হওয়ার কথা আরও ভয়ঙ্কর রকম বেশী, কিছু ক্যাম্পে কলেরার প্রকোপের কথাও আমরা শুনেছি। বন্যা, শীত এসব তো বাদই দিলাম।

তবুও অনেক কমিয়ে এই সংখ্যাটাকেই ধ্রুব ধরে যদি শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষদের সংখ্যাটা কত হতে পারে সে নিয়ে ধারনা করতে চাই তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায় অনেকটা এরকম :

১,৭০,০০০ মানুষের মধ্যে কমপক্ষে মৃত: ৪,০০০

তাহলে; এক কোটি মানুষের মাঝে পাঁচ মাসে ন্যূনতম নিহতের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ।

ষাট লাখ জনগোষ্ঠী দেশ ছাড়ার পর এই হিসাব করা হয়েছে। পুরো হিসাবটা আরও ভয়াবহ, হয়ত এই সংখ্যাটার দ্বিগুণ কিংবা তিনগুন। কারণ বলা হয়েছে এটা পাঁচ মাসের হিসাব আর ক্যাম্পটা কোলকাতার সেরা ক্যাম্প যেখানে ছিলো পর্যাপ্ত ডাক্তার, খাদ্য আর থাকার জায়গা

আর জন সারের হিসাবে ১৫০০০ মানুষের মাঝে মৃত: ৭০০

তাহলে; এক কোটি মানুষের জন্য হিসাবটা হয় প্রায় পাঁচ লাখ

এখানে আমরা দেখেছি এটা জুন মাসের হিসাব। যদি ধরেও নেই এই শিবিরটা প্রথম থেকেই ছিলো অর্থাৎ মার্চ শেষ দিক থেকে। তাহলে মাত্র তিন মাসের মৃত্যুর হার এটা। এই ক্যাম্প যদি ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত আপনারা সংখ্যাটা আঁচ করতে পারছেন।

এরপর মুক্তিযুদ্ধকালীন আরেকটি চমকপ্রদ সংবাদপত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরে চাই

শরণার্থী শিবিরে জুন মাসেই ৫০ লাখের ছয় লাখ মারা যায় এমন একটা নিউজ করেছিল ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ (২২ জুন)। মনে রাখবেন জুনে যুদ্ধ শুরুর ৪ মাস। ডিসেম্বরের আগেই শরণার্থীর সংখ্যা ছিল এক কোটির ওপরে। সেই হিসেবে হতাহতের সংখ্যা বারো লাখের উপরে ছিলো।

THE WASHINGTON DAILY NEWS,
TUESDAY, JUNE 22, 1971

600,000 of 5 Million Refugees Have Died

Pakistan Panic: History's Biggest Exodus

BY JAMES FOSTER
Scripps-Howard Staff Writer

Petrapol

Like the muddy waters of the Ganges, which many have just crossed, the flood of East Pakistan refugees pouring into India thru this and other border points moves with a terrible certainty and force.

The total to date is about five million – give or take a million. Some officials say it is the biggest evacuation in history. So great is the refugees' momentum that when a checkpoint becomes clogged they simply spill around it. Indian border guards, exhibiting unusual compassion, make little attempt to halt them.

The people are driven by a fear of the West Pakistan army. They say it is committing wholesale butchery in an effort to put down East

They have no choice but to push on.

Eventually they'll make it to Gopanpal Nagar camp, a few miles beyond Banjaon, where they will receive initial help. The camp is little more than a flat shadeless field next to a school compound. There are eight block-long rows of tents and seven more rows of bamboo framework already in place awaiting arrival of canvass covering.

The officer in charge, R. C. Das, says he has 'only' 10,400 evacuees registered – 2,000 crowded into the tents and the balance finding shelter as best they can in the surrounding woods.

'Better Today'

"Things are better today than yesterday," he explains. "Last night we moved 9,000 out of here to another camp."

Around the clock new refugees move in to replace those who have moved on. Obvious cases of cholera

এই পত্রিকাটার খোঁজ দিয়েছে ছোটভাই ফাজলের রহমান। তার কাছে কৃতজ্ঞতা রইল। তাহলে পরবর্তী ৫ মাসে যদি আরও ৬-৭ লাখ মারা গিয়ে থাকে তাহলে মোটমাট সংখ্যাটা হয় ১২ থেকে ১৩ লক্ষ।

আমার ব্যাক্তিগত অভিমত মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের সংখ্যা কম করে হলেও ৬ থেকে থেকে ১২ লক্ষ।

আজকের দিনে যারা পুরো যুদ্ধেই মৃতের সংখ্যা দুই কিংবা তিন লাখ দাবী করে তাদের আসলে জানা উচিত শরণার্থী শিবিরে মৃত মানুষগুলোর কথা। এদের শহিদের মর্যাদা দেয়া হবে কি না আমি জানি না কিন্তু এদের মৃত্যুর কারণ সেই একটাই পাকিস্তান।

আশা করি সামনের দিন গুলোতে শরণার্থীদের নিয়ে আরও অনেক কাজ হবে, আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ অংশটির চিত্র ফুটে উঠবে আরও পরিষ্কার হয়ে।

তথ্যসুত্র :

১) বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস

২) বিদেশীর চোখে ১৯৭১

৩) জেনসাইড: লিও কুপার

৪) গণহত্যার অন্য অধ্যায়: এম এম আর জালাল, কুলদা রায়

৫) genocidebangladesh.org

৬) The Lancet অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

৭) উইকিপিডিয়া

কেন তারা এতো ধর্ষণ করল ?

প্রথমেই একটা বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি, আর সেটা হচ্ছে– মুক্তিযুদ্ধে বড় পরিসরে ধর্ষণ হয়েছে। এই উক্তিটি কি সর্বমহলে সমান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কি না, না পেয়ে থাকলে কেন পায়নি। এর বিপরীতে কি কি বক্তব্য এসেছে, কেন এসেছে এবং সেইসব বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতাই বা কতটুকু। যুদ্ধ মাত্রই ধর্ষণ, সম্ভবত পৃথিবীতে বড় পরিসরে ঘটে যাওয়া এমন একটি যুদ্ধও পাওয়া যাবে না যেখানে কোন ধর্ষণ হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও প্রচুর ধর্ষণ হয়েছে বলেই আমরা দাবী করে থাকি, বাংলাদেশ সরকারের হিসেবে সংখ্যাটা প্রায় দুই লাখ বিবেচনা করা হলেও প্রকৃত সংখ্যাটা এরচেয়ে অনেক অনেক বেশী হতে পারে কিংবা কমও হতে পারে, সেটা এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনা বিষয় নয়। প্রকৃত সংখ্যা আসলে কত হতে পারে এ নিয়ে এই নিবন্ধের পরবর্তী পর্বগুলোতে বড় পরিসরে আলোচনা করা হবে। পক্ষে বিপক্ষের সমস্ত ডাটা থেকে আমরা বের করে আনার চেষ্টা করবো মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের প্রকৃত পরিসংখ্যান। কাজটা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না, কারণ এই ঘটনার ভিকটিম আমরা নিজেরাই; আমাদের মা-বোনেরাই। ব্যাপারটা অনেকটা চলিশ বছর পর বধ্যভূমি থেকে লাশ গোনার প্রচেষ্টাও বলা যেতে পারে, কিন্তু আমরা নিরুপায়। সময়ের প্রয়োজনে আজ এটা করা অনিবার্য।

এ বিষয়ে আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছেন একজন মানুষ, তার নাম শর্মিলা বোস। বোস একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের একজন সিনিয়র গবেষণা সহযোগী। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ওপর বড় পরিসরে লেখা তাঁর বই 'ডেড রেকনিং: ১৯৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি' দেশে বিদেশে আলোচনার রসদ যুগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মরণকালের সবচেয়ে বিতর্কিত বই হিসেবে এটি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেকের মতে নিরপেক্ষতার নামে নির্লজ্জভাবে পাকিস্তানীদের সাফাই গাওয়া হয়েছে বইটিতে।

মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনের ব্যাপারে পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে। সেটা নিয়ে পরবর্তী পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর হাতে বড় পরিসরে নারী নির্যাতন হয়নি এমন দাবী তুলে 'Economic and Political Weekly'-এর September 22, 2007 সংখ্যায় "Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন শর্মিলা বোস ৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধে নারীদের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। এ ছাড়াও শর্মিলা বোসের লেখেন "Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971" (EPW, Oct 8, 2005)। নিবন্ধটির প্রথম সংস্করণ ডঃ বোস ২০০৫ সালের ২৮-২৯ জুন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী এক সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। সম্মেলনের শিরোনাম ছিল– সংকটে দক্ষিণ এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, ১৯৬১-১৯৭২।

প্রথমেই বলে নিচ্ছি এই প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বোসে কিংবা পাকিস্তানী কমিশনের সমস্ত লেখনীর ওপর আলোকপাত করা হবে না। শুধুমাত্র ৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধে নারী নির্যাতন সম্পর্কে শর্মিলা বোসের গবেষণা এবং কমিশনের মন্তব্যর দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করবো। কারণ আমার মতে শর্মিলা বোস যেসব অভিযোগ তুলেছেন তাতে অন্য সবার সব প্রশ্নের উত্তর একসাথে পাওয়া যাবে।

আমাদের মানতেই হবে যুদ্ধ নিয়ে জয়ী সম্প্রদায়ের এক রকম গল্প থাকে, পরাজিতদেরও অন্যরকম গল্প থাকে। আর স্বাভাবিক ভাবেই দুটো গল্পে পরস্পরকে দোষারোপ করা হয়। দুটো গল্পেই থাকতে পারে অনেক ভুল তথ্য, অনেক মিথ্যাচার। কিন্তু অনেক অনেক বছর পর যখন ইতিহাস লেখা হয় তখন সব গল্পের জট খুলে সত্যটা ঠিকই বের হয়ে আসে। এটাই স্বাভাবিক। আর একটা জিনিসও লক্ষ রাখতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু দুটো পরাশক্তি কিংবা দুটো সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধটা হয়েছিলো পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের নিরীহ সাধারণ জনগণের। সুতরাং এই যুদ্ধে আমরা একই সাথে নির্যাতিত এবং বিজয়ী গোষ্ঠী। অন্য সব যুদ্ধের সাথে এই যুদ্ধ মিলিয়ে ফেলার আগে এই বিষয়গুলো ধর্তব্যে আনাটা জরুরী।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে কেন এই প্রবন্ধে শর্মিলা বোসকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, অন্য কেউ নয় কেন। অনেকেই তো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন। উত্তরটাও

অতি সহজ, একটা ঘটনার আলোকে ভালো করে শর্মিলা বোসের গুরুত্ব বোঝা সম্ভব। ওয়াশিংটনের একটি কনফারেন্সে শর্মিলা বোসের নিবন্ধ উত্থাপিত হবার পরপরই পাকিস্তানী বিভিন্নপত্র-পত্রিকাগুলোয় আবার মুক্তিযুদ্ধের ইস্যুগুলো নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। ত্বরিত এ বিষয়ে লেখা ছাপা হয় দ্য ডেইলি টাইমস (হাসান, জুন ৩০, ২০০৫; সম্পাদকীয় জুলাই ২, ২০০৫) এবং ডন (ইকবাল, জুলাই ৭, ২০০৫)-এর মত প্রভাবশালী পত্রিকায়। দু'টো পত্রিকাই বোসের বরাত দিয়ে উল্লেখ করে- বাংলাদেশের যুদ্ধে কোন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে নি। সারা পৃথিবীময় পাকিস্তানীদের বাংলাদেশ বিরোধী মোক্ষম অস্ত্র শর্মিলা বোসের লেখনি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পাকিস্তানী জেনারেলদের অনেকেই লিখেছেন। যারা পড়েছেন তারা জানেন এসব বইয়ের প্রায় সবটা থাকে মিথ্যাচারে ভরপুর, এদিকে বাংলাদেশেও অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে নির্মোহভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য উপাত্ত যাচাই করতে আমাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া। পাকিস্তানী বাহিনীর রক্তচক্ষুর ভেতর দিয়েও মুক্তিযুদ্ধ আর গণহত্যার অনেক কম খবরই দেশের বাইরে যেতে পেরেছে। তবুও যতটুকু বেরিয়েছে সে সমস্ত খবরাখবর বিশ্বময় পৌঁছে যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীর বড় অংশের জানতে পারে পাকিস্তানিদের নির্মমতার কথা। সারা পৃথিবীর জনমত চলে আসে বাঙালীদের পক্ষে। আর এইসব খবরাখবর সরবরাহ করেন যেসব সাংবাদিক এবং বিদেশী পর্যবেক্ষক তারা ঘটনাগুলো নিরপেক্ষ এবং নির্মোহভাবেই লিখেছেন। এইসব টেলিভিশন আর সংবাদপত্রের প্রচারণার কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী পাকিস্তানিদের নির্মমতা পৃথিবীর মানুষদের কাছে পরিষ্কার। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করে। কিন্তু অন্য দিকে পাকিস্তান তাদের পক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য ইতিহাসকেই তাঁরা দাঁড় করাতে পারেনি স্বাভাবিক ভাবেই। যদিও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্কুল কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তারা নিয়মিত মিথ্যাচারিতা, বাংলাদেশীদের সাধারণ নাগরিকদের প্রতি বিনা কারণে বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠ্যবইতে নিয়মমাফিক পাকবাহিনীর নির্মমতার কথাই বলা আছে, কখনোই বিনা কারণে পাকিস্তানের সাধারন নাগরিকদের প্রতি কোন হিংসার বানী নেই।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানী জেনারেলদের বই গুলো খাপছাড়া। এসব বইতে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার সাথে সাথে স্ব-গোত্রীয়দের বিরোধিতা করেছে। সেনাবাহিনী পরাজয়ের জন্য দায়ী করেছে রাজনীতিবিদদের। পলিটিশিয়ানরা দায়ী করেছে সেনাবাহিনীকে। যুদ্ধকালীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল আরেকজন জেনারেলকে দায়ী করে লিখেছে প্রচুর। ফলশ্রুতিতে পুরো পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মিলে এমন একটা গ্রন্থ গ্রন্থনা করতে পারেনি যেখানে সমস্ত খুন-ধর্ষণ-গণহত্যা-লুটপাটের দায়মুক্তি পাবে তারা। একক ভাবে বাঙালীদের দায়ী করে একটা বই তারা আসলেই

লিখতে পারেনি। তাদের এই শূন্যতাকে পূরণ করেছেন শর্মিলা বোস তার "ডেড রেকনিং: ১৯৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি" বই এবং তাঁর বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধের মাধ্যমে।

গুরুতর কিছু অভিযোগ :

শর্মিলা বোসের Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War প্রবন্ধে করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

১) শর্মিলা লিখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর বলছে, পঁচিশে মার্চ থেকে ষোলই ডিসেম্বরের মধ্যে তিরিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে, দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং এক কোটিকে হতে হয়েছে শরণার্থী। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘটে যাওয়া সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা, মাত্র ৩৪,০০০ সদস্যের একটি সেনা বাহিনীর পক্ষে আট থেকে নয় মাসের মধ্যে এই মাত্রায় ধর্ষণ করতে হলে প্রত্যেককে ধর্ষণে লিপ্ত হতে হবে এবং প্রত্যেককে অবিশ্বাস্য সংখ্যক ধর্ষণ করতে হবে যা অসম্ভব।"

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3865]

২) শর্মিলা জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধাবস্থায় (১৫ এপ্রিল ১৯৭১) দেয়া এক নির্দেশনার বরাত দিয়ে বলেছেন, 'যুদ্ধে কিছু ধর্ষণ হতেই পারে, তবে আমি আশা করবো আমার সৈনিকেরা সবধরণের লুট, ডাকাতি এবং অসদ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। যদি এ ধরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3866]

৩) শর্মিলা লিখেছেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী হত্যাকাণ্ডের চাক্ষুস সাক্ষীদের সাথে সরাসরি কথা বলে আমি জানতে পেরেছি পাক বাহিনী সবসময় পুরুষদের টার্গেট করতো। মহিলাদের সবসময়ই আলাদা করে ছেড়ে দেয়া হত। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ত ঘটতে পারে তবে এত বড় স্কেলে ধর্ষণ অসম্ভব। হত্যাকাণ্ডের সময় কখনই নারীদের হত্যা করা হয় নাই, কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকলে সেসব ছিলো ক্রসফায়ার।

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3866]

৪) শর্মিলা লিখেছেন, আমার কাছে যে তথ্য প্রমাণ আছে সেটা থেকে বলতে পারি ৭১এ কিছু ধর্ষণ হয়েছে কিন্তু সংখ্যাটা কখনোই হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ নয়। ধর্ষিতাদের মধ্যে ছিলো হিন্দু এবং মুসলিম, বাঙালী, বিহারী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী। আর ধর্ষণ করেছিলো বাঙালীরা, বিহারীরা, পশ্চিম পাকিস্তানিরা এবং আর্মি অফিসারেরা। অনেক অবাঙালীদের ধর্ষণের পর হত্যা করে বাঙালিরা।

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3870]

৫) শর্মিলা লিখেছেন, তখনকার কিছু জুনিয়র অফিসারের সাথে কথা বলে আমি জেনেছি যে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের শাস্তিও দেয়া হয়েছে আর্মিদের বিধান অনুযায়ী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের জেলও হয়েছে। কিছু বিচ্ছিন্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও এত বড় স্কেলে ধর্ষণ কখনই ঘটেনি।

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3866]

৬) একজন প্রখ্যাত বাঙালী বীরাঙ্গনা ভাস্কর সম্পর্কে লিখেছেন- পাকিস্তানিদের কর্তৃক কথিত ধর্ষণের পরেও তিনি তার পরিবারে কাছে পালিয়ে চলে যান নি, বরং অফিস করেছেন। তিনি সেই সময় বন্দী ছিলেন না। বাসায় থাকতেন, অফিসে যেতেন, এমনকি ইচ্ছে হলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে আসতেন। সেনারা তাকে সিনেমায় নিয়ে যেত, জেনারেল ম্যানেজারের বাসায় ডিনারে আমন্ত্রণ করতো, ফোন করতো

[Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War. P-3867]

এই পুরো প্রবন্ধ জুড়ে শর্মিলা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কয়েকটি পয়েন্ট।

* পাক সেনাদের হাতে ধর্ষণ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা
* ধর্ষণ হয়েছে কিন্তু সংখ্যা খুবই কম।
* পাকিস্তানীদের পাশাপাশি অনেক বাঙালীও ধর্ষণ করেছিলো।
* অনেক বাঙালী নারী সেনাবাহিনীকে মনরঞ্জন করতে সম্মত ছিলো।

এরপর তিনি তার মনমত কিছু কেস স্টাডি দেখান। সবগুলো সম্পর্কেই বিস্তারিত

আলোচনা করা হবে সামনের পর্বগুলোতে। কিন্তু সবার আগে একটা জিনিস পরিষ্কার করা দরকার আর সেটা হচ্ছে, পাকিস্তানীদের হাতে ধর্ষণগুলো কি নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না কি তাদের কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো।

ঈমানী দায়িত্ব :

স্বাধীনতার পর ধর্ষিতা বাঙালী মহিলাদের চিকিৎসায় নিয়োজিত অস্ট্রেলিয় ডাক্তার জেফ্রি ডেভিস গণধর্ষনের ভয়াবহ মাত্রা দেখে হতবাক হয়ে কুমিলা ক্যান্টনমেন্টে আটক পাক অফিসারকে জেরা করেছিলেন যে তারা কিভাবে এমন ঘৃণ্য কাজ-কারবার করেছিলো। অস্ট্রেলিয় চিকিৎসক বিচলিত হলেও পাক অফিসারদের সাচ্চা ধার্মিক হৃদয়ে কোন রকম রেখাপাত ঘটেনি। তাদের সরল জবাব ছিলো,

"আমাদের কাছে টিক্কা খানের নির্দেশনা ছিলো যে একজন ভালো মুসলমান কখনই তার বাবার সাথে যুদ্ধ করবে না। তাই আমাদের যত বেশী সম্ভব বাঙালী মেয়েদের গর্ভবতী করে যেতে হবে।"

"We had orders from Tikka Khan to the effect that a good Muslim will fight anybody except his father. So what we had to do was to impregnate as many Bengali women as we could."

ধর্ষণে লিপ্ত এক পাকিস্তানী মেজর তার বন্ধুকে চিঠি লিখেছে;

"আমাদের এসব উশৃঙ্খল মেয়েদের পরিবর্তন করতে হবে যাতে এদের পরবর্তী প্রজন্মে পরিবর্তন আসে, তারা যেন হয়ে ওঠে ভালো মুসলিম এবং ভালো পাকিস্তানী"

"We must tame the Bengali tigress and change the next generation Change to better Muslims and Pakistanis"

উপরের ঘটনা দুটো প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ। এটা শুধুমাত্র নিম্নপদস্থ সৈনিকদের মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করছে। আর উচ্চপদস্থ অফিসারদের অবস্থা তো আর ভয়াবহ।

একাত্তরের সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের সকল ডিভিশান কমাণ্ডারের কনফারেন্সে এক অফিসার তুলেছিলেন পাকিস্তানী সেনা কর্তৃক বাঙ্গালী নারীদের ধর্ষণের প্রসঙ্গ। নিয়াজী তখন সেই অফিসারকে বলেন-

"আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিও। তারপর তিনি হেসে বলেন, "ভালই তো এসব বাঙ্গালী রক্তে পাঞ্জাবী রক্ত মিশিয়ে তাদের জাত উন্নত করে দাও।"

আর এই ধর্ষণের পক্ষে তিনি যুক্তি দিয়ে বলতেন-

"আপনারা কি ভাবে আশা করেন একজন সৈন্য থাকবে, যুদ্ধ করবে, মারা যাবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং যৌনক্ষুধা মেটাতে যাবে ঝিলমে?"

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আবদুল রহমান সিদ্দিকী তার East Pakistan The End Game বইতে আরও লেখেন,

“নিয়াজী জওয়ানদের অসৈনিকসুলভ, অনৈতিক এবং কামাশক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতেন। ‘গত রাতে তোমার অর্জন কি শেরা (বাঘ)?” চোখে শয়তানের দীপ্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন তিনি। অর্জন বলতে তিনি ধর্ষণকে বোঝাতেন।

খোদ হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বলছে;

“The troops used to say that when the Commander (Lt. Gen. Niazi) was himself a rapist, how could they be stopped.”

“সেনা সদস্যরা প্রায়ই বলতো যেখানে কমাণ্ডার (নিয়াজি) নিজে ধর্ষক, তার সৈনিকদের ব্যাপারে আর কি বলার আছে।”

পাকিস্তানী জেনারেল খাদিম শ্চসাইন রাজা “অ্যা স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি” বইতে লিখেছেন, নিয়াজী ধর্ষণে তার সেনাদের এতই চাপ দিতেন যে তা সামলে উঠতে না পেরে এক বাঙালি সেনা অফিসার নিজে আত্মহত্যা করেন।

এখানেই শেষ নয়।

ধর্ষণের অবিচ্ছিন্নতা প্রমাণের জন্য রয়েছে কিছু প্রামাণ্য ছবি,

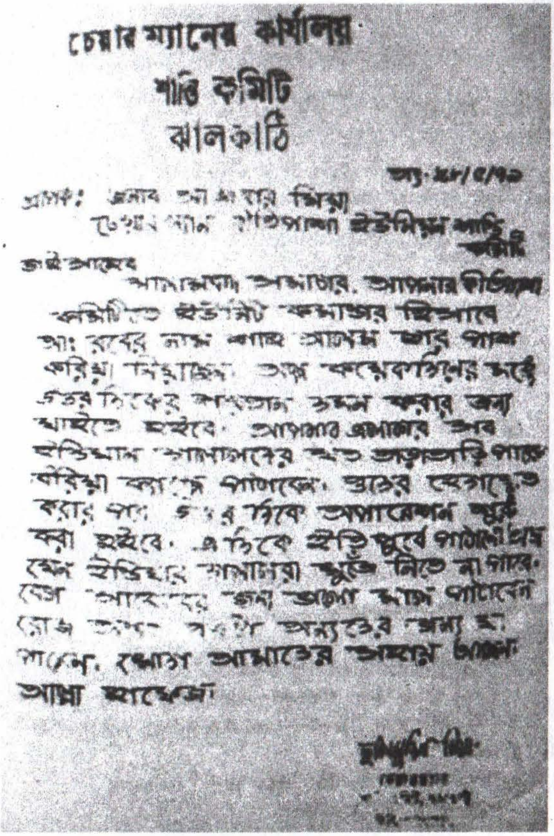
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
শান্তি কমিটি
ঝালকাঠি

“বেগ সাহেবের জন্য ভালো মাল পাঠাবেন। রোজ অন্তত একটা।” মাল বলতে এখানে বাঙালী মেয়েদের কথা বলা হয়েছে। শর্মিলা বোস বারবার বলেছেন, পরিকল্পিত ধর্ষণ হয়নি, যা হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বীভৎস নির্যাতনের ব্যাপারটি সতর্কভাবে এড়িয়ে গেছেন শর্মিলা। এটিকে কি শর্মিলার opportunistic rape মনে হয়?

Girls freed from Pakistani harems

By MIRROR REPORTER

FOUR thousand young Bengali girls have been rescued from Pakistan Army "harems" in Bangladesh, it was claimed yesterday.

They have been discovered at army barracks and encampments by Red Cross volunteers and liberating forces, according to the Mukti Bahini, the Bangladesh guerillas.

The latest batch of fifty-five girls to be freed were said to have been found at former Pakistani camps in Dacca and the surrounding areas.

The fleeing troops had locked the doors to the harems before escaping or surrendering to the Indian Army.

Invading troops had to break the doors down to free the distraught girls.

Most of the girls, aged between 14 and 20, were [illegible] and incoherent. They were wearing only light under-garments and at first did not believe they were being taken away for anything but the troops' pleasure.

Some girls said they belonged to middle-class families and were university students before the Pakistani Army crackdown in March when they were brought to the harems.

Those among them who could talk coherently gave harrowing details of atrocities carried out over many months by Pakistani Army officers and men.

উপরের খবরটি পাকিস্তানি হেরেম থেকে চার হাজার বাঙালি মেয়েকে পাওয়া খবর। নিশ্চয়ই এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলতে পারবেন না শর্মিলা বোস কিংবা তার সমর্থকেরা।

সিলেটের শালুটি করে পাকিস্তানী ক্যাম্পের দেয়ালে ঐ নরপশুদের আঁকা কয়েকটি ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করছি।

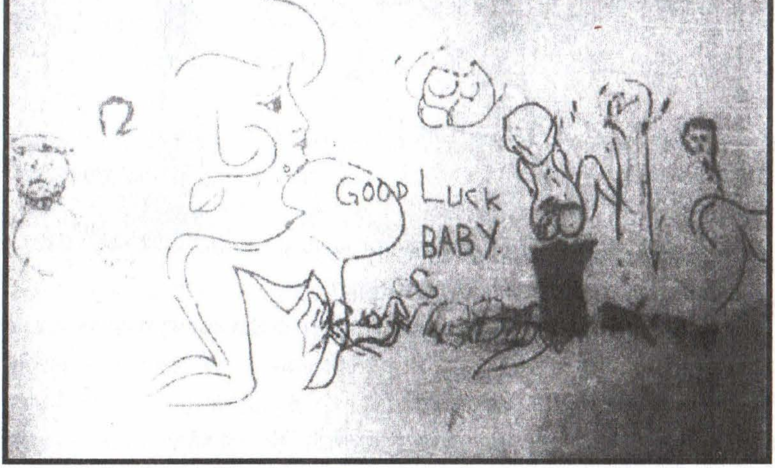

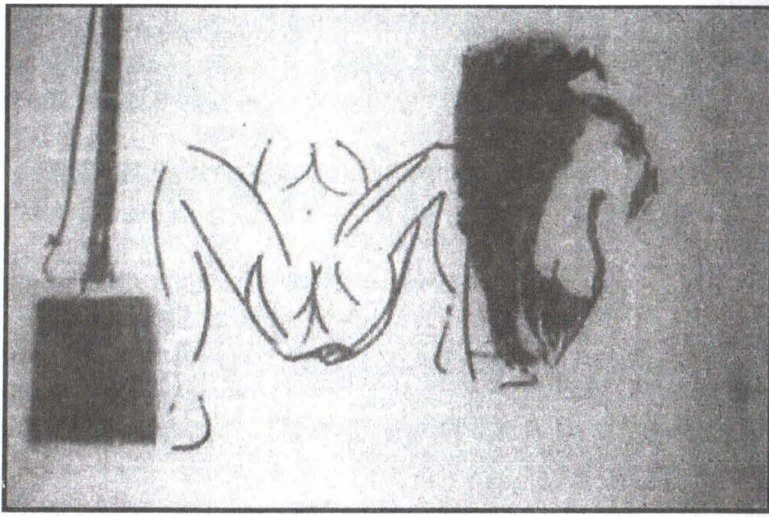

এর থেকে বড় প্রমাণ বোধহয় আর হয় না
আমাদের প্রতি নিঃসংশতার প্রামাণ্য দলিল

এবারে দৃষ্টিপাত করি আরও কিছু ঘটনার দিকে,

ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটির আহ্বায়ক মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডঃ এম এ হাসানের লেখা 'যুদ্ধ ও নারী' গ্রন্থে উঠে আসে এমন অনেক তথ্য যা পাঠকদের নিঃসন্দেহে আগ্রহ জোগাবে। সম্ভবত স্বাধীনতার পর পাকিস্তানীদের হাতে নারী নির্যাতন সম্পর্কে সর্বাধিক তথ্যের সংকলন ঘটেছে তাম্রলিপি থেকে প্রকাশিত বইটিতে।

এক.

"যুদ্ধ শেষে ক্যাম্প থেকে কয়েকটি কাঁচের জার উদ্ধার করা হয়,যার মধ্যে ফরমালিনে সংরক্ষিত ছিল মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ। অংশগুলো কাটা হয়ে ছিল খুব নিখুঁতভাবে।"

ডাঃ বিকাশ চক্রবর্তী, খুলনা।

দুই.

এরপর তারা আমাদের সব মেয়েকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে লাইন করে দাঁড় করাল। আমাদের বাচ্চারা চিৎকার, কান্নাকাটি করছিল। এই পরিস্থিতিতে আর্মিরা বলল, তাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে বাচ্চাদের পা ধরে ছিঁড়ে ফেলবে...

-জোহরা, ছাতনী (দত্তের বাগান), নাটোর।

তিন.

...ধর্ষিতা মেয়েরা চিৎকার করে আমাদের বলতেন 'আমরা তো মরে যাব, আপনারা যদি কেউ বেঁচে যান তাহলে আমাদের কথা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বলবেন।'... পাকিদের নির্যাতনের ধরণ ছিল বীভৎস। তারা মেয়েদের স্তন কেটে ফেলত, যৌনাঙ্গে রাইফেল ঢুকিয়ে গুলি করত; এমনভাবে নির্যাতন করত যে সে প্রক্রিয়া আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না, এসব আমি নিজের চোখে দেখেছি...

-মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম আবু ইউসুফ, ফরিদপুর।

চার.

...পাকি বর্বরেরা প্রত্যেক মহিলাকে অবর্ণনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর তাদের হত্যা করে। ধোপা যেভাবে কাপড় কাচে সেভাবে রেললাইনের ওপর

মাথা আছড়ে, কখনও দু'পা ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে দু'টুকরা করে হত্যা করেছে শিশুদের। স্বাধীনতার অনেকদিন পরেও সেখানে মহিলাদের কাপড়, ক্লিপ, চুল, চুলের খোঁপা ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেখান থেকে আমি আমার ছোট বোনের ফ্রকের এক টুকরো কাপড় খুঁজে পাই...

-বিনোদ কুমার, নীলফামারী।

পাঁচ.

...আমাদের পাশের বাড়ির একটি মেয়ে। সদ্য মা হয়েছে, আট দিনের বাচ্চা কোলে। ঐ সময় সে বাচ্চাটিকে দুধ খাওয়াচ্ছিলো। এমন সময় বাড়িতে আক্রমণ। ঘরে তখন কেউ ছিলো না। এরপর যা হবার তাই হলো, মেয়েটির উপর চলল অমানসিক নির্যাতন। এরমধ্যেই দুপুর গড়িয়ে এল, পাকিরা খাবার খেতে চাইল। ঘরে কিছু না থাকায় ক্ষেত থেকে বেগুণ এনে দিতে বলল। ভীত মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়েটির আসতে দেরি হচ্ছিলো দেখে পাকিরা তার বাচ্চাকে গরম ভাতের হাঁড়িতে ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে নেমে গেল...

-ভানু বেগম, ছাব্বিশা, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।

ছয়.

"মার্চে মিরপুরের একটি বাড়ি থেকে পরিবারের সবাইকে ধরে আনা হয় এবং কাপড় খুলতে বলা হয়। তারা এতে রাজি না হলে বাবা ও ছেলেকে আদেশ করা হয় যথাক্রমে মেয়ে এবং মাকে ধর্ষণ করতে। এতেও রাজি না হলে প্রথমে বাবা এবং ছেলে কে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয় এবং মা মেয়ে দু'জনকে দু'জনের চুলের সাথে বেঁধে উলঙ্গ অবস্থায় টানতে টানতে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।"

-মোঃ নুরুল ইসলাম, বাটিয়ামারা কুমারখালি।

সাত.

"আমাদের সংস্থায় আসা ধর্ষিত নারীদের প্রায় সবারই ছিল ক্ষত-বিক্ষত যৌনাঙ্গ। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিড়ে ফেলা রক্তাক্ত যোনিপথ, দাঁত দিয়ে ছিড়ে ফেলা স্তন, বেয়োনেট দিয়ে কেটে ফেলা স্তন-উরু এবং পশ্চাৎদেশে ছুরির আঘাত নিয়ে নারীরা পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসতো।"

-মালেকা খান, যুদ্ধের পর পুনর্বাসন সংস্থায় ধর্ষিতাদের নিবন্ধীকরণে যুক্ত সমাজকর্মী।

আট.

"১৮ ডিসেম্বর মিরপুরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একজনকে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটির নিচে বাঙ্কার থেকে ২৩জুন সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথা কামানো নারীকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছে পাক আর্মিরা।"

-বিচারপতি এম এ সোবহান।

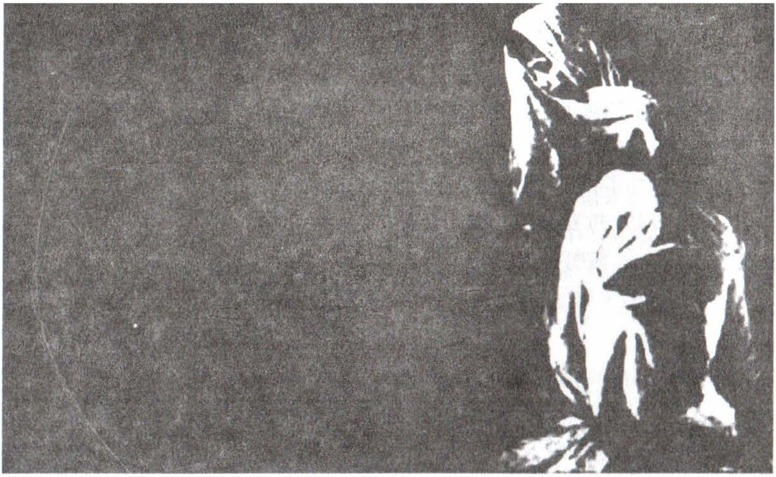

নয়.

"যুদ্ধের পর পর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে বেশ কিছু নারীকে। তাদের পোশাক এবং চলাফেরা থেকে আমরা অনেকেই নিশ্চিত জানতাম ওরা যুদ্ধের শিকার এবং ওদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।"

-ড. রতন লাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দশ.

"কোনো কোনো মেয়েকে পাকসেনারা এক রাতে ৮০ বারও ধর্ষণ করেছে।"

-সুসান ব্রাউনি মিলার, গবেষক।

এই সব খণ্ড খণ্ড জবানবন্দী এই কথাই প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষণ সাধারন কোন যুদ্ধের ধর্ষণ নয়। এটা পাক বাহিনী শুধুই পেজারের জন্য করে নাই, তারা এটা করেছে দায়িত্ব বোধ থেকে। শুধু পেজারের জন্য বেয়নেট দিয়ে যোনি পথ খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে হয় নয়া, দাঁত দিয়ে স্তন ছিঁড়ে ফেলতে হয় না, দু দিক থেকে পা টেনে চিরে ফেলতে হয় না, একজনকে আশিবার ধর্ষণ করতে হয় না।

খুলনার একটি ক্যাম্প থেকে যখন কাচের জারে ফরমালিনে সংরক্ষিত ছিল মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় খুব নিখুঁতভাবে কাঁটা। যখন সিলেটের দেয়ালে ধর্ষকেরা সদম্ভে এঁকে রেখে যায় নিজেদের কৃতকর্ম, তখন বুঝে নিতে হয় এই ধর্ষণ দু'একজন সামরিক কর্মকর্তার বিচ্ছিন্ন মনোরঞ্জন নয়। তখন বুঝতে হয় তারা এসব করেছিলো একটা এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে, আর সেই এজেণ্ডার কথা সৈয়দ সামসুল হক তার কালজয়ী নিষিদ্ধ লোবান উপন্যাসে লিখেছেন সবচেয়ে সুন্দর করে।

"আমি তোমায় সন্তান দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানী হবে, চাওনা সেই সন্তান? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দেব, তোমাকে দেব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, স্লোগান দেয় না, কমিউনিস্ট হয় না। জাতির এই খেদমত আমরা করতে এসেছি। তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাব, তোমাদের গর্ভে খাঁটি পাকিস্তানী রেখে যাব, ইসলামের নিশানা উড়িয়ে যাব। তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে, তোমরা আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমরা আমাদের সুললিত গান শোনাবে।"

- নিষিদ্ধ লোবান, সৈয়দ শামসুল হক।

পরবর্তী পর্বে আমরা কথা বলবো ডাক্তার জেফ্রি ডেভিস গণহত্যা গবেষক সুসান ব্রাউন মিলার এবং ডাঃ এম এ হাসানের বিস্তারিত গবেষণা নিয়ে, ডাক্তার জেফ্রি ডেভিসকে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছিলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুরোধে ১৯৭২ সালে। ধর্ষিত বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা এবং গর্ভপাতের জন্য। তার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন তিনি, বলেছেন বাংলাদেশ চার লক্ষাধিক মহিলা এবং শিশুকে ধর্ষণের কথা, সরকারী হিসাবের ত্রুটি নিয়ে কথা বলেছেন। এছাড়া প্রখ্যাত গবেষক সুসান ব্রাউনি মিলারের এগেইনেস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান এণ্ড রেপ বইটায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে যুদ্ধকালীন আমাদের নারীদের ওপর সংগঠিত নির্যাতনের কথা।

নির্যাতিত নারীর সংখ্যা হতে পারে ছয় লক্ষাধিক

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে একাত্তর জুড়ে পাক বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের যে অল্প কয়েকটি ঘটনা প্রচারিত হয়েছে, এর মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি উল্লেখ করছি।

"রাজাকাররা তাদের কর্মকাণ্ড এখন হত্যা ও চাঁদাবাজিতেই আটকে রাখেনি, এখন তারা বেশ্যালয়ও খুলেছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে তারা একটি শিবির খুলেছে যেখানে অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েদের আটকে রাখা হয়েছে, রাতে পাকবাহিনীর অফিসারদের সরবরাহ করা হয় তাদের। এছাড়াও প্রতিদিনই অনেক মেয়ে অপহরণ করছে তারা নিজেদের জন্যও, এদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি-"

-সানডে টাইমস : ২০ জুন ১৯৭১

"'ওরা আমার বাবা মা কে মেরে ফেলে, দু'জনকেই বন্দুকের বাট দিয়ে পেটাতে পেটাতে মেরেছে। এরপর মেঝেতে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে তিনজন মিলে ধর্ষণ করেছে।' এমনটা বলেছে পেত্রাপোলের উদ্বাস্তু শিবিরের এক ষোড়শী। একই প্রতিবেদনের ভাষ্য, 'ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাতে থাকা পরিবারগুলোর মেয়েদেরও হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এরপর বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে পাকবাহিনীর কাছে। অবশ্য পরিবারগুলো মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ছুটিয়ে নিয়েছে অনেককে। যারা পারেনি, তাদের ঠাই হয়েছে রাজাকারদের খোলা বেশ্যালয়ে।'

-টাইমস : ২১ জুন ১৯৭১

'আগুনে পোড়া গ্রামকে পেছনে ফেলে দুই কিশোরী মেয়ে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছিলেন চন্দ্র মন্ডল। কাদামাটির ভেতর দিয়ে। একটু পর সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লেন। অসহায় চোখে তাকে দেখতে হলো তার মেয়েদের ধর্ষণের দৃশ্য। বারবার, বারবার, বারবার।'

-২ আগস্ট ১৯৭১ নিউজউইক

'১১ এপ্রিল সৈন্যরা আমাদের গ্রামে এল। একদল এসে আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল কী যেন দেখাতে। ফিরে এসে দেখি আমার বোন নেই। আমার প্রতিবেশীর মেয়ে এবং এক হিন্দুর মেয়েও একইরকম নিখোঁজ। মে মাসের মাঝামাঝি আমার বোন আর প্রতিবেশিকে ওরা ছেড়ে দিল। কিন্তু হিন্দু মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেল না। ফিরে আসা দু'জনই গর্ভবতী, বাচ্চা হবে। ওদের দিয়ে কাপড় ধোঁয়ানো হতো এরপর প্রতিদিন দু-তিনবার করে সৈন্যদের সঙ্গে শুতে হতো।'

-নিউইয়র্ক টাইমস : ১১ অক্টোবর '৭১

'সম্প্রতি পাকবাহিনী ডেমোরা গ্রাম চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে, ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সব নারীকে ধর্ষণ করে এবং ১২ বছরের ওপর সব পুরুষকেই গুলি করে মারে।'

-নিউজউইক : ১৫ নভেম্বর '৭১

উপরের সংবাদ গুলোর কোনটিই কোন দেশী পত্রিকার নয়, সবগুলোই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্রিকার। যাদের ধারণা পাকবাহিনী কর্তৃক বাঙালী ধর্ষণ নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাদের অবগতির জন্যই দেয়া। তবে আরেকটা কথাও বলে রাখি, এটা কেবল বরফের ভেসে থাকা অংশ। এরকম হাজারো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে আমাদের দেশে, যুদ্ধ শিশুদের কথা বারবার প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বময়, পাকিস্তানী বাহিনীর নির্যাতনের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে।

প্রথম পর্বে মোটামুটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীদের ধর্ষণ ছিলো একটা উদ্দেশ্যমূলক সংঘবদ্ধ ক্রিয়া, কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই পর্বে আমরা আলোচনা করবো মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যাটা আসলে কত ছিলো সেই বিষয়টিতে। বাংলাদেশের সরকারী হিসেবে সংখ্যাটা ধরা হচ্ছে দুই লাখ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাপিডিয়া, উইকিপিডিয়াসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে

THE BANGLADESH OBSERVER

War babies leave for new homes

ZILLUR RAHMAN URGES PEOPLE

Devote to task of national reconstruction

Poland to help Bangladesh enter UN

AL leader stabbed to death in Chaumuhani

Taka 144 crores bank credit for jute trade

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের শিকার হয়েছে প্রায় দুই লাখ। এখন একটু খতিয়ে দেখা দরকার এই দুই লাখ সংখ্যাটা এলো কোথা থেকে। এটাই কি একমাত্র সংখ্যা, সংখ্যাটা কি এর থেকে বেশী বা কম হওয়া সম্ভব। হলো কেন?

সরকারীভাবে মুক্তিযুদ্ধের ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি ছিলো থানা ভিত্তির নিখোঁজ নারীর সংখ্যা অনুমান করে। ডঃ ডেভিস লিখেছেন;

"অংকটা এরকম : হানাদার দখলদারিত্বের সময়কালে প্রতিটি থানায় প্রতিদিন গড়ে দু'জন করে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। থানার সংখ্যা ৪৮০টি এবং দখলদারিত্ব

স্থায়ী হয়েছে ২৭০ দিন। ৪৮০ কে ২৭০ ও ২ দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেছে ২ লাখ ৬৮ হাজার ২০০ জন। অন্যান্য কারণে মেয়েরা নিখোঁজ হয়েছেন ধরে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ড সংখ্যাটাকে রাউন্ড ফিগারে এনেছেন দুই লাখে! এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের এইটাই অফিশিয়াল ধর্ষিতার সংখ্যা।"

[দ্য চেঞ্জিং ফেস অব জেনোসাইড : ড. জিওফ্রে ডেভিস]

আর তার কথার প্রতিফলন আমরা দেখি দেশের পাঠ্যপুস্তক এবং সরকারী বিভিন্ন বক্তব্যে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সংখ্যাটা আড়াই লাখ বলা হচ্ছে;

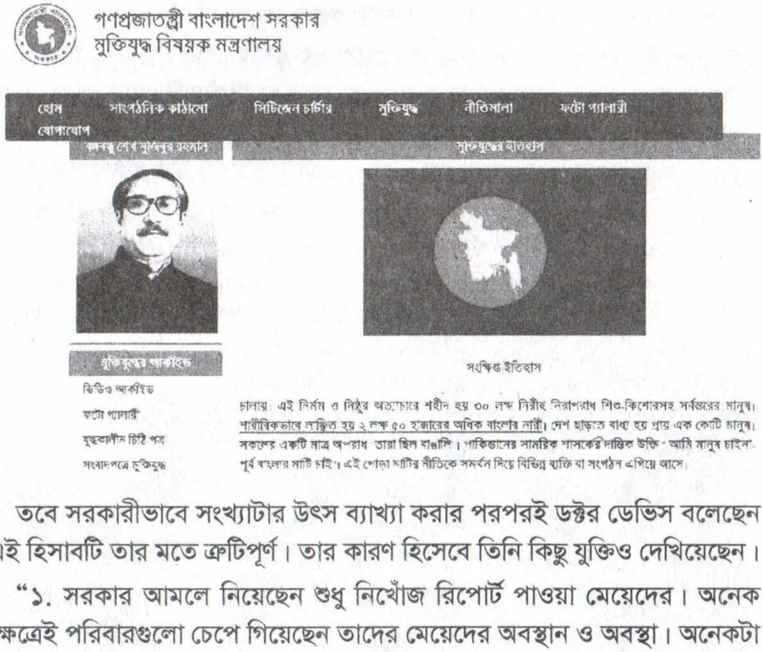

তবে সরকারীভাবে সংখ্যাটার উৎস ব্যাখ্যা করার পরপরই ডক্টর ডেভিস বলেছেন এই হিসাবটি তার মতে ক্রটিপূর্ণ। তার কারণ হিসেবে তিনি কিছু যুক্তিও দেখিয়েছেন।

"১. সরকার আমলে নিয়েছেন শুধু নিখোঁজ রিপোর্ট পাওয়া মেয়েদের। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারগুলো চেপে গিয়েছেন তাদের মেয়েদের অবস্থান ও অবস্থা। অনেকটা লোক-লজ্জায়, সম্মানহানী ও প্রাণহানির ভয়ে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যাদের কাছে অভিযোগ করবেন তাদের কাছেই মেয়ে, অর্থাৎ রক্ষকই ভক্ষক।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই বিশাল অংশটা যুদ্ধকালীন সময়টায় আটকবস্থাতেই ছিল যদ্দিন না পাকসেনাদের কাছে তারা বোঝা হয়ে পড়েছে। বোঝা বলতে শারীরিক ব্যবহারের অযোগ্য গর্ভবতী কিংবা যৌনরোগগ্রস্থ, কিংবা দুটোই। এরপর মেয়ে যদি মুসলমান হয় তাহলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে আর যদি হিন্দু হয় তাহলে মেরে ফেলা হয়েছে। অনেক মুসলমান মেয়েকেও হত্যা করা হয়েছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছেন। এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার ও আত্মহত্যাকারীদের সঠিক সংখ্যাটা আন্দাজে বলাটা কঠিন।

২. সংখ্যাটায় পাকসেনাদের অস্থায়ী অবস্থানকে গোনায় নেওয়া হয়নি। মানে তারা একটা গ্রাম বা অঞ্চলে হামলা করল এবং গণহারে ধর্ষণ চালাল। পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি কিন্তু আক্রমণের শিকার এরকম গ্রামের সংখ্যা বাংলাদেশের তিনভাগের এক ভাগ। সুবাদেই ধর্ষণের সংখ্যাও ছিল অগণিত, যদিও সবক্ষেত্রেই গর্ভধারণ অনিবার্য ছিল না।

৩. রাজাকার ও পাকিস্তানের দালালরা উদ্বাস্তুদের ওপর হামলা চালিয়ে প্রচুর মেয়ে অপহরণ করেছিল (এ ব্যাপারে আগেও বলা হয়েছে)। অনুমান করা হয় ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল এক কোটি বাঙ্গালী, আর তাদের মধ্যে ১৫ লাখ ছিলেন নারী।

বাংলাদেশে আদমশুমারীর হাল বরাবরই করুণ, অনুমান নির্ভর। ১৯৭১ সালে বলা হয় সংখ্যাটা ছিল সাড়ে সাত কোটি এর থেকে এক কোটি লোক বাদ দিন, যারা পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে কিংবা শহর বা নগর বা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয়ের খোঁজে গেছে। বাকি থাকে সাড়ে ৬ কোটি। এদের মধ্যে ধরি দশ লাখ তরুণী-যুবতী, যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম। এদের এক তৃতীয়াংশ যদি ধর্ষিতা হন তাতেও সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৩ লাখ। ৩% বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই দেশে নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া যায় এদের অর্ধেক গর্ভধারণ করেছেন। ধর্ষণের কারণের এদের একজনও যদি গর্ভধারণ না করে (যেটা অবাস্তব), তারপরও দেড় লাখ নারী রয়ে যান যারা গর্ভবতী।

এদের সঙ্গে (১) নং বর্ণনার মেয়েদের ২ লাখ যোগ করুন (এখানে নিশ্চিত থাকতে পারেন তাদের সবাই গর্ভবতী এবং তাদের ঘরছাড়া হওয়ার পেছনে এটাই ছিল প্রধান কারণ)। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, মেয়েদের সংখ্যা প্রতিদিন বদলাতো এবং গর্ভবতীরাই ছিল আশ্রয়হীনা। ধরে নিতে হবে দু'লাখ একটা রক্ষণশীল সংখ্যা। গর্ভবতীদের ১০ ভাগ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এভাবে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ

অবাঞ্ছিত গর্ভবতীদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লাখ। ঘটনার পরবর্তী প্রবাহের আলোকে ব্যাপারটা চমকপ্রদ।

যেসব জেলা আমি ঘুরেছি, এদের বেশিরভাগেই দেখা গেছে অবাঞ্ছিত গর্ভবতীদের সংখ্যা অনুমানের চেয়ে কম। হিসেবের মধ্যে নিতে পারেন ইতিমধ্যে প্রসব করা এবং আত্মহত্যাকারীদের। সংখ্যাটা ছিল গ্রাম পিছু ১০ জন করে! যেসব জায়গায় সামরিক কর্মকাণ্ড ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল (গোটা দেশের অর্ধেক জনপদ), সেখানে যখনই কোনো গ্রামবাসীর সঙ্গে কারো মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি অবিশ্বাস্য এক ছবি পেয়েছি।

ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ থানা পিছু ছিল দেড়হাজার করে এবং জানুয়ারির শেষ নাগাদই গ্রামের দাই, হাতুরে ও হোমিওপ্যাথরা মিলে এদের বেশিরভাগেরই ব্যবস্থা করে ফেলে। রয়ে যায় অল্প কজনা। থানা পিছু দেড় হাজার করে ৪৮০টি থানায় (যেহেতু প্রশাসনিক ভবন, এখানে সামরিক অবস্থান দীর্ঘমেয়াদী হওয়াটাই স্বাভাবিক) ৩ লাখ ৬০ হাজার পোয়াতির সন্ধান পাওয়া যায়। অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে হিসেব করলেও সংখ্যাটা এর ধারে কাছেই থাকবে।"

শেষ পর্যন্ত ডা. জিওফ্রে ডেভিস দেশজুড়ে তার চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতায় এবং উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় চালানো নমুনা জরিপের মাধ্যমে পরিসংখ্যান তৈরি করে জানান, ৪ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজার নারী মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

Raped and made pregnant by a Pakistani soldier, this teenage girl will leave her newborn baby for adoption at Mother Teresa's Home

অস্ট্রেলিও চিকিৎসক ডক্টর জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশে আসেন মুক্তিযুদ্ধের শেষ হবার পর। দেশ স্বাধীন হবার একদম পরপরই তাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়েছিলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুরোধে ১৯৭২ সালে। ধর্ষিত বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা এবং গর্ভপাতের জন্য। 'দ্য চেঞ্জিং ফেস অব জেনোসাইড' ড. জিওফ্রে

ডেভিসের ডাইরি। এই ডাইরিতে উঠে এসেছে অজানা অনেক তথ্য। আজকের লেখার শুরুতে দেয়া পত্রিকার বিবরণগুলোও তাঁর ডাইরি থেকেই পাওয়া। ডাইরি প্রয়োজনীয় অংশটুকুর সরাসরি অনুবাদ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক অমি রহমান পিয়াল। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল "জন্মযুদ্ধ ৭১" এবং অমি রহমান পিয়ালকে জানাই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পাকিস্তানের নথিপত্রে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে ধর্ষণের ব্যাপারটি অস্বীকার এবং পাকিস্তানীরা কিভাবে ধর্ষণ প্রক্রিয়াকে হালাল করেছিলো এসব প্রসঙ্গে ডঃ ডেভিসের একটা সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশ তুলে ধরছি– যেটি পরবর্তীতে ডঃ মুনতাসির মামুনের 'বীরাঙ্গনা ১৯৭২' বইতে গুরুত্বের সাথে উঠে আসে। সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন বিনা ি কস্তা, এই সাক্ষাতকারটি পরবর্তীতে বিডি নিউজে প্রকাশিত হয়।

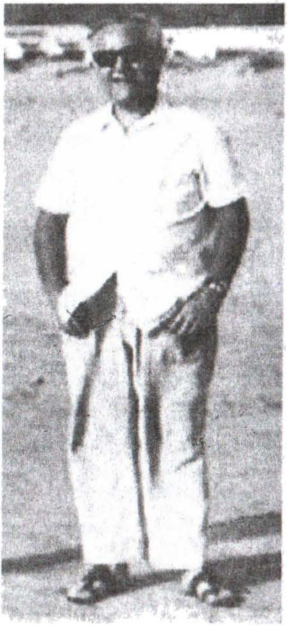
ডাক্তার ডেভিস

প্রশ্ন তারা নারী ধর্ষণের ব্যাপারটা কীভাবে জায়েজ করার চেষ্টা করেছে?

জিওফ্রে : ওরে বাপস! তাদের ওপর টিক্কা খানের এক প্রকার আদেশ বা নির্দেশই ছিল যে, একজন সাচ্চা মুসলমান তার বাবা ছাড়া আর সবার সঙ্গেই লড়াই করবে। কাজেই তাদের যা করতে হবে তাহলো যতটা পারা যায় বেশিসংখ্যক বাঙালী নারীকে গর্ভবতী করা। এটাই ছিল তাদের কাজের পেছনের তত্ত্ব।'

'প্রশ্ন পাকিস্তানের অসংখ্য নথিপত্রে এখনও বলা হয়, ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যা অত্য বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আপনি কি তাদের এ দাবি সত্য মনে করেন?

জিওফ্রে : না, না- তারা ধর্ষণ করেছে। সম্ভবত তারা প্রকৃতই যা করেছে, তার তুলনায় অনেকগুণ কম সংখ্যা দাবি করা হয়। তারা যে পদ্ধতিতে শহর দখল করত তার বিবরণ খুব কৌতূহলোদ্দীপক। তারা তাদের পদাতিক বাহিনীকে পেছনে রেখে গোলন্দাজ বাহিনীকে সামনে নিয়ে আসত। তারপর হাসপাতাল, স্কুল-কলেজে গোলা ছুড়ে গুঁড়িয়ে দিত। এরফলে শহরে নেমে আসত চরম বিশৃঙ্খলা আর তারপর পদাতিক বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ে মেয়েদের বেছে বেছে আলাদা করত। শিশু ছাড়া যৌনভাবে ম্যাচিওরড সকল মেয়েকে তারা একত্রে জড়ো করত। আর শহরের বাকি লোকজনকে বন্দী করে ফেলত পদাতিক বাহিনীর অন্যরা। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হতো। আর তারপর মেয়েদের পাহারা দিয়ে

কম্পাউন্ডে নিয়ে এসে সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হতো। অত্যন্ত জঘন্য একটা ব্যাপার ছিল এটা। বিশ্বের কোথাও কখনও এমন ঘটনার নজির পাওয়া যায় না। তবুও, এমনটাই ঘটেছিল।'

হ্যাঁ, যুক্তির খাতিরে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের ৬৪ হাজার গ্রামে তো পাকিস্তানী সৈন্যরা যায়নি। কথাটা ঠিক, ৬৪ হাজার গ্রামে পাকিস্তানী সৈন্যরা যায়নি; কিন্তু যেসব গ্রামে গেছে সেখানেই তারা মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। আমরা এখানে যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছি তাতে একটি প্যাটার্ন ফুটে উঠেছে। তাহলো : গ্রামে গ্রামে তারা সুনির্দিষ্টভাবে মেয়েদের জন্য হানা দিচ্ছে, শহরাঞ্চল থেকে মেয়েদের উঠিয়ে নিচ্ছে, সে এক ভয়াবহ অবস্থা। অনেক জায়গায় রাজাকার বা শান্তি কমিটির সদস্যরা মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছে। ধর্ষিতা নারীদের একটি অংশ আত্মহত্যা করেছে, মেরে ফেলা হয়েছে। একটি অংশের পরিবার-পরিজন ধর্ষণের কথা কখনও স্বীকার করেনি সামাজিক কারণে। ফলে সঠিক সংখ্যা কখনও জানা যাবে না। সরকারী কর্মচারীরা তখন নানাবিধ কারণে ধর্ষিতার সংখ্যা কম করে দেখাতে চেয়েছে। এর পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে তাহলো এক ধরনের অপরাধবোধ। কারণ, এই মেয়েদের রক্ষার দায়িত্ব আমরা যে কোন কারণেই হোক পালন করতে পারিনি। অনেকের কাছে এটি লজ্জার বিষয় মনে হয়েছে। এই মানসিকতার সমাজতাত্ত্বিক কারণ কি তা আমি জানি না। যে কারণে, এখনও নারী ধর্ষণের বিষয়টি পারতপক্ষে কেউ আলোচনায় আনতে চান না।

ডা. ডেভিস আরও উল্লেখ করেছিলেন, 'হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেয়ার সময় যে সব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারী রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিতা তরুণীর অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে।'

এবার একটু অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করি, আসুন আলোচনা করা যাক গবেষক সুসান ব্রাউনমিলারের গবেষণা নিয়ে। সত্যি বলতে তার কথা আমি প্রথম জেনেছি বাংলাদেশের জনপ্রিয় বগিং পোর্টাল আমার ব্লগের সাড়া জাগানো পোস্ট "আমি, আমার আত্মার আত্মীয়দের কথা বলছি" থেকে। যেটা লিখেছেন ব্লগার 'শনিবারের চিঠি'। এখানে সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে সুসান ব্রাউনমিলারকে নিয়ে। পরবর্তীতে তার 'অ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইলঃ ম্যান, উইম্যান অ্যান্ড রেপ বইটি পড়ে মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতন সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে যুদ্ধশিশু সম্পর্কে সারা পৃথিবী জুড়ে যে গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সুসান ব্রাউনমিলার অ্যান্থনির (জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৩৫) গবেষণা গ্রন্থ-নিবন্ধগুলো। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'অ্যাগেইনস্ট

আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান অ্যান্ড রেপ'। সাইমন এন্ড শুস্টার নামের প্রকাশনী থেকে বের হয় এই গ্রন্থটি। আজ পর্যন্ত ১৬ টি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এটি। বইটির কাজ যখন শুরু হয়– তখন বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, অর্থাৎ এটি ১৯৭১ সালের ঘটনা। সম্ভবত সে কারণেই বইটির একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং তার আদলে যুদ্ধশিশু সম্বন্ধে আলোচনা। বইটির কিছু অংশের অনুবাদ এখানে তুলে ধরছ :

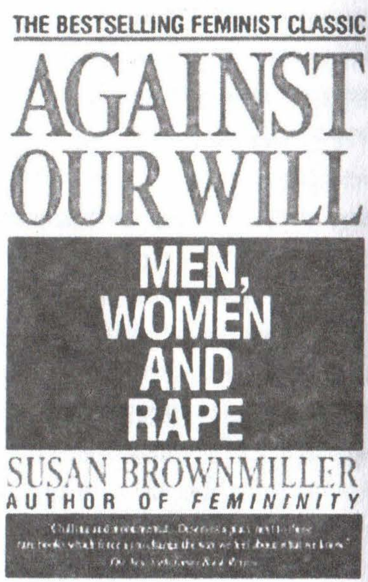

-ইন্টারন্যাশনাল প্যানড প্যারেন্টহুড আবিষ্কার করে যে, স্ত্রী রোগের সংক্রমণের মাত্রা ব্যাপক। একজন অস্ট্রেলিয় চিকিৎসক নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন. "পরীক্ষা করে প্রায় প্রতিটি ধর্ষিতারই যৌনরোগ পাওয়া গেছে"।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদটি ছিলো গর্ভধারণ। সন্তান-সম্ভবা ধর্ষিতার সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও ২৫,০০০ জন ছিলো একটি গ্রহণযোগ্য সংখ্যা। ধর্ষিতা অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মনোভাবটি ছিলো কল্পনাতীত। সামান্য অংশই বাচ্চা ধারণ করতে আগ্রহী ছিলো। প্রায় জন্মদানের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মেয়েরা অনাগত বাচ্চার ভবিষ্যত নিয়ে সামান্যই আগ্রহ প্রকাশ করতো। জোরপূর্বক ধর্ষণের ফসল হিসেবে বাচ্চাদের ভীতিকর আবির্ভাব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনায়াসে অনুমেয় যে, বাংলাদেশে ফরসা রঙের পাঞ্জবি বৈশিষ্ট্যের জারজ সন্তানেরা কখনোই বাঙালি সংস্কৃতিতে গৃহীত হবে না- এমনকি তাদের মায়েরাও না।"

গবেষক সুসান ব্রাউনমিলার ধর্ষণের সংখ্যাকে প্রায় চার লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

During the nine-month terror, terminated by the two week armed intervention of India, a possible three million people lost their lives, ten millions fled across the border to India and 200,000, 300,000 or possible 400,000 women (three sets of statistics have been variously quoted) were raped. Eighty percent of the raped women were Moslems, reflecting the population of Bangladesh, but Hindu and Christian women were not exempt. [Against Our Will : Men, Women and Rape; Susan Brownmiller; Page 81]

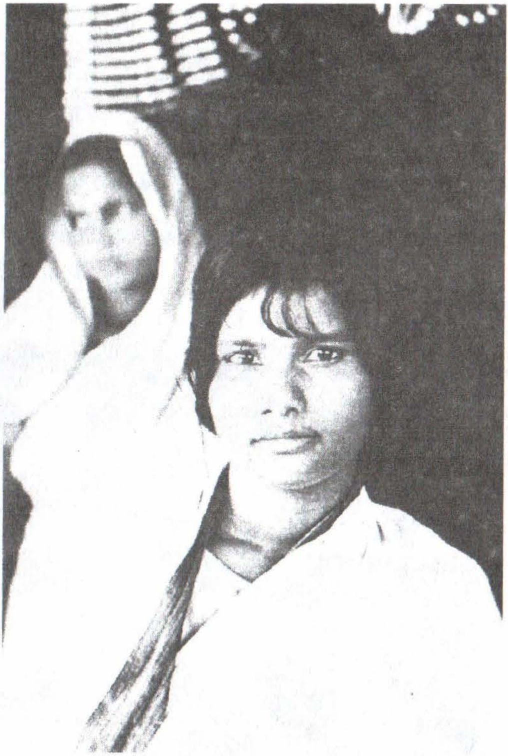

সুসান ব্রাউনমিলার আরও লিখেছেন–

"Rape in Bangladesh had hardly been restricted to beauty... girls of eight and grandmothers of seventy-five had been sexually assaulted."

বাংলাদেশীদের ওপর পাকিস্তানিদের ধর্ষণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র যৌন লালসা চিরতার্থ করার জন্য ছিলো না। আট বছরের শিশু থেকে পঁচাত্তর বছরের নানি-দাদিরাও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আর পাকিস্তানীরা স্থানীয়ভাবেই শুধু ধর্ষণ করেনি, শত শত নারীকে মিলিটারি ব্যারাকে নিয়ে আটকে রেখেছে রাতে ব্যবহারের জন্য।

Some women may have been raped as many as eight times in a night. How many died from this atrocious treatment, and how many more women were murdered as part of the generalized campaign of destruction and slaughter, can only be guessed at.

উল্লেখ সুসান ব্রাউন মিলার বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যাক্তি। টাইমস পত্রিকার জরিপে তিনি শ্রেষ্ঠ নারী মনোনীত হন।

এবারে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক ওয়ারক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির দিকে। স্বাধীন বাংলাদেশে এইসব বিরঙ্গনাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশী কাজ তারার করেছে। তারা একাত্তরের নারী নির্যাতনের একটি সামগ্রিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, এর মাধ্যমে জানা যায়–

১. স্পট ধর্ষণ, স্পট গণধর্ষণ ও বন্দী নির্যাতিতার সম্মিলিত সংখ্যা চার লাখ আটষট্টি হাজার (স্পট ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার তিন লাখ সাত হাজার ছশ এবং বিভিন্নভাবে পাকিস্তানীদের নিকট বন্দী নির্যাতিত নারী এক লাখ চলিশ হাজার চারশ' নারী)।

Table 1: Monthly Distribution of Rape of Bengali Women in 1971

Month	Total Number of Raped Women	Highest toll of rapes in one day
March	18527	557
April	[illegible]	1166
May		1032
June	25000	833
July	21000	633
August	12000	347
September	15000	500
October	10000	612
November	14000	466
December	12000	334
Total:	**2,02,527**	

(It need be mentioned that the aforementioned number of rape toll in 1971 has been collected from 85 Thanas and 42 districts, total statistics from 62 districts are yet to be unearthed)

Source: War Crimes Facts Finding Committee (WCFFC) *Yudhdho O Nari* by Dr M A Hassan, pages 52-53)

Table 2: Community and Religion based rapes in 1971

Name of the Community	Percentage of rapes by religion and communities	Types of Rapes
Muslim women	56.50%	Spot Rape, Spot mass gang
Hindu women	41.44%	rapes, Rape in custody
Others	2.06%	sexual slavery

(**Source**: War Crimes Facts Finding Committee (WCFFC) Yudhdho O Nari by Dr M A Hassan)

২. চিহ্নিত স্থানে নির্যাতিতা নিহত ও অপহৃতসহ স্পট ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার– তিন লাখ ষাট হাজার। এঁদের মধ্যে শুধুমাত্র স্পট ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার প্রায় তিন লাখ সাতাশ হাজার যা মোট নির্যাতিতার সত্তরভাগ। এঁদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন প্রায় ত্রিশভাগ অর্থাৎ এক লাখ আট হাজার নারী।

৩. নির্যাতিত বন্দী নারী প্রায় এক লাখ চলিশ হাজার (এক লাখ চলিশ হাজার চারশ') যা মোট নির্যাতিতার প্রায় ত্রিশভাগ। এরমধ্যে কারাগার, ক্যাম্প, বাঙ্কার প্রভৃতি স্থানে নির্যাতিতার সংখ্যা মোট নির্যাতিদের প্রায় আঠারভাগ।

এছাড়াও বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট, মার্শাল ল আদালত এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাড়িঘর, অফিস আদালত, হোটেল, বিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে নির্যাতিত হন বারোভাগ (ক্যাটাগরি দুই-শতকরা পাঁচভাগ এবং ক্যাটাগরি তিন-সাতভাগ)।

৪. বন্দী নির্যাতিত নারীদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা আশিভাগ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছিয়াশি হাজার। এঁদের মধ্যে চলিশভাগকে হত্যা করা হয়েছে অথবা তাঁরা নিজেরাই আত্মহত্যা করেছেন।

[একাত্তরের নারী নির্যাতন : ইতিহাসের কৃষ্ণ অধ্যায়; ডা. এম এ হাসান; প্রসঙ্গ ১৯৭১ : মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, পৃষ্ঠা ৩]

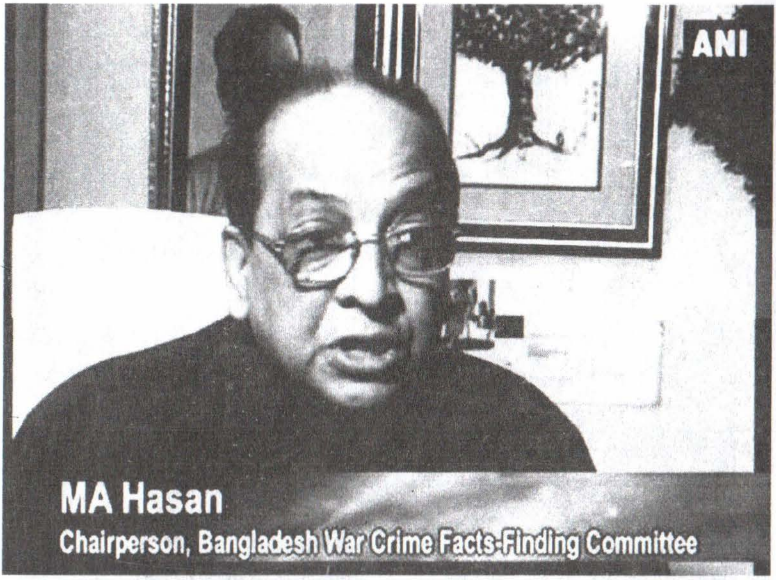

ডা. এম.এ. হাসান তাঁর গ্রন্থে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে ধর্ষিতের সংখ্যা দুই থেকে চার লাখের কথা বলা হয়েছে। তাঁর নিজের জরিপের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন–

১৯৯১-২০০২ সাল পর্যন্ত দেশের ৪২ জেলার ২৫টি থানায় পরিচালিত আমাদের গবেষণায় গৃহীত অসংখ্য সাক্ষাতকারের মধ্য থেকে নির্বাচিত ২৬৭ ব্যক্তির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, একাত্তরে দু'লাখ দু'হাজার জন নারী ধর্ষিত হয়েছে ওই সব স্থানে। সারা দেশে ধর্ষিত ও নির্যাতিত নারীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখের ওপরে।

ডক্টর হাসান পরবর্তীতে লেখেন 'যুদ্ধ ও নারী'। মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর নির্মমতা নিয়ে যারা সন্দিহান তাদের জন্য অবশ্যপাঠ্য এই বই। এই বইটিতে উদ্ধৃত

হয়েছে এমন সব ঘটনা যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী মানুষকে অনেক চিন্তার খোরাক জোগান দেবে।

ওয়ারক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি ১৯৯৯ সালে একাত্তরে নারী নির্যাতনের ওপর এই সামগ্রিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করে। তাদের জরিপ অনুসারে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশে নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬৮ হাজার। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ডকুমেন্টারি নির্মিত হয় যার নাম 'বাংলা নামে দেশ'।

ডক্টর মুনতাসির মামুন 'বীরাঙ্গনা ১৯৭১' শিরোনামে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর একটি কলাম লেখেন। যা কয়েকটি খণ্ডে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে পত্রিকাটিতে। (রেফারেন্স অংশে লিঙ্ক সংযুক্ত করা হলো) পরবর্তীতে তাঁর কলামগুলো 'বীরাঙ্গনা ১৯৭১' গ্রন্থে সংকলিত হয়। ডক্টর মুনতাসির মামুন লিখেছেন তাঁর মতে ডক্টর হাসানের বক্তব্যই বলে দেয়, এটি সারা দেশের জরিপ নয়, সাক্ষ্যও সম্পূর্ণ নয়। তবুও ধর্ষণের ব্যাপকতটা ডক্টর হাসানের বই থেকে বোঝা যায়। মুনতাসির মামুন বলেছেন যে, ডক্টর হাসানের বর্ণনাকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে তাঁর দেয়া সংখ্যাই ছাড়িয়ে যাবে। তিনি লিখেছেন, পূর্বতন সিলেটে ৩০ হাজার বীরাঙ্গনার সন্ধান পেয়েছেন। এ অঞ্চলের চা বাগানগুলোর মহিলা শ্রমিক, তাদের যুবতী ও কিশোরী কন্যাগণ, মনিপুরী ও খাসিয়া মহিলারা ব্যাপক হারে নির্যাতনের শিকার হন। সিলেট শহর, বালাগঞ্জের বুরুঙ্গা, আদিত্যপুর, শ্রী রামসী, শেরপুর, পীরপুর, পীরনগর, করিমগঞ্জ সীমান্ত ও হাওড় এলাকা, সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা, মৌলভীবাজার শহর, রাজনগর, সাধুহাটি, কমলগঞ্জ থানার শমসের নগর, মনিপুরীদের বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি এবং হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, শায়েস্তাগঞ্জসহ বিভিন্ন থানার গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে পাকিরা অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করে। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর থানার ছাব্বিশাসহ বিভিন্ন গ্রাম,

বরিশালের গৌরনদী থানার প্রায় সব গ্রাম, আগৈলঝাড়ার রাজিহার, চেতনার কোলা গ্রামসহ সমগ্র বরিশালে পাকিরা ব্যাপক নির্যাতন চালায়। এ ছাড়া তিনি ফরিদপুর জেলারও বিভিন্ন থানার বেশ কিছু গ্রামের নাম দিয়েছেন যেখানে ব্যাপকহারে ধর্ষণ করা হয়। একটি শহরের প্রতিটি বাড়িতে হানা দিলে ধর্ষিতের সংখ্যা কত দাঁড়ায়।

মুনতাসির মামুন লিখেছেন, আগে উল্লেখ করেছি– শুধু খান সেনারা নয়, তাদের সহযোগী রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকজনও ধর্ষণ করেছে। ব্রাউনমিলার সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রাতে পাকিস্তানী সৈনিক ও রাজাকাররা গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়েদের তুলে নেয়। কাউকে কাউকে স্থানীয়ভাবে ধর্ষণ করা হয়। বাকিদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

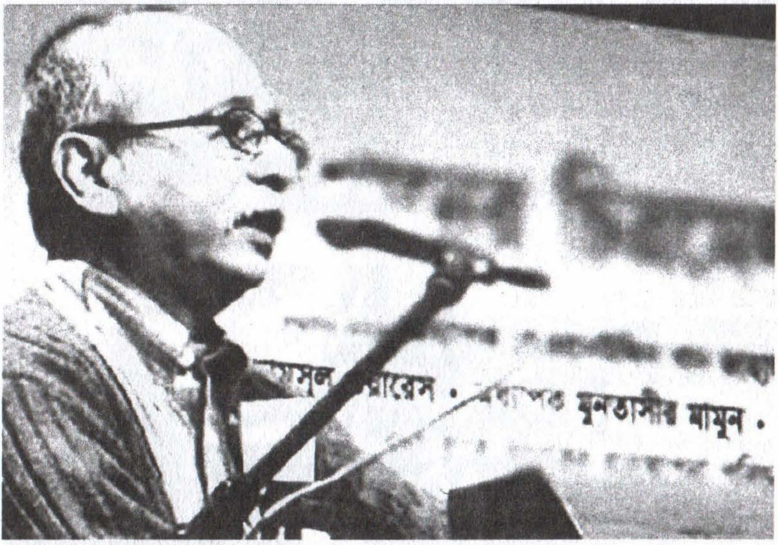

ইন্টারন্যশনাল কমিশন অব জুরিস্টস জানিয়েছিল 'জানা যায়, পাকিস্তানী সৈন্যরা ব্যাপক ধর্ষণ চালিয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং কম বয়সী মেয়েদের ওপর। অসংখ্য সূত্র থেকে ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ সরকার দাবি করেছে, ৭০,০০০-এর বেশি নারী এসব ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সঠিক সংখ্যা যাই হোক না কেন, মার্কিন ও ব্রিটিশ শল্য চিকিৎসকরা গর্ভপাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন জনগণকে এসব ধর্ষিত নারীকে সমাজে গ্রহণ করার প্রচারণায়। এসব অবস্থা সাক্ষ্য দিচ্ছে ধর্ষণের বিশাল সংখ্যার। পাকিস্তানী অফিসাররা এসব বর্বরতা সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে দায়মুক্ত থাকতে চায়। বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু এসব সেনা অফিসার নিজেরা যুবতী মেয়েদের ধরে এনে আটক রাখত নিজেদের যৌন সন্তুষ্টির জন্য।' যে সব সাংবাদিক তখন রিপোর্ট

করেছিলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রতিবেদনেও প্রসঙ্গটি এসেছে বারবার এ রকম চারজনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি।

নিউজ উইকের সাংবাদিক টনি ক্লিফটন উল্লেখ করেছেন, 'আমি দেখতে পাই যে, আক্ষরিক অর্থে মানুষ বোবা হয়ে গেছে, যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের চোখের সামনে বাচ্চাদের হত্যা করেছে এবং মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ভয়ঙ্কর যৌন পরিতৃপ্তির জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে শত শত মাইলাই এবং লেডিসির মতো নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কোনই সন্দেহ নেই।'

নিউজ উইকের সিনিয়র সম্পাদক এ্যারমাউড ডি ব্রোচ গ্রেভ : 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক বিদ্রোহীদের খুঁজতে আসার ভান করে ডেমরা গ্রাম ঘেরাও করে। তারপর ১২ থকে ৩৫ বছর বয়সী সকল নারীকে ধর্ষণ করে এবং ১২ বছরের বেশি বয়সী সকল পুরুষকে হত্যা করে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের সিডনি এইচ, শ্যেনবার্গ : 'পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই বাঙালী মেয়েদের যৌনদাসী হিসেবে আটক রেখেছে। সৈন্যদের ব্যাংকারগুলিতে এসব মেয়েকে সারাক্ষণই নগ্ন অবস্থায় রাখা হতো। ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে পাকিস্তানী সেনারা আত্মসমর্পণের পর এসব নারীর অধিকাংশেরই ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।'

জন হেস্টিংস নামে এক মিশনারি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানী সৈন্যরা... মেয়েদের যোনিপথে বেয়নেট ঢুকিয়ে তাদের হত্যা করেছে।' মেয়েদের মসজিদে আটকে রেখেও ধর্ষণ করা হয়েছে। সাতক্ষীরার একটি গ্রামের মসজিদ থেকে বেশ কিছু নগ্ন নারী উদ্ধারের পর এ ধরণের ঘটনা নজরে আসে। সবশেষে মুনতাসির মামুনেই সিদ্ধান্তে এসে উপনিত হন :

এ সমস্ত বিবেচনায় নিয়ে বলা যেতে পারে, ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ছয় লাখের কাছাকাছি হতে পারে বা তার চেয়েও কিছু বেশি, কম নয়।

সুতরাং এই বিষয় পরিষ্কার মুক্তিযুদ্ধে আক্ষরিক অর্থে নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা আসলে ছয় লক্ষের কাছাকাছি কোন একটা সংখ্যা ছিলো। যদিও এসব দেশী এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষকে এড়িয়ে গেছে। যারা খানিকটা আলোচনার দাবী রাখে বই কি :

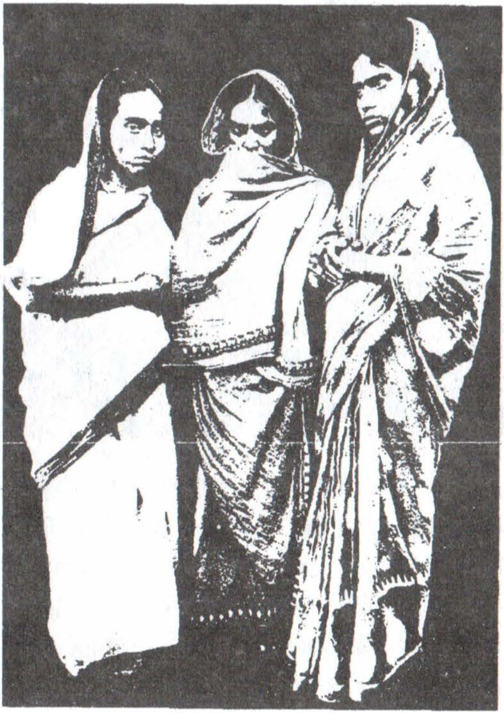

১) মুক্তিযুদ্ধের প্রায় প্রতিটি দিনই কমপক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এদের অনেকে পরিবারের নারীরাই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার, আর এসব অসহায় পরিবারগুলোর একটা অংশ (বিশেষ করে হিন্দু ধর্মালম্বি) যুদ্ধের পর আর দেশে ফিরে আসেন নি। তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। এটা যে কোন অবান্তর কেইস না সেটার জ্বলন্ত প্রমাণ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্ত আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদীর ধর্ষণের ঘটনাটি। এই ঘটনায় মধুসূধন ঘরামীর স্ত্রী শেফালী ঘরামীকে সাঈদী ধর্ষণ করে, এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর মানুষের অপবাদ আর গঞ্জনা সইতে না পেরে

শেফালী ঘরামী ভারতে পালিয়ে যান। যেই ধর্ষণে সাঈদীর অংশগ্রহণের প্রমাণও পেয়েছে আদালত।

২) শরণার্থী শিবিরে মারা যাওয়া এবং আত্মহত্যা করা নির্যাতনের শিকার নারীদের সংখ্যাও কম নয় এবং এদের সংখ্যাটা আমরা কখনোই জানতে পারবো না। জহির রায়হানের স্টপ জেনসাইডে এরকম ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশ থেকে নির্যাতিত হয়ে বাঙালী রমণী ভারতে পারী জমিয়েছে।

৩) ব্রাউনমিলার লিখেছেন শতকরা দশজন মেয়েকে পাকিস্তানীরা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এখন সরাসরি ধর্ষণের শিকার বাকি নব্বইভাগ মেয়েদের পরিবারের মধ্যে যেসব পরিবার রক্ষনশীল ছিলো তাদের একটা বড় অংশই ধর্ষণের ঘটনা সেরেফ চাপা দিয়ে নিজেদের আর সন্তানের সম্মান বাঁচিয়েছেন। সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই এসব বীরাঙ্গনাদের সময়ের স্রোতের সাথে মিলে যাবার প্রবণতা ছিলো। এবং সেই কারণেই যেসব মেয়েরা শারীরিক ভাবে অপেক্ষাকৃত কম আঘাতপ্রাপ্ত ছিলো, তাদের একটা বড় অংশই পরিসংখ্যানের বাইরে থেকে গেছে। এমন কথা এম এ হাসানের যুদ্ধ ও নারী গ্রন্থে অনেকবার এসেছে।

উপরের তিনটা প্যারামিটারকে বিবেচনা করলে, এবং এদেশীয় দোসরদের হাতে নির্যাতনকে বিবেচনায় আনলে নিঃসন্দেহে একাত্তরে নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা ৭ লক্ষের কাছাকাছি হবে বলেই বিশ্বাস করি।

কিছু নির্বাচিত বীরাঙ্গনাদের কথা

একাত্তরে আমাদের নারীদের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন নির্যাতনের কতটা মারাত্মক, কতোটা ভয়াবহ, কতটা বীভৎস ছিলো- যুদ্ধ চলাকালে আমাদের দেশ থেকে প্রকাশিত কোনো দৈনিক পত্রিকায়ই তা প্রকাশিত হয় নি। গণহত্যা, শরণার্থীদের কথা যেমন বিদেশী সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিলো গুরুত্ব নিয়ে সে রকম করে ধর্ষণ কিংবা নারী নির্যাতনের খবরগুলো প্রকাশিত হয়নি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে। এখানে লক্ষণীয় যে এই নারী নির্যাতন ইস্যু নিয়ে সমৃদ্ধ এখনকার কাজগুলোও তেমন প্রচারণা পায়নি স্বাধীন বাংলাদেশে। ডঃ ডেভিস কিংবা সুসান ব্রাউনমিলারের গবেষণা ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিশন কিংবা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কিছু কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ গবেষকদের করা কিছু দুর্দান্ত কাজ ঠিকই রয়েছে, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে এসব কাজ খুব একটা আলোর মুখ দেখতে পারে নি এদেশের মানুষের কাছে। এটা খুবই বিস্ময়কর একটা বিষয়। কেন এই নিস্ক্রিয়তা, প্রথমেই আমাদের খোঁজটা হোক এই প্রশ্ন।

ভোরের কাগজ এ সম্পর্কে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর থেকে জাতীয় দৈনিকগুলোতে পাক সেনা কর্তৃক নারী নির্যাতনের বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হলেও ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতনের ধরণ, প্রকৃতি, শারীরিক, মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে খুব কমই লেখালেখি হয়েছে। "স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও দলিল প্রামাণ্যকরন" প্রকল্পের তৎকালীন গবেষক, বর্তমানে ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টারের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক আফসান চৌধুরী এজন্য ইতিহাস রচনার সনাতনি দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করে বলেছেন, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখনে বরাবরই সশস্ত্র লড়াই, ক্ষমতাসীন পুরুষদের কৃতিত্ব গ্রন্থিত করার উদ্যোগ চলছে, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে লাখ লাখ নারী

অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও যেভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয়েছে, সনাতনি মানুসিকতার কারণে কখনই তা নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক ও গবেষক আফসান চৌধুরীর পড়াশুনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে বিভাগে। সাংবাদিকতা জীবনে ঢাকা কুরিয়ার, দ্য ডেইলি স্টার ও বিবিসি তে কাজ করেছেন। হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র' প্রকল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন আফসান চৌধুরী।

সংঘর্ষকালীন ধর্ষণ এবং অন্যান্য নির্যাতনের মনস্ত্ব নিয়ে গবেষক ক্যাসান্দ্রা ক্লিফোর্ড, ধর্ষণ কীভাবে হয়ে ওঠে গণহত্যার অনিবার্য অস্ত্র সে সম্পর্কে লিখেছেন;

"Rape as a Weapon of War and its Long-term Effects on Victims and Society"

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশে সংঘটিত গণহত্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী নারী নির্যাতনের এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করে। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাসে ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতনকে একটি বিকৃত শিল্পের পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। এই নির্যাতনের সংখ্যাগত মাত্রা সুবিশাল, এখন পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ছয় লক্ষের বেশী। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী শিকার নারী। সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কোন যুদ্ধ ঘটেনি যেখানে ধর্ষণ হয় নি। আক্রান্ত গোষ্ঠীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে, আতঙ্কের রাজত্ব সৃষ্টি করতে, প্রতিরোধ গড়ে ওঠার চেষ্টাকে গুঁড়িয়ে দিতে ধর্ষণ সহ অন্যান্য নারী নির্যাতন, হয়ে ওঠে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রধানতম অস্ত্র। তারপরেও আগ্রাসী সেনাবাহিনীকে নারী নির্যাতনে সরাসরি উৎসাহিত করেছে কর্তৃপক্ষ, এমন ঘটনা ইতিহাসে খুব বেশি ঘটেনি। এই বিরল নিদর্শন পাকিস্তান সেনাবাহিনী রেখে গেছে ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডে।

ডঃ মুনতাসির মামুন যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতন নিয়ে লিখেছেন অনেক। তিনি তার 'মুক্তিযুদ্ধ, নির্যাতন, বিচার' শীর্ষক প্রবন্ধে গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন যুদ্ধ পরবর্তী ইতিহাস লুকোনোর প্রচেষ্টা নিয়ে।

তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমের কথা। তার অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা হয়েছিলো 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নামে দু'খণ্ডে এ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থও। তার বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে। যেমন 'আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোনো ক্যাম্পে নাকি কোনো মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে

শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুঁড়ে ছেড়ে দিত। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা জাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে জলে ভরে উঠত।

শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাৎকারে নীলিমা ইব্রাহিম জানিয়েছেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না।

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কয়েকজন বীরাঙ্গনাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য এবং যুদ্ধাপরাধ এ মাটিতে কী পর্যায়ে গিয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে। সেই মহিলারা এতদিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর সমাজপতি ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাদের প্রায় পরিত্যাগ করে।

নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন, খুলনায় আমি একজন মহিলাকে পাগলিনি বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি যিনি '৭১ সালে নির্যাতিত হয়েছিলেন। খুলনার অনেকেই তা জানেন, কিন্তু কেউ তার পুনর্বাসনে এগিয়ে আসেন নি। এই হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালির আসল রূপ। ডঃ মামুন লিখেছেন; সবাই প্রিয়ভাষিণী নন। প্রিয়ভাষিণীর যা আছে তা হলো চরিত্র, যা আমাদের নেই। থাকলে বাংলাদেশকে পোড়ার বাংলাদেশ বলতাম না।

নির্যাতনের জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতো তা নিয়ে আলোচনা করেছেন শাহারিয়ার কবির এবং মুনতাসির মামুন। এছাড়া এ সম্পর্কে গবেষণা লব্ধ "নারী নির্যাতনের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ICSF-এর অফিসিয়াল ওয়েবে। সব কিছু মিলিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্যাতনের কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১. অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত শারীরিক প্রহার,

২. পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা এবং সেই সঙ্গে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো এছাড়া রাইফেলের বাঁট দিয়ে নির্মম ভাবে প্রহার,

৩. উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা,

৪. সিগারেটের আগুন দিয়ে সারা শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া,

৫. হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভিতর মোটা সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়া,

৬. মলদ্বারের ভিতর সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া এবং বরফখণ্ড ঢুকিয়ে দেয়া,

৭. চিমটে দিয়ে হাত ও পায়ের নখ উপড়ে ফেলা,

৮. দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা গরম পানিতে বারবার ডোবানো,

৯. হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখা,

১০. রক্তাক্ত ক্ষতে লবণ ও মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া,

১১. নগ্ন ক্ষতবিক্ষত শরীর বরফের স্ল্যাবের ওপরে ফেলে রাখা,

১২. মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেয়া,

১৩. পানি চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেয়া,

১৪. অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন চোখের ওপর চড়া আলোর বাল্ব জেলে ঘুমোতে না দেয়া,

১৫. শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ প্রভৃতি।

এটা তো সার্বজনীন, ছিল। গণহত্যার একেবারে শুরুতে ধর্ষণ এবং নির্যাতনের ধরণ যেমন ছিল সেটা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য নির্যাতনের ভয়াবহতার কোন পরিবর্তন হয়নি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই মাত্রায় নৃশংসতা চালানো হয়েছে। নির্যাতনের এই ধরণগুলো সংক্ষেপে এরকম-

১. মার্চ এপ্রিলের দিনগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। কখনো ধর্ষণের পর তাদেরকে রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য দোসরদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ধর্ষণ ও ভোগ শেষে হত্যা করার জন্য।

২. মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকে (যাদের সংখ্যা মোট নির্যাতিতার শতকরা আশি ভাগ) যেখানে পেয়েছে সেখানেই ধর্ষণ করেছে, বিশেষ করে একাত্তরের এপ্রিল থেকে। কখনও তাদের বাসস্থলে, এককভাবে কিংবা পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন ও নিকটজন বিশেষ করে স্বামী-সন্তান। শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মায়ের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের এই বর্বর প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছিল ধর্ষিতা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনসহ বাঙালি সম্প্রদায়ের অহংকার ও অস্তিত্বকে আঘাত করার জন্য। সেই সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর বিকারগ্রস্ত প্রকৃতি চরিতার্থ করার জন্য।

৩. কখনও তারা বাঙালি মেয়েদেরকে ক্যাম্পে বন্দি রেখে ভোগ্যপণ্য ও যৌনদাসী হিসাবে ব্যবহার করেছে।

৪. কখনও একক সম্পদ ও দাসী হিসাবে মেয়েদেরকে তারা এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে কিংবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেছে।

৫. প্রাথমিক অত্যাচারের সময় অথবা দীর্ঘভোগের পর পালিয়ে যাবার সময় পাকিস্তানি বাহিনী এই মেয়েদের স্তন, উরু, যৌনাঙ্গসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের অংশ কেটে নিয়ে গেছে fetichistic crisis ও মনোবিকারে আক্রান্ত হয়ে।

৬. সৈনিকেরা প্রতিটি যুবতী মহিলা ও বালিকার পরণের কাপড় সম্পূর্ণ খুলে একেবারে উলঙ্গ করে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে ধর্ষণে লিপ্ত হতো।

৭. সৈনিকেরা অনেক সময় মেয়েদের পাগলের মত ধর্ষণ করে আর ধারালো দাঁত দিয়ে বক্ষের স্তন কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিত, এতে অনেক অল্পবয়স্ক মেয়ের স্তনসহ বুকের মাংস উঠে এসেছিল। মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বুক, পিঠ ও কোমরের অংশ পাকিস্তানি সৈনিকের অবিরাম কামড়ে রক্তাক্ত হয়ে যেত।

৮. সাধারণত যে সকল বাঙালি মেয়ে এধরণের পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করতো তাদেরকে তখনই চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছিঁড়ে ফেলে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করা হতো।

৯. অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার মদ খেয়ে উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙালি মেয়েদের সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করতো। বহু অল্প বয়স্ক বালিকা উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে রক্তাক্ত শরীরে কাতরাতে কাতরাতে মারা যেত।

১০. অনেক সময় প্রাণভয়ে অন্যান্য মেয়েরা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানি সৈনিকদের কাছ আত্মসমর্পণ করতো। তাদেরকেও হঠাৎ একদিন ধরে ছুরি চালিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে হত্যা করে আনন্দ উপভোগ করতো সৈনিকেরা।

১১. অনেক সময় যুবতী মেয়েকে মোটা লোহার রডের সাথে চুল বেধে ঝুলিয়ে রাখা হতো। পাকসেনারা প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করতো, কেউ কেউ এসে সেই উলঙ্গ যুবতীদের উলঙ্গ দেহে উন্মত্তভাবে আঘাত করতো, কেউ তাদের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ করতো। এসব অত্যাচারে কোন মেয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হতো।

১২. অনেক মেয়ের হাত পিছনের দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। সৈনিকেরা এসব মেয়েদের এলোপাথাড়িভাবে প্রহার করতো। এভাবে প্রতিদিন বিরামহীন প্রহারের মেয়েদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতো। কোন কোন মেয়ের সম্মুখের দিকে দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দু'দিকের মাংস কামড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং প্রতিটি মেয়ের আঙ্গুল লাঠি ও রডের আঘাতে ভেঙ্গে, থেঁতলে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনেও এসব মেয়ের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হতো না। অবিরাম ধর্ষণের ফলে অনেক মেয়ে ঝুলন্ত অবস্থাতেই মারা যেত।

১৩. অনেক সময় বন্দি বাঙালি মেয়েদের নদীতে শিকল বাঁধা অবস্থায় গোসল করতে যেতে দিত। এসময় একটু দেরি হলেই সৈনিকেরা তাদের ঘাঁটি থেকে শিকল ধরে টানাটানি করতো। এধরণের টানাটানিতে অনেক সময়ই প্রায় বিবস্ত্র শরীরে এসব মেয়েকে ঘাঁটিতে ফিরতে হতো।

১৪. গণহত্যার প্রথম দিকে ক্যাম্পে পাকিস্তানি সৈনিকদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেক মেয়ে ওড়না বা শাড়ি গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। এরপর থেকে এসব মেয়েকে বিবস্ত্র অবস্থায় রাখা হয়।

১৫. পাকিস্তানি সৈনিকেরা গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীদেরও ধর্ষণ করে। এতে অনেকেরই মৃত্যু হয়।

১৬. সৈনিকেরা অনেক সময় হঠাৎ গ্রামে বা বসতিতে আক্রমণ চালিয়ে পলায়নরত মহিলাদের ধরে এনে উন্মুক্ত স্থানেই ধর্ষণে লিপ্ত হতো।

১৭. অনেক সময় পিতার সামনেই মেয়েকে, সন্তানের সামনে মাকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করতো পাকিস্তানি সৈনিকেরা। কখনও কখনও পিতাকে, ছেলেকে বা ভাইকে আদেশ করতো মেয়েকে, মাকে অথবা বোনকে ধর্ষণ করতে। এতে অবাধ্য হলে সাথে সাথে তাদের হত্যা করা হতো। এ পর্যায়ে যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতনের কিছু মৌখিক বয়ান এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত ধর্ষণ সম্পর্কিত প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো :

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সুইপার রাবেয়া খাতুনের বর্ণনা

"১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার পাঞ্জাবী সেনারা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় তখন আমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের এস, এফ ক্যান্টিনে ছিলাম। আসন্ন হামলার ভয়ে আমি সারাদিন পুলিশ লাইনের ব্যারাক ঝাড়ু দিয়ে রাতে ব্যারাকেই ছিলাম। কামান, গোলা, লাইটবোম আর ট্যাঙ্কের অবিরাম কানফাটা গর্জনে আমি ভয়ে ব্যারাকের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে থেকে থরথরিয়ে কাঁপছিলাম। ২৬ শে মার্চ সকালে ওদের কামানের সম্মুখে আমাদের বীর বাঙ্গালী পুলিশ বাহিনী বীরের মত প্রতিরোধ করতে করতে আর টিকে থাকতে পারি নাই। সকালে ওরা পুলিশ লাইনের এস,এফ ব্যারাকের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করে বাঙ্গালী পুলিশদের নাকে, মুখে, সারা দেহে বেয়নেট ও বেটন চার্জ করতে করতে ও বুটের লাথি মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছিল। ক্যান্টিনের কামড়া থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকেও বের করে আনা হয়, আমাকে লাথি মেরে, মাটিতে ফেলে দেয়া হয় এবং আমার উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। আমার উপর উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করতে করতে যখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হয় তখন আমার বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে আমি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওদের নিকট কাতর মিনতি জানাচ্ছিলাম। আমি হাউ মাউ করে কাঁদছিলাম, আর বলছিলাম আমাকে মেরোনা, আমি সুইপার, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পায়খানা ও নর্দমা পরিষ্কার করার আর কেউ থাকবে না, তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা আমাকে মেরো না, মেরো না, মেরো না, আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের পুলিশ

লাইন রক্ত ও লাশের পচা গন্ধে মানুষের বাস করার অযোগ্য হয়ে পড়বে। তখনও আমার উপর এক পাঞ্জাবী কুকুর, কুকুরের মতোই আমার কোমরের উপর চড়াও হয়ে আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করছিল। আমাকে এভাবে ধর্ষণ করতে করতে মেরে ফেলে দিলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পরিষ্কার করার জন্য আর কেউ থাকবে না একথা ভেবে ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে এক পাঞ্জাবী ধমক দিয়ে বলতে থাকে, 'ঠিক হায়, তোমকো ছোড় দিয়া যায়েগা জারা বাদ, তোম বাহার নাহি নেকলেগা, হারওয়াকত লাইন পার হাজির রাহেগা।' এ কথা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

পাঞ্জাবী সেনারা রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙ্গালী যুবতী মেয়ে, রূপসী মহিলা এবং সুন্দরী বালিকাদের জীপে, মিলিটারি ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। আমি ক্যান্টিনের ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম দেখলাম আমার সম্মুখ দিয়ে জীপ থেকে আর্মি ট্রাক থেকে লাইন করে বহু বালিকা যুবতী ও মহিলাকে এস,এফ ক্যান্টিনের মধ্য দিয়ে ব্যারাকে রাখা হল। বহু মেয়েকে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর উপর তালায় রুমে নিয়ে যাওয়া হল, আর অবশিষ্ট মেয়ে যাদেরকে ব্যারাকের ভিতর জায়গা দেওয়া গেল না তাঁদের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অধিকাংশ মেয়ের হাতে বই ও খাতা দেখলাম, অনেক রূপসী যুবতীর দেহে অলংকার দেখলাম, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ের চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু পড়ছিল। এরপরই আরম্ভ হয়ে গেল সেই বাঙ্গালী নারীদের উপর বীভৎস ধর্ষণ। লাইন থেকে পাঞ্জাবী সেনারা কুকুরের মত জিভ চাটতে চাটতে ব্যারাকের মধ্যে উম্মত্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে প্রবেশ করতে লাগল। ওরা ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল। কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নিরীহ বালিকাদের উপর ধর্ষণে লেগে গেল, আমি ব্যারাকে ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করছিলাম আর ওদের বীভৎস পৈশাচিকতা দেখছিলাম। ওদের উম্মত্ত উল্লাসের সামনে কোন মেয়ে কোন শব্দ পর্যন্তও করে নাই, করতে পারে নাই। উম্মত্ত পাঞ্জাবী সেনারা এই নিরীহ বাঙ্গালী মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই- আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, ওদের উদ্ধত ও উম্মত্ত কামড়ে অনেক কচি মেয়ের স্তনসহ বক্ষের মাংস উঠে আসছিল, মেয়েদের গাল, পেট, ঘাড়, বক্ষ, পিঠের ও কোমরের অংশ ওদের অবিরাম দংশনে রক্তাক্ত হয়ে গেল। যে সকল বাঙ্গালী যুবতী ওদের প্রমত্ত পাশবিকতার শিকার হতে অস্বীকার করলো দেখলাম তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবী সেনারা ওর্দেরকে চুল ধরে টেনে এনে স্তন ছোঁ মেরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে বন্দুকের নল, বেয়নেট ও ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বীরাঙ্গনাদের পবিত্র দেহ ছিন্নভিন্ন

করে দিচ্ছিল। অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দু'জন দু-পা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল, আমি দেখলাম সেখানে বসে বসে, আর ড্রেন পরিষ্কার করছিলাম, পাঞ্জাবীরা শ্মশানের লাশ যে কোন কুকুরের মত মদ খেয়ে সব সময় সেখানকার যার যে মেয়ে ইচ্ছা তাকেই ধর্ষণ করছিল। শুধু সাধারণ পাঞ্জাবী সেনারাই এই বীভৎস পাশবিক অত্যাচারে যোগ দেয় নাই, সকল উচ্চপদস্থ পাঞ্জাবী অফিসাররাই মদ খেয়ে হিংস্র বাঘের মত হয়ে দুই হাত বাঘের মত নাচাতে নাচাতে সেই উলঙ্গ বালিকা, যুবতী ও বাঙ্গালী মহিলাদের উপর সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ কাজে লিপ্ত থাকতো। কোন মেয়ে, মহিলা, যুবতীকে এক মুহূর্তের জন্য অবসর দেওয়া হয় নাই, ওদের উপর্যুপরি ধর্ষণ ও অবিরাম অত্যাচারে বহু কচি বালিকা সেখানেই রক্তাক্ত দেহে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, পরের দিন এ সকল মেয়ের লাশ অন্যান্য মেয়েদের সম্মুখে ছুরি দিয়ে কেটে কুঁচি কুঁচি করে বস্তার মধ্যে ভরে বাইরে ফেলে দিত। এ সকল মহিলা, বালিকা ও যুবতীদের নির্মম পরিণতি দেখে অন্যান্য মেয়েরা আরও ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো এবং স্বেচ্ছায় পশুদের ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতো। যে সকল মেয়ে প্রাণে বাঁচার জন্য ওদের সাথে মিল দিয়ে ওদের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগীতা করে তাঁদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁদের হাসি তামাশায় দেহদান করেছে তাদেরকেও ছাড়া হয় নাই। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের উপর সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করত।

এরপর উলঙ্গ মেয়েদেরকে গরুর মত লাথি মারতে মারতে পশুর মত পিটাতে পিটাতে উপরে হেডকোয়ার্টারে দোতলা, তেতলা ও চার তলায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পাঞ্জাবী সেনারা চলে যাওয়ার সময় মেয়েদেরকে লাথি মেরে আবার কামরার ভিতর ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে চলে যেত। ইহার পর বহু যুবতী মেয়েকে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দার মোটা লোহার তারের উপর চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। প্রতিদিন পাঞ্জাবীরা সেখানে যাতায়াত করতো সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ যুবতীদের কেউ এসে তাঁদের উলঙ্গ দেহের কোমরের মাংস বেট দিয়ে উন্মত্তভাবে আঘাত করতে থাকতো, কেউ তাঁদের বক্ষের স্তন কেটে নিয়ে যেত, কেউ হাসতে হাসতে তাঁদের যোনিপথে লাঠি ঢুকিয়ে আনন্দ করত, কেউ উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে উন্মুক্তবক্ষ মেয়েদের স্তন মুখ লাগিয়ে ধারাল দাঁত দিয়ে স্তনের মাংস তুলে নিয়ে আনন্দে অট্টহাসি করতো। কোন মেয়ে এসব অত্যাচারে কোন প্রকার চিৎকার করার চেষ্টা করলে তার যোনিপথ দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হত। প্রতিটি মেয়ের হাত বাঁধা ছিল পিছনের দিকে শুন্যে ঝুলিয়ে রাখা

হয়েছিল। অনেক সময় পাঞ্জাবী সেনারা সেখানে এসে সেই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েদের এলোপাথাড়ি বেদম প্রহার করে যেত। প্রতিদিন এভাবে বিরামহীন প্রহারে মেয়েদের দেহের মাংস ফেটে রক্ত ঝরছিল, মেয়েদের কারো মুখের সম্মুখের দাঁত ছিল না, ঠোঁটের দুদিকের মাংস কামড়ে, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, লাঠি ও লোহার রডের অবিরাম পিটুনিতে প্রতিটি মেয়ের আঙ্গুল, হাতের তালু ভেঙ্গে, থেঁতলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এসব অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মহিলা ও মেয়েদের প্রসাব ও পায়খানা করার জন্য হাতের ও চুলের বাঁধন খুলে দেওয়া হতো না এক মুহূর্তের জন্য। হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় বারান্দায় এই ঝুলন্ত উলঙ্গ মেয়েরা হাত বাঁধা অবস্থায় লোহার তারে ঝুলে থেকে সেখানে প্রসাব পায়খানা করত- আমি প্রতিদিন সেখানে গিয়ে এসব প্রসাব- পায়খানা পরিষ্কার করতাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক মেয়ে অবিরাম ধর্ষণের ফলে নির্মমভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই বাঁধন থেকে অনেক বাঙ্গালী যুবতীর বীভৎস মৃতদেহ পাঞ্জাবী সেনাদের নামাতে দেখেছি। আমি দিনের বেলাও সেখানে সকল বন্দী মহিলাদের পুতগন্ধ, প্রসাব- পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য সারাদিন উপস্থিত থাকতাম। প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসের উপর তলা হতে বহু ধর্ষিতা মেয়ের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেঁধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন নতুন মেয়েদের চুলের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। এসব উলঙ্গ নিরীহ বাঙ্গালী যুবতীদের সারাক্ষন পাঞ্জাবী সেনারা প্রহরা দিত। কোন বাঙ্গালীকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আর আমি ছাড়া অন্য কোন সুইপারকেও সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না।

মেয়েদের হাজারো কাতর আহাজারিতেও আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী মেয়েদের বাঁচাবার জন্য কোন ভূমিকা পালন করতে পারি নাই। এপ্রিল মাসের দিকে আমি অন্ধকার পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে খুব ভোরে হেডকোয়ার্টারের উপর তলায় সারারাত ঝুলন্ত মেয়েদের মলমুত্র পরিষ্কার করছিলাম। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরীর ১৩৯ নং বাসার রানু নামে এক কলেজের ছাত্রীর কাতর প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ি এবং মেথরের কাপড় পরিয়ে কলেজ ছাত্রী রানুকে মুক্ত করে পুলিশ লাইনের বাইরে নিরাপদে দিয়ে আসি। স্বাধীন হওয়ার পর সেই মেয়েকে আর দেখি নাই। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাবী সেনারা এসকল নিরীহ বাঙ্গালী মহিলা, যুবতী ও বালিকাদের উপর এভাবে নির্মম-পাশবিক অত্যাচার ও বীভৎসভাবে ধর্ষণ করে যাচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে মিত্রবাহিনী ঢাকায় বোমাবর্ষণের সাথে সাথে পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের চোখের সামনে মেয়েদের নির্মমভাবে বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করে। রাজারবাগ হেডকোয়ার্টার

অফিসের উপর তলায়, সমস্ত কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও ব্যালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল। ডিসেম্বরের মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী রাজধানীতে বীর বিক্রমে প্রবেশ করলে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সকল পাঞ্জাবী সেনা আত্মসমর্পণ করে।

এই বিবরণ পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৮ম খণ্ডে

বীরাঙ্গনা তারা ব্যানার্জির বর্ণনায় সেই দিনগুলোর কথা :

"২৭ শে মার্চ অন্ধকার থাকতেই আমরা গ্রামের বাড়ীতে রওয়ানা হলাম সামান্য হাতব্যাগ নিয়ে। গাড়ি, রিকশা কিছুই চলছে না। হঠাৎ স্থানীয় চেয়ারম্যানের জীপ এসে থামল আমাদের সামনে। বাবাকে সম্বোধন করে বললেন, ডাক্তারবাবু আসেন আমার সঙ্গে। কোথায় যাবেন নামিয়ে দিয়ে যাবো। বাবা আপত্তি করায় চার পাচজনে আমাকে টেনে জীপে তুলে নিয়ে গেল। কোন গোলাগুলির শব্দ শুনলাম না। বাবা মা কে ধরে নিয়ে গেল নাকি মেরে ফেললো বলতে পারবো না। গাড়ি আমাকে নিয়ে ছুটল কোথায় জানি না। কিছুক্ষন হয়ত জ্ঞান হারিয়ে ছিল আমার। সচেতন হয়ে উঠে বসতেই বুঝলাম এটা থানা, সামনে বসা আর্মি অফিসার।

অফিসারটি আমাকে নিয়ে জীপে উঠলো। কিছুদুর যাবার পর সে গল্প জুড়লো অর্থাৎ কৃতিত্বের কথা আমাকে শোনাতে লাগলো। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। হঠাৎ ঐ চলন্ত জীপ থেকে আমি লাফ দিলাম। ড্রাইভিং সিটে ছিল অফিসার, আমার পেছনে, পেছনে দু'জন জোয়ান। আমার সম্ভবত হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়ে গিয়েছিল। যখন জ্ঞান হলো দেখি মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, আমি হাসপাতালের বিছানায়। ছোট্ট হাসপাতাল। যত্নই পেলাম, সব পুরুষ। একজন গ্রামের মেয়েকে ধরে এনেছে আমার নেহায়েত প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য। মেয়েটি গুন গুন করে কেঁদে চলেছে। সন্ধ্যায় অফিসারটি চলে গেল। যাবার সময় আমাকে হানি, ডার্লিং ইত্যাদি বলে খোদা হাফেজ করল। দিন তিনেক শুয়ে থাকার পর উঠে বসলাম। সুস্থ হয়েছি এবার। আমাদের ভেতর সংস্কার আছে পাঁঠা বা মহিষের খুঁত থাকলে তাকে দেবতার সামনে বলি দেওয়া যায় না। আমি এখন বলির উপযোগী।

প্রথম আমার উপর পাশবিক নির্যাতন করে একজন বাঙালি। আমি বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। অসুস্থ দেহে যুদ্ধ করতে পারলাম না। লালাসিক্ত পশুর শিকার হলাম। ওই রাতে কতজন আমার উপর অত্যাচার করেছিল বলতে পারবো না, তবে ছ'সাত জনের মতো হবে। সকালে অফিসারটি এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখলো তারপর চরম উত্তেজনা, কিছু মারধরও হলো। তারপর আমাকে তার জীপে তুলে নিল, আমি তৃতীয় গন্তব্যে পৌঁছোলাম..."

বীরাঙ্গনা তারা ব্যানার্জির এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে।

১৯৭১ এ পরিবারের সবাইকে হারানো কিশোর শফিকুরের আর্তি :

"ঘরে ঢুকে দেখি, একি দৃশ্য। ও আল্লাহ, এমন দৃশ্য দেখার আগে কেনো আমার দুটি চোখ অন্ধ করলে না আল্লাহ। মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ। কয়েকটি পাগলা কুত্তা আমার মাকে ও বড় বোনটিকে খাচ্ছে কামড়ে কামড়ে। এক পলক তাকানোর পর আর তাকাতেই পারছি না। তখন গায়ের জোরে একটা চিৎকার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত মুখ বেঁধে ঘরের এক কোনায় ফেলে রাখলো। তারপর ঠিক আমার পায়ের কাছে মাকে এনে শুইয়ে দিয়ে একেবারে উলঙ্গ করে ফেলে। তারপর আর বলতে পারছি না। এসব দৃশ্য আমাকে দেখতে হচ্ছে। আমি যখনই চোখ বন্ধ করে রাখতাম, তখনই তাদের হাতের ধারালো একটি অস্ত্র দিয়ে চোখের চারপাশে কেটে দিত। এভাবেই চলল মায়ের ওপর সারারাত নির্যাতন। আর কিশোর হয়ে আমাকে তা দেখতে হয়েছে। রাত ভোর হয় হয়– এমন সময় তারা চলে গেছে, মা ততক্ষণে মৃত। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল আমার অর্ধ মৃত রক্তাক্ত বোনটিকেও"

পাবনার মোসাম্মৎ এসবাহাতুন বলেন :

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাক বাহিনী আমার বাবার বাড়ী নতুন ভাঙ্গাবারীতে প্রায় ৫০ জন অপারেশনে যায়। কিছু সময় পরে আমাদের বাড়ীর মধ্যে দু'জন পাক সেনা ঢুকে পড়ে। তারা ঢুকে পড়ার সাথে সাথে অন্যান্য যে মেয়েরা ছিলো তারা মিলিটারি দেখে দৌড়াদৌড়ি করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমার কোলে বাচ্চা থাকার জন্য আমি বেরুতে পারি না। পাক সেনারা দু'জন আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। আমার বাবা ও ভাই এসে বাঁধা দিতে চাইলে একজন পাক সেনা তাঁদের বুকে রাইফেল ধরে রাখে আর একজন আমাকে ঘরের মধ্যে ধরে ফেলে আমার নিকট হতে আমার পাঁচ মাসের বাচ্চা ছিনিয়ে বিছানার উপর ফেলে দিয়ে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আমার শিশু সন্তান কাঁদতে থাকে। তারপর সে আমার বাবা ও ভাই এর বুকে রাইফেল ধরে রাখে অন্যজন এসে আবার পাশবিক অত্যাচার শুরু করে। দু'জন মিলে প্রায় এক ঘণ্টা আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তারপর চলে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। তার আধ ঘণ্টা পর আমার জ্ঞান ফিরে পাই।

বীরাঙ্গনা মোসাম্মৎ রাহিমা খাতুন এর বর্ণনা :

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে একদিন ভোর রাত্রি আমি আমার স্বামীর সাথে ঘুমিয়ে আছি সাথে আমার সাত মাসের শিশু সন্তান, মিলিটারি আসার শব্দ পেয়ে আমার স্বামী পালিয়ে যায়। হঠাৎ প্রায় সাত জন মিলিটারি বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং ঘরের দরজায় লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে এবং আমার শিশু সন্তানকে আমার নিকট থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে মাটির সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করে। তারপর আমাকে এক এক করে ৭ জন পাক সেনা পাশবিক অত্যাচার করে। প্রায় ঘণ্টা

আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার আধ ঘণ্টা পর আমি জ্ঞান ফিরে শুনতে পাই যে আমার তিনজন লোককে পাক সেনারা জোর করে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আর তাঁদের খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। একই দিনে ঐ গ্রামের প্রায় ১০/১২ জন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং প্রায় ৭ জন মহিলাকে তাঁদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন চিকিৎসা হবার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি।

হাতীবান্ধা, লালমনিরহাটের বীরাঙ্গনা খতিনার মৌখিক বয়ান :

"কুত্তাগুলো আইসাই ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে ডাক দিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। আমি তো ঘরে ঢুকি না। তখন ভয় দেখায় মাইরা ফেলবে। আমি আস্তে আস্তে দরজার কাছে যেতেই ছুঁ মাইরা ঘরে নিয়া যায়। কোলের বাচ্চাটাকে একজন ফেলে দেয়। আরেকজন কাপড়-চোপড় ধইরা টানাটানি শুরু করে। আমি চিল্লান দিতে চাইছি তখন আমার মুখ চেপে ধরে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে শুরু করে ধর্ষণ। অন্যজন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। এভাবেই তারা আমার উপর নির্যাতন করে। এক ফাঁকে আমি অতিকষ্টে চিল্লাচিল্লি শুরু করি। তখন আমার আব্বা আসছিলেন। পায়খানায় গিয়েছিলেন, সেইখান থেকে। আব্বা যখন আমার দিকে আসছে, তখন আব্বার মাথায় বন্দুক ধরে আর বলে নড়লে গুলি করে দিব। আমাকেও বলে, যদি কোন শব্দ করি তবে গুলি করে দিবে। আমার ভাই পশ্চিম ঘর থেকে বাইরে দৌড় দিচ্ছে তখন তারা অন্য ঘরে ঢুকে। দুই জন তো আগে থেকেই ছিল ঐ ঘরে। এই ফাঁকে আমি পালাই। পাটক্ষেতে, নির্যাতনের পরে। পালাবার সময় আমার পরনের কাপড়টা তুলে নিয়া যাই।

সকালে নাস্তা খাইয়া, গুছায়া-টুছায়া ঘরে যাব। স্বামীও চলে গেছে কাজে। তখন তারা আসে। যখন নির্যাতন করে তখন কেউ ছিল না। আর থাকলেই বা কি করার ছিল? না কিছুই করতে পারতো না। ছোট বাচ্চাটাতো কোলেই ছিল। আর বড় বাচ্চাটা মোহাম্মদ আলীর বয়স তখন ৭/৮ বছর হবে। আলী ভয়ে ঘরে চৌকির তলে ঢুকে ছিল। নির্যাতনের পর ঘরের সব জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলেছিল। মনে হয় কিছু তল্লাশি করছিল। ছোট বাচ্চাটা সেই থেকে অসুখে ভুগতে ভুগতে শেষ হইয়া যাবার ধরছে। বহু টাকা খরচ করে ভালো করছি। আর আমার পেটে যে আর একটা বাচ্চা ছিল সাত মাসের, এই নির্যাতনের দুই দিন পরে পেটেই বাচ্চাটা মারা যায়। সেটাও ছেলে ছিল। শুধু নির্যাতন করে নাই ছুরি চাকু দিয়েও মারছিল। অনেক মার মারছে। তার ওপর আবার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমাকে নির্যাতন করে।"

হাতীবান্ধার একজন বিরঙ্গনা কমলার বর্ণনা :

"আমার তখন একেবারে কাঁচা নাড়, ৩ দিন বয়স মেয়েটার। তখন আমার ওপর চলে এই অত্যাচার। আমি বসে বসে বাচ্চার তেনা ধুইতেছিলাম কলের পাড়।

এইখানে ফালাইয়া আমার ইজ্জত মারে ঐসব জানোয়ার। মানুষ তো ছিল না। দেখতে যেমন শয়তানের মতো লাগছে, পরছিল কেমন পোশাক জানি। কাজগুলোও করছে শয়তান-জানোয়ারের মত। কোন মানুষের পক্ষে এই সময় এই কাজ করা সম্ভব নয়। আমি তো বসে বসে তেনা ধুইতেছি। হঠাৎ দেখি, হারামজাদা কুত্তাগুলো লাফাইয়া লাফাইয়া এসে আমার উপর পড়ছে। প্রথমে আমি তো ভয়ে চিল্লাচিল্লি শুরু করি। তারপর শুরু করে। আমি কিছু বলার, কওয়ার সুযোগ পাই নাই। আমার চিল্লাচিল্লিতে তখন অনেক লোক জড়ো হইছে ঠিকই। কিন্তু সবাই খাড়াইয়া খাড়াইয়া তামাশা দেখছে। কেউ আসেনি এগিয়ে হামারে সাহায্য করতে। এক সময় আমি মরার মতো অজ্ঞান হয়ে যাই। কতজন, কতক্ষণ তারা এইসব করছে আমি জানি না, আমার যহন জ্ঞান আইছে তখন দেহি, আমি ঘরে, আমার স্বামী আছে পাশে বসা। যখন এই ঘটনা ঘটায় তখন আমার স্বামী বাড়ী ছিল না, বাজারে গেছিল। কে বা কারা আমারে ঘরে আনছে, তারে খবর দিছে কিছুই কইতে পারি না। পরে ডাক্তার আইনা চিকিৎসা করিয়ে বহুদিন পরে হামারে সুস্থ করে। পরে শুনছি লোকমুখে তারা নাকি ৪/৫ জন ছিল। সবাই নাকি এই কাজ করেছে। আর বাইরে পাহারা দিতেছিল কয়েকজন। পরে কোন দিক দিয়ে কখন যায়, কিছু আমি জানি না। একে তো আঁতুর ঘরে কাঁচা নাড় তার ওপর আবার শত শত লোকের সামনে এই কর্মকাণ্ড করেছে। শরীরের অবস্থা কি, মনের অবস্থা কি, ঘর থেকে আর বাইরে বের হবার মতো পরিবেশ রাখেনি। এক দিক দিয়ে লজ্জা, অন্য দিক দিয়ে শরীর, কোনটাই ভালো না।"

নরসিংদীর জাহেদা খাতুন :

"আমাকে যে কোথায় কোন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল তা বলতে পারিনি। পরে শুনেছি এটা ঢাকা জেলার গাজীপুর। এখন গাজীপুর একটা জেলা হয়েছে আর তেমন কিছু বলতে পারি না। কারণ, কেউ তো আর কারো সাথে কথা বলতে পারতাম না। যে দুই একটা কথা হতো খুব গোপনে। ঐসব দেখতে দেখতে এবং নিজেও নির্যাতন সইতে সইতে মনে হচ্ছিল, যদি দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে যেত তবুও কিছুটা রক্ষা ছিল। একদিন একজন এসে আমার কাছে দাঁড়াল। একজন তার পুরুষাঙ্গটা দেখিয়ে বলল, যদি তোর স্বামীকে বাঁচাতে চাস তবে কোন শব্দ ছাড়াই আমার এটাকে খুশি করিয়ে দে– এটা শান্ত তো সব ঠিক, এই বলেই শুরু করল। তারপর থেকে দিনরাত ঐ শয়তানগুলো আসতো আমার কাছে। এরই মাঝে একদিন চার কি পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গেছে। রাতে শুনতে পেলাম তাদেরকে মেরে ফেলেছে।"

গাজীপুরের পরী, তার বর্ণনা থেকেও উঠে আসে অনেক অজানা তথ্য :

গাড়িতে ওঠানোর পরই চোখ বেঁধে ফেলল। অনেকক্ষণ যাবার পরে একটি ক্যাম্পে নিয়ে চোখ খুলল। চোখ খোলার পরে দেখি এখানে আরো অনেক মেয়ে,

সবাই চুপ করে আছে। আমি কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু অন্যরা ইশারায় না করল। কিছুক্ষণ পর আমি কান্না শুরু করি। তখন পাশ দিয়ে একজন যাচ্ছিল। সে এসেই কোন কথা না বলে আমাকে লাথি মারল এবং আমার গায়ের উপর প্রস্রাব করে দিল। এটা চলে যাওয়ার পর আমি বকাবকি শুরু করলাম। অন্যরা কিছুই বলে না। শুধু ইশারায় এটা সেটা বোঝাতে চেষ্টা করে। বিকাল হতে না হতেই বুট জুতা পরা কয়েকজন এল। আসার পথে যেসব মেয়ে পড়ছে, তাদেরকে লাথি, কিল, ঘুষি মারছে। এগুলো দেখেই আমি চুপ, একেবারে চুপ। দুই তিনজন এসে আমার ওপর নির্যাতন শুরু করল। তারা আমাকে নিয়ে আনন্দ শুরু করল, এমনভাবে আনন্দ করছে, যেন তাদের কাছে মনে হচ্ছে আমি একটা মরা গরু আর ঐগুলো শকুন। আমার সারা শরীরটাকে টেনে কামড়ে যা খুশি তাই করছে। এক সময় আমি যখন আর সহ্য করতে পারছি না তখন একটু একটু কষ্টের শব্দ করছি।

তখন অন্য একজন ইশারা দিল চুপ করতে। কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম, কিন্তু আর পারছি না। নিজের অজান্তেই চিৎকার আইসা গেল, চিৎকারের সঙ্গে শুরু করল মাইর কারে কয়। একজন আইসা আমার মুখের মধ্যে প্রস্রাব করে দিল। এদের ইচ্ছামতো নির্যাতন করল এবং মারল। যাবার সময় আবার হাত বেঁধে রাইখা গেল। কিছুক্ষণ পর একসাথে আসলো অনেকজন। গণহারে নির্যাতন শুরু করল। কারো মুখে কোন কথা নাই। মাঝে মাঝে শুধু একটু শব্দ আসে কষ্টের। একজন সিগারেট খাচ্ছে আর তার পাশে যে ছিল তার গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট ধরে রাখছে, অন্য একজন ধর্ষণ করছে। আরেকজন শকুনের মতো তার শরীর খাচ্ছে। ওর অবস্থা দেখে নিজের সব ভুলে গেলাম। কি বিশ্রীভাবে যে ধর্ষণ করছে মোটকথা তারা আমাদেরকে মানুষ বলেই মনে করছে না। এক সময় তারা চলে গেল। একটু-আধটু কথা বলছে সবাই। কিছুক্ষণ পর সবাই চুপ। কিছুক্ষণ পর একজন এল এবং অন্য একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর দু'জন তাকে নিয়ে এল। এসেই তার সব কাপড় খুলল এবং গরম লোহা দিয়ে তার সমস্ত শরীরে ছ্যাঁকা দিল, শেষে তার গোপন অঙ্গের ভিতরে বন্দুকের নল ঢুকাইয়া গুলি করে মেরে ফেলল। যখন বন্দুকের নল ঢুকাচ্ছে তখন সে একটা চিৎকার দিয়েছিল। মনে হয়, পৃথিবীর সব কিছুই তখন থমকে গেছে। তারপর তাকে নিয়ে গেল। দুই একদিন পরে জানতে পারলাম, তারা ভুল করে ঐ মেয়েকে নিয়েছিলো। তারা আমাকে নিতে এসেছিলো।

দুলজান, কুষ্টিয়া :

যেদিন আমার এই দুর্ঘটনা ঘটে আমার বাচ্চাটার বয়স ছিল মাত্র সাত দিন। চুল কামিয়ে আঁতুর ঘরে ধোয়া পরিষ্কার করেছি। একেবারে কাঁচা নাড়, তার উপর এত অত্যাচার। জ্ঞান ছিল না। গলগল করে রক্ত বইতে লাগল। সবার অবস্থা খারাপ, কিন্তু আমার অবস্থা খুব বেশি খারাপ, এই দেখেন, আমার এ বুকের মাঝে বেয়নেট

দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কী করেছে। এখনো দাগ আছে। এই দুধটা আর কোনদিন কোনো বাচ্চাদের খাওয়াতে পারিনি।

অনেক সময় ধর্ষণের প্রতিযোগিতা শুরু হত। বাজি ধরে, পালা দিয়ে ধর্ষণ করা হত।

এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল জামালপুরের রেশমীর :

আমাদের এখানে একজন বিহারী ছিল, সবাই তাকে করিম পাগলা বলেই জানত। আর সেই করিম পাগলা মান ইজ্জত মারার এক্সপার্ট ছিল। যখন করিম পাগলা যেদিক দিয়ে হেঁটে যেত আমার মনে হয়, তখন মাটিও ভয় পেত। কি ক্ষমতা যে ছিল তার এই মান ইজ্জত মারার! দিনে একই সঙ্গে কয়েক জন মহিলার মান-ইজ্জত মারতে পারত। আর যে একবার ঐ করিম পাগলার হাতে পড়েছে, তার আর রক্ষা ছিল না। এত শক্তি ছিল তার, আর কৌশলও জানত জানার মতো কৌশল। তার মান ইজ্জত মারার কৌশল দেখে অন্য মিলিটারিরাও বোকা হয়ে যেত। করিম পাগলা এসব যখন করতো তখন অন্যরা দাঁড়িয়ে দেখত আর সঙ্গে সঙ্গে তারাও উল্লাস করতো, শাবাস দিত। আর কি বিশ্রিভাবে হা হা করে হাসত। করিম পাগলা যখন ইজ্জত মারার কাজে ব্যস্ত থাকত, তখন অন্য কেউ এসে তার গালে মদ ঢেলে দিত। কতজনই না তার সাথে বাজি ধরত, কিন্তু কেউ তাকে হারাতে পারেনি। মাঝে মাঝে পাগলা বলত, তোরা দশ জন একটার পর একটা করবি, আর আমি একাই করতে থাকব। দেখব কে হারে, কে জিতে? তারপরও তাকে কেউ হারাতে পারেনি। সেই পাগলা ছিল এমন। সে প্রতিদিন কত নারীর ইজ্জত যে মারত তার কোন হিসাব ছিল না মনে হয়।

কিরণবালা; ভালুকা, ময়মনসিংহ :

"আমার পাশেই একটা মাইয়া ছিলো। দেখতে যেমন সুন্দর, বয়সটাও ছিল ঠিক। আর তারেই সবাই পছন্দ করত বেশি। তাই তার কষ্টও হইত বেশি বেশি। একদিন দুই তিনজন একলগে আহে। এরপর সবাই তারে চায়। এই নিয়া লাগে তারা তারা। পরে সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপায় পড়ে ঐ মাইয়াডার উপর। কে কি যে করবে, তারা নিজেরাই দিশা পায়না। পরে একজন একজন কইরা কষ্ট দেয়া শুরু করে। তখন সে আর সইতে না পাইরা একজনরে লাথি মাইরা ফেলাইয়া দেয়। তারপর তো তারে বাঁচায় কেডা। হেইডারে ইচ্ছামত কষ্ট দিয়ে মাইরা ঘর থাইকা বের হয়ে যায়। আমরা তো ভাবছি, যাক বাঁচা গেল। কিন্তু না, একটু পরে হে আবার আহে, আইসাই বুটজুতা দিয়ে ইচ্ছামতো লাইত্থাইছে। তারপরে গরম বইদা (ডিম) সিদ্ধ করে তার অঙ্গে ঢুকায় দেয়। তখন তার কান্না, চিল্লাচিল্লি দেখে কেডা। মনে হইছিল যে, তার কান্নায় দেয়াল পর্যন্ত ফাইটা যাইতেছে। তারপরেও তার একটু মায়া দয়া হলো না। এক এক করে তিনটা বইদা ঢুকাল ভিতরে। কতক্ষণ চিল্লাচিল্লি কইরা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

তার পরের দিন আবার হেইডা আহে। আর কয় চুপ থাকবে। চিল্লাচিল্লি করলে বেশি শাস্তি দিব। সেই মেয়ের কাছে গিয়ে দেখে তার অবস্থা খুব খারাপ। তখন বন্দুকের মাথা দিয়ে তার ভেতরে গুতাগুতি করছে। আরেকজন তার পেটের উপর খাড়াইয়া বইছে। আর গড় গড়াইয়া রক্ত বাইর হইতেছে। যেন মনে হয়, গরু জবাই দিছে। সে শুধু পড়েই রইল। প্রথমে একটু নড়ছিলো পরে আর নড়ল না। তারপরেও তার মরণ হইল না। ভগবান তারে দেখল না। এমন কত রকম নির্যাতন করে প্রতিদিন। এই অবস্থায় বাইচা ছিল সাত-আট দিন। পরের দুই দিন চেতনা ছিল না। এক সময় অবশেষে মরল।"

সুজান ব্রাউনমিলার লিখেছেন তের বছরের কিশোরী খাদিজার কথা :

Khadija, thirteen years old, was walking to school with four other girls when they were kidnapped by a gang of Pakistani soldiers. All five were put in a military brothel in Mohammadpur and held captive for six months until the end of the war. Khadija was regularly abused by two men a day; others she said, had to service seven to ten men daily... At first, Khadija said, the soldiers tied a gag around her mouth to keep her from screaming. As the months wore on and the captives' spirit was broken, the soldiers devised a simple quid pro quo. They withheld the daily ration of food until the girls had submitted to the full quota.

পরদেশী ডোম :

২৭ মার্চ, ১৯৭১, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশ ঘর থেকে লাশ ট্রাকে তুলতে গিয়ে একটি চাদর ঢাকা ষোড়শী মেয়ের লাশ দেখতে পান ডোম পরদেশী। সম্পূর্ণ উলঙ্গ লাশটির বুক এবং যোনিপথ ছিল ক্ষতবিক্ষত, নিতম্ব থেকে টুকরো টুকরো মাংস কেটে নেয়া হয়েছিল। ২৯ মার্চ শাঁখারিবাজারে লাশ তুলতে গিয়ে পরদেশী সেখানকার প্রায় প্রতিটি ঘরে নারী, পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতার লাশ দেখতে পান, লাশগুলি পচা এবং বিকৃত ছিল। বেশিরভাগ মেয়ের লাশ ছিল উলঙ্গ, কয়েকটি যুবতীর বুক থেকে স্তন খামচে, খুবলে তুলে নেয়া হয়েছে, কয়েকটি লাশের যোনিপথে লাঠি ঢোকানো ছিলো। মিল ব্যারাকের ঘাটে ৬ জন মেয়ের লাশ পান তিনি, এদের প্রত্যেকের চোখ, হাত, পা শক্ত করে বাঁধা ছিল, যোনিপথ রক্তাক্ত এবং শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা ছিলো।

সুইপার সাহেব আলী :

ঢাকা পৌরসভার সুইপার সাহেব আলী ২৯ মার্চ তার দল নিয়ে একমাত্র মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে কয়েক ট্রাক লাশ উদ্ধার করেন। তিনি আরমানিটোলার এক বাড়িতে দশ এগারো বছরের একটি মেয়ের লাশ দেখতে পান, সমস্ত শরীর

ক্ষতবিক্ষত, জমাট বাঁধা ছোপ ছোপ রক্ত সারা গায়ে এবং তার দেহের বিভিন্ন স্থানের মাংস তুলে ফেলা হয়েছিল। ধর্ষণ শেষে মেয়েটির দুই পা দু'দিক থেকে টেনে ধরে নাভি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। ৩০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের চারতলার ছাদের উপরে আনুমানিক ১৮ বছরের একটি মেয়ের লাশ পান সাহেব আলী, যথারীতি উলঙ্গ। পাশে দাঁড়ানো একজন পাক সেনার কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন মেয়েটিকে হত্যা করতে ধর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু করার দরকার পড়েনি, পর্যায়ক্রমিক ধর্ষণের ফলেই তার মৃত্যু ঘটে। মেয়েটির চোখ ফোলা ছিল, যৌনাঙ্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী অংশ ফুলে পেটের অনেক উপরে চলে এসেছে, যোনিপথ রক্তাক্ত, দুই গালে এবং বুকে কামড়ের স্পষ্ট ছাপ ছিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সুজিত সরকার ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র। ক্যাম্পে বন্দী থাকার সময় দেখেছেন অনেক মেয়েকে অসুস্থ হয়ে যেতে। তাদের শরীরে দগদগে ঘা হয়ে যাচ্ছিল, যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হত, তারপরও রেহাই পেতেন না তারা। দুই একজন উন্মাদ হয়ে প্রলাপ বকতেন। একদিন রাজাকারেরা ধর্ষণের সময় সুজিত সরকারকেও ধর্ষণে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তারা মেয়েদের যৌনাঙ্গে তার মুখ চেপে ধরে ঘষে দেয়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের একজন সুবেদার খলিলুর রহমানের অভিজ্ঞতা :

মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে, ট্রাক থেকে নামিয়ে সাথেই সাথেই শুরু হত ধর্ষণ, দেহের পোশাক খুলে ফেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ধর্ষণ করা হত। সারাদিন ধর্ষণের পরে এই মেয়েদের হেড কোয়ার্টার বিল্ডিং এ উলঙ্গ অবস্থায় রডের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং রাতের বেলা আবারো চলত নির্যাতন। প্রতিবাদ করা মাত্রই হত্যা করা হতো, চিত করে শুইয়ে রড, লাঠি, রাইফেলের নল, বেয়নেট ঢুকিয়ে দেয়া হত যোনিপথে, কেটে নেয়া হত স্তন। অবিরাম ধর্ষণের ফলে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলেও থামত না ধর্ষণ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত কিছু তথ্য :

'৭১ এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে পাকবাহিনীর একটি বিরাট ক্যাম্পে পরিণত করা হয়। এখানে বন্দী ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মঞ্জিলা এবং তার দুই বোন মেহের বানু এবং দিলরুবা। তাদেরকে আরো ৩০ জন মেয়ের সাথে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়, সার্বক্ষণিক প্রহরায় থাকতো দুজন সশস্ত্র গার্ড। এই মেয়েগুলোকে ওই ক্যাম্পের সামরিক অফিসারদের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করা হত। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ে যাওয়া হত ৫/৬ জন মেয়েকে এবং ভোরবেলা ফিরিয়ে দেয়া হত অর্ধমৃত অবস্থায়। প্রতিবাদ করলেই প্রহার করা হত কায়দায়। একবার একটি মেয়ে একজন সৈনিকের হাতে আঁচড়ে দিলে তখনই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই বন্দীশালায় খাবার হিসাবে দেয়া হত ভাত এবং লবন।

সাংবাদিক রণেশ মৈত্রের একটি অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এবং রংপুর আর্টস কাউন্সিল ভবনটি নারী নির্যাতনের জন্য ব্যবহার করা হত। এখানে বন্দী ছিল প্রায় একশ মেয়ে এবং প্রতিদিনই চলত নির্যাতন, যারা অসুস্থ হয়ে পড়ত তাদের হত্যা করা হত সাথে সাথেই। স্বাধীনতার পরে আর্টস কাউন্সিল হলের পাশ থেকে বহুসংখ্যক মহিলার শাড়ি, ব্লাউজ, অর্ধগলিত লাশ এবং কংকাল পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, রংপুর থেকে প্রায় তিনশ/চারশ মেয়েকে ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে পাচার করে দেওয়া হয়, তাদের আর কোন সন্ধান মেলেনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গবেষণায় জানা যায় রাজশাহীর জুগিসশো গ্রামে মে মাসের কোন একদিন পাকবাহিনী ১৫ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং অন্যান্য নির্যাতন চালায়। এ অঞ্চলের ৫৫ জন তরুণীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে পাকবাহিনী প্রায় দেড়শো জন বিভিন্ন বয়সী মেয়েকে ঘর থেকে বের করে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করে। এদের মধ্যে ১০ জনের তখনই মৃত্যু হয়।

একই গবেষণা থেকে বাগমারা গ্রামের দেলজান বিবির কথায় জানা যায়। সময়টা ছিলো রমজান মাস, দেলজান বিবি রোজা ছিলেন। হঠাৎ পাকসেনারা ঘরে ঢুকে পড়ে এবং ধর্ষণ শুরু করে। একই গ্রামের সোনাভান খাতুনকেও রাস্তার মধ্যে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা হয়। ১০ ডিসেম্বর যশোরের মাহমুদপুর গ্রামের একটি মসজিদ থেকে এগারোটি মেয়েকে উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদেরকে যুদ্ধের সময় প্রায় সাত মাস ধরে মসজিদের ভেতরেই ধর্ষণ এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়।

হারেছ উদ্দিনের ভাষ্য :

যশোর ক্যান্টনমেন্টে চৌদ্দ দিন বন্দী থাকা হারেছ উদ্দিনের ভাষ্যে জানা যায় ক্যান্টনমেন্টে ১২ থেকে ৫০ বছর বয়সের ২৯৫ জন মেয়েকে আটক রাখা হয়েছিল, তাদের উপর নির্যাতন চলত প্রতি রাতেই। হারেছ উদ্দিনের সেলটি বেশ খানিকটা দূরে থাকলেও নির্যাতনের সময় মেয়েদের চিৎকার তিনি শুনতে পেতেন। প্রতিদিন বিকেলে একজন সুবাদার এসে এসব কে কোথায় যাবে তার একটি তালিকা বানাত, সন্ধ্যা হলেই এই তালিকা অনুযায়ী মেয়েদের পাঠানো হত। অনেক সময় খেয়াল খুশিমত বাইরে নিয়ে এসে তাদের এলোপাথাড়িভাবে ধর্ষণ করা হত।

ফুলজানের শিশু হত্যা :

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর মাটিরহাট গ্রামের ফুলজান যুদ্ধের সময় আট মাসের গর্ভবতী ছিল, তার বাবা মায়ের সামনেই তাকে কয়েকজন সৈনিক উপর্যুপুরি ধর্ষণ করে। তার গর্ভের সন্তানটি মারা যায়।

বন্দুক ধরে চোখের সামনে রাজাকারের মা'কে ধর্ষণ :

কুমারখালির বাটিয়ামারা গ্রামের মোঃ নুরুল ইসলামের বর্ণনায় একটি আপাত-অদ্ভুত ঘটনা জানা যায়। ঐ এলাকার একজন রাজাকারকে একদিন দু'জন পাকসেনা

মেয়ে যোগাড় করে দিতে বললে সে তাদেরকে তার বাড়ি নিয়ে যায়, খবর পেয়ে বাড়ির সব মেয়ে পালিয়ে গেলেও তার বৃদ্ধা মা বাড়িতে থেকে যান। সৈনিক দু'জন রাজাকারটির বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে পালাক্রমে তার মাকে ধর্ষণ করে। এরপরে রাজাকারটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

বিহারীদের হাতে অবিশ্বাস ধর্ষণের ঘটনা :

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে কম যায়নি বিহারীরাও। নৃশংসতায় তারা কোন কোন সময় ছাড়িয়ে গিয়েছিল পাকবাহিনীকেও। ২৬ মার্চ '৭১ মীরপুরের একটি বাড়ি থেকে পরিবারের সবাইকে ধরে আনা হয় এবং কাপড় খুলতে বলা হয়। তারা এতে রাজি না হলে বাবা ও ছেলেকে আদেশ করা হয় যথাক্রমে মেয়ে এবং মাকে ধর্ষণ করতে। এতেও রাজি নাহলে প্রথমে বাবা এবং ছেলে কে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয় এবং মা মেয়ে দু'জনকে দু'জনের চুলের সাথে বেঁধে উলঙ্গ অবস্থায় টানতে টানতে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

খুলনার ডাঃ বিকাশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা যায়, সেখানকার পাবলিক হেলথ কলোনি এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্থাপিত ক্যাম্পে বিপুল সংখ্যক মেয়েকে (প্রায় সব বয়সের) আটকে রেখে পূর্বোক্ত কায়দায় নির্যাতন চালানো হয়। যুদ্ধ শেষে ক্যাম্পের একটি কক্ষ থেকে কয়েকটি কাঁচের জার উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে ফরমালিনে সংরক্ষিত ছিল মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অংশ। অংশগুলি কাটা হয়ে ছিল খুব নিখুঁতভাবে।

টাইমস পত্রিকার সত্যবচন :

যৌন দাসী হিসেবে বাঙালি মেয়েদের বন্দী করে রাখার একটি ঘটনা প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়, ২৫ অক্টোবর ১৯৭১

One of the most horrible revelations concerns 563 young bengali women, some of 18, who have been held captive inside Dacca's dingy military cantonment since the first five days of the fighting,Seized from University and Private Homes and forced into military brohees,the girls are all three to five months pregnant.

শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমদ : ১৯৭২ সালে নরওয়ের একদল টেলিভিশন সাংবাদিকের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে সেসময়কার স্বাস্থ্য ও শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী জানান, মিত্রবাহিনী কুমিলা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করে সাতশত বিবস্ত্র নারীকে বন্দী অবস্থায় দেখতে পায়। জানা যায়, ২৫ মার্চের পর থেকেই সারা দেশ থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে এখানে রাখা হতো। এছাড়াও সিলেট বিমান বন্দরে তিনশত মেয়েকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল বিবস্ত্র অবস্থায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর তিনটি বন্দিশিবিরে পাঁচশতের বেশি মেয়ে বন্দি ছিল।

নামাজরত মানুষকেও তারা করুণা করেনি :

রাজশাহীর বাগমারার দেলজান বিবিকে রোজা থাকা অবস্থায় ধর্ষণ করা হয়। রাজশাহী শহরের একটি বাড়িতে আনুমানিক তিরিশ বছর বয়স্কা একজন মহিলা নামাজ পড়ছিলেন। সেই অবস্থাতেই ফেলে দিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়, তিনি মারা যান জায়নামাজের উপরেই। এই ঘটনা দেখে তার স্বামীও তখনই মারা যান। টাঙ্গাইলের ছাব্বিশা গ্রামের ভানু বেগমকে ধর্ষণ করতে গেলে তিনি বাধা দেন। তখন পাকিস্তানি সৈনিকেরা তার এক বছরের শিশু সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। নিরুপায় ভানু বেগমকে এরপর উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়, ধর্ষণ শেষে জ্বলন্ত আগুন চেপে ধরে সৈনিকেরা ঝলসে দেয় তার শরীরের বিভিন্ন অংশ।

এবারে কয়েকজন নারীর কথা উল্লেখ করছি যারা ধর্ষণ এবং নির্যাতনের ফলে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক সমস্যার শিকার হয়েছিলেন।

"গণ্ডগোল শুরু হওয়ার পর থাইক্কাই তো পালাইয়া পালাইয়া বেড়াইছিলাম। একদিন ঐখানে নিছে, কালাই ক্ষেতে। তখন নয় মাসের বাচ্চা পেটে। ছেলেটা হইছিল। পেটে বাচ্চাটা তহনই পইড়া যায়। তহন তো আমার অবস্থাও যায় যায় করে। এক দিকে এই অত্যাচার আবার অন্য দিকে পেটের সন্তানও মারা গেছে। একভাবে তো বাইর করতে হইবো। আমার অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে। এক সময় আমাকে বাঁচানোই দায় হইয়া পড়ছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি তখন গ্রামের লোকেরাই আমারে বাঁচানোর জন্য আগাইয়া আইল। তখন তারা দা, বটি দিয়ে ছেলেটারে কাইটা কাইটা পেট থেকে বের করে। তখন দেখে যেই সন্তান ছেলে সন্তান। তারপর তো আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়। তখন আমারে তাড়াতাড়ি করে মেডিকেলে নিয়ে গেল। ৪ বৎসর রইছি মেডিকেলে। নির্যাতনের কারণে পায়খানার রাস্তাটা আর সন্তানের রাস্তা এক হইয়া গেছিল। অপারেশন করতে হয় পাঁচটা বড় বড় অপারেশন। এই জায়গাটা এভাবেই আছে, সেই ৩০ বছর ধরে এভাবেই। এই পর্যন্ত কত কষ্ট করতাছি। সারাদিন ডোমা (কাপড়ের নেকড়া) দিয়া পেঁচায়া রাখি। ঐ যে খাঁচাটা আছে না, তার মধ্যে জমাই। পরে একবারে নিয়া ধুইয়া আনি। সারাদিন কি ধোয়া সম্ভব। একটু পর পর ডোমা পাল্টাতে হয়। এই পাঁচ, দশ মিনিট পরপর। রাস্তা দুইটা এক হওয়াতে পায়খানার রাস্তা খুবই খারাপ হয়ে যায়। তাই পায়খানার রাস্তাটা পেটের ঠিক নাভির পাশে করিয়ে দেয়। তাই কোন নির্দিষ্ট সময়ে তা করতে হয় না। সারাক্ষণই পায়খানা বের হতে থাকে। তাই এই ডোমা দিয়ে রাখি। গায়ে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। ঐ কাজ করার পরে তো পায়খানা আর প্রসাবের রাস্তা এক হয়ে গেছে। ২ টা পর্দা আছে না? এক হয়ে গেছে। পরে পায়খানা সারাক্ষণ আসতেই থাকে সন্তানের রাস্তা দিয়ে। জরায়ু কয় না? জরায়ু দিয়েও পায়খানা আসে। তারপরই অপারেশন করে এই ব্যবস্থা করে দেয়।

যায়যায়দিন

প্রথম পাতা | স্বদেশ | বিদেশ | অর্থ-বাণিজ্য | নগর-মহানগর | শেষের পাতা | শিক্ষা জগৎ | বিনোদন | খেলাধুলা | বিজয় দিবস বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদকীয় উপ-সম্পাদকীয় | ই-যায়যায়দিন

« পূর্ববর্তী সংবাদ | পরবর্তী সংবাদ »

শ্রীপুরের বীরাঙ্গনা মমতাজ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চান

শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা »

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার লতিফপুর গ্রামের শ্রবণ প্রতিবন্ধী বীরাঙ্গনা মমতাজ বেগম ৪২ বছর ধরে পাক বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের ক্ষত বয়ে চলেছেন। পাকিস্তানি হানাদারদের নির্যাতনে প্রকৃতির ডাকে সাড় দেয়ার রাস্তা চিরদিনের জন্য এক হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর তার তলপেটে পাঁচবার অপারেশন হয়েছে। কিন্তু তারপরও মমতাজ স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির কাজ সারতে পারেন না। মমতাজ বেগম ৪২ বছর ধরে চিকিৎসকের পরামর্শে বিকল্প পথে প্রকৃতির কাজ সেরে চলেছেন। তিনি নির্যাতনের পর কানে শুনেন না।

ঈদ সংখ্যা ২০১৪

ঈদ সংখ্যা ২০১৩

ঈদ সংখ্যা ২০১২

ধইরা নিছে সকাল ১১টার দিকে। আনছে একেবারে মাগরিবের পরে হয়তো। আমি কইতে পারি না কহন আনছে। আমার একটা ননদ আছিল, ঐ ননদের মেয়ে দেইখ্যা বাড়িতে কইলে অন্যরা যাইয়া নিয়ে আসে, কোনো কোনো সময় জ্ঞান ছিল। আবার কোনো কোনো সময় অজ্ঞান ছিলাম। অনেক পাকবাহিনী ছিল। আর দুইজন রাজাকার।"

গাজীপুরের শ্রীপুরের বীরাঙ্গনা মমতার বর্ণনা থেকে উপরের অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

গত ৩০ অক্টোবর ৪৩ বছর কৃত্রিম নল দিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে অকল্পনীয় দুর্দশা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেন মমতাজ। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বীরাঙ্গনার। স্বীকৃতির পর থেকে যৎসামান্য সরকারি অনুদান ও সাহায্যে চলত তার চিকিৎসা ও ক্ষুধা নিবারণ। নরপশুদের অত্যাচার ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ৪৩ বছর পার করে বুধবার রাতে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুকে বরণ করেন মমতাজ বেগম। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ছাড়াই নিজ বাড়ীতে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বীরাঙ্গনারা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি না পাওয়ায় তার ভাগ্যে রাষ্ট্রীয় সালাম জোটেনি।

ফরিদপুরের আন্না সেনকে যখন ধর্ষণ করা হয় তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। স্বাধীনতার পর যদিও বিয়ে হয় আন্নার, ততদিনে তিনি নির্যাতনের তীব্রতায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না এমন মানসিক জটিলতায় আচ্ছন্ন। বিয়ের পরপরই আত্মহত্যা করেন আন্না।

এছাড়া যুদ্ধের পর লজ্জায় অনেক নারীই পাকিস্তানি সৈনিকদের অনুগামী হয়েছেন। চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও তারা এপথে পা বাড়িয়েছেন পরিচিত সমাজে মুখ

দেখানোর লজ্জায়। কাপাসিয়ার মনোয়ারা বেগমের স্বামীকে হত্যা করার পর এক সিপাহী তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে ক্যাম্পে রাখতো, আর গণহারে ধর্ষণ করতো। যুদ্ধ শেষে ঐ সৈনিক মনোয়ারাকে নিয়ে যায় পাকিস্তানের করাচি। করাচির আয়েশা কলোনীতে রেখে সেই সিপাহী মনোয়ারাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর প্রতি রাতেই বড় বড় অফিসারদের কাছে নিয়ে যেত। আস্তে আস্তে আরো বড় বড় জায়গায় নিয়ে যেত আর সারাদিন থাকতো বন্দী। এক সময় তাকে বিক্রি করে দুবাই, দুবাই থেকে ফ্রান্স, তারপর সৌদি আরবে, তারপর আবার ফ্রান্স, এভাবেই চলেছে তার উপর নির্যাতন ধর্ষণ। এক সময় যখন সে অচল হয়ে পড়ে, তাকে দিয়ে আর এই সব কাজ চলে না, তখন ফেলে দেয় রাস্তায়। সেই মনোয়ারা এক সময় অর্ধ পাগল অবস্থায় বাংলাদেশে ফিরে আসে। যখন সে পাকিস্তানের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাঁদছে, তখন এক বাঙালির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার কাছে মনোয়ারা চেয়েছিল তার জীবনের একটা ইচ্ছের কথা। সে মরার আগে যেন তার দেশ, প্রিয়জনদের দেখতে পায়। তার এই আকুল আবদারটুকু সেই বাঙালি রেখেছিলো। বহু চেষ্টা করে তার জীবনের এই একটা ইচ্ছা পূরণ করলেন সেই মনোয়ারাকে উদ্ধারকারী সাইফুল ইসলাম, দুই দেশের রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করে। ১৯৯১ অথবা ১৯৯২ সালের দিকে মনোয়ারা দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে এখন তিনি ভিক্ষা করে খান।

উল্লেখিত ঘটনাগুলোর বেশ কয়েকটি পাওয়া যাবে ডাঃ এম এ হাসানের লেখা যুদ্ধ ও নারী গ্রন্থে। এই বইটি সম্পর্কে কিছু না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই নিবন্ধগুলো লেখার জন্য আমাকে দেশ বিদেশী বেশ কয়েকটি বই পড়তে হয়েছে। এত বইয়ের ভেতর আমার মতে বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো করে জানা যাবে এই বইটি থেকে। একাত্তরের সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর দ্বারা সংঘটিত নারী নির্যাতনে পিষ্ট ক্ষতিগ্রস্তদের জবানবন্দির ভিত্তিতে লিখিত দীর্ঘ গবেষণার ফসল এই গ্রন্থ। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে দেশের বিয়াল্লিশটি জেলার পঁচাশিটি থানার অসংখ্য সাক্ষাৎকার। এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে নির্যাতিত নিম্নবিত্ত সাধারণ নারী, গ্রাম্য গৃহবধূ এবং বিভিন্ন উপজাতি, আদিবাসী ও চা শ্রমিক। এই সাক্ষাৎকারদাতা নারীদের বেশিরভাগই পাকিদের পাশবিক আক্রমণ ও যৌন নির্যাতনে ছিন্নভিন্ন হয়েছিলেন। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে যুদ্ধের ন'মাসে ভারত ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী নির্যাতিত শরণার্থী নারীদের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান। বিশেষণের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে এই বিপুল সংখ্যাক শরনার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এক লাখ ত্রিশ হাজারেরও বেশি নারী পাকিদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। এছাড়া দেশের মধ্যে নির্যাতিত হয়েছেন। এছাড়া দেশের মধ্যে নির্যাতিত নারীদের পরিসংখ্যান তো রয়েছেই। সামগ্রিক তাদের গবেষণায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, একাত্তরের ন'মাসে সাড়ে চার লাখের বেশি

নারী পাকিদের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শতকরা ৫৬.৫০ ভাগ মুসলিম, ৪১.৪৪ ভাগ হিন্দু এবং ২.০৬ ভাগ খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের। আরও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে যৌনদাসী, কমফোর্ট গার্ল ও সন্তানসম্ভবা অধিকাংশ যুদ্ধশিশুর মায়েরাও ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে নির্যাতিত নারীর শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলোসহ সামাজিক জটিলতাও উঠে এসেছে এই গবেষণায়। দেশে দেশে যুদ্ধে নারীর বিপন্নতা এবং নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপট বিশেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এর সঙ্গে একাত্তরে পাকিদের নারী নির্যাতনের ধরন ও মনোবিকার, শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া নারীদের দুঃসহ জীবন, নারীর বৈষম্য, মানসিক বিপর্যয় ও জীবনের সংকট ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের ব্যর্থতার বিষয়গুলো অনুপঙ্খভাবে বিশেষণ করা হয়েছে।

উপরের ঘটনাগুলো কেবল নির্বাচিত কয়েকটি। এছাড়াও এধরণের অজস্র ঘটনা ঘটেছে দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে। সম্ভবত এখন সময় এসছে এই ঘটনাগুলোকে সামনে নিয়ে আসার। তা না হলে এই রক্তের ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়।

এই সিরিজ থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি

১) এই সিরিজের প্রথম পর্বে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আমাদের দেশে যে নির্বিচারে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন করেছে সেটা অন্যান্য যুদ্ধের মত সৌন্দর্য প্রলুব্ধ হয়ে নয় বরং উপরের আদেশে যুদ্ধের অংশ হিসেবে। এটাকে অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক নির্যাতন বলতে হবে, সে জন্যই ৮ থেকে ৮০ বছরের সবাই পাইকারি হারে নির্যাতিত হয়েছে এবং নারী নির্যাতনের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

২) এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন সূত্রে এতদিন ধরে ধর্ষণের যে সংখ্যা প্রচার হয়ে আসছে তা প্রকৃত সংখ্যার অনেক কম। আসল সংখ্যাটা ছয় থেকে সাত লক্ষ।

৩) এই সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ পর্বে আমরা দেখলাম দৈব্যক্রমে নির্বাচিত কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা। কয়েকটি মারাত্মক নির্যাতনের কথা যেগুলো হার মানিয়েছে পৃথিবীর যে কোন নির্যাতনের বয়ানকে ।

তথ্যসূত্র :

১) বীরাঙ্গনাদের কথা- সুরমা জাহিদ

২) '৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ– ডা. এম এ হাসান

৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান শাহনাজ পারভিন

৪) A Tale of Millions – Rafiqul Islam BU

৫) Against Our Will : Men,Women and Rape – Susan Brownmiller

৬) Rape as a Weapon of War and it's Long-term Effects on Victims and Society – Cassandra Clifford

৭) East Pakistan The Endgame – Brigadier A. R. Siddiqi

৮) মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১– মুনতাসীর মামুন

৯) icsforum.org

১০) ৭১-এর নারী নির্যাতন,কাজী হারুনুর রশীদ সম্পাদিত

১১) বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম খন্ড, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত

১২) ভোরের কাগজ, ১৮ মে ২০০২

১৩) আমি বীরাঙ্গনা বলছি নীলিমা ইব্রাহীম

কাদের মোল্লার আসল নকল একটি নির্মোহ অনুসন্ধান

যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট অর্জন, বলাই বাহুল্য। এবারের বিজয় দিবস এবং সেই সঙ্গে নতুন বছরের আগমনটাই যেন ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে গেছে এই অর্জনের ফলে। যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আলবদরদের বিচারের যে আকাঙ্ক্ষা একটা সময় আমাদের রক্তে শিহরণ তুলত, একটা অপ্রাপ্তির বেদনা গ্রাস করে ফেলত বছর খানেক আগেও, সেটা থেকে যেন আমরা মুক্তি পেয়েছি।

অন্তত একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি নানা ধরনের বিতর্ক, প্রতিবন্ধকতা, বিশ্বমোড়লদের তরফ থেকে দেওয়া আন্তর্জাতিক চাপ সবকিছু অগ্রাহ্য করে। এটা যে কত বড় অর্জন তা বোধহয় আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। এই দিনটা দেখার স্বপ্ন আমরা বুকের মধ্যে লালন করেছিলাম বহুদিন ধরে।

একাত্তরের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ও 'মিরপুরের কসাই' খ্যাত আবদুল কাদের মোল্লা

কিন্তু আমরা কী দেখলাম? কাদের মোল্লার ফাঁসির পর বাংলাদেশের আপামর জনগণ যখন আনন্দোচ্ছ্বাস করছে, ঠিক তখনই এক মুখচেনা মহল সারা দেশে শুরু করেছিল সহিংসতা আর নৈরাজ্যের বিস্তার। জ্বালাও-পোড়াও, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর আক্রমণ, বিচারকদের বাসায় বোমাবাজি সবই শুরু হল পুরোদমে। পাশাপাশি আরেকটা কাজও জামাতিদের তরফ থেকে করার প্রচেষ্টা চালানো হল– যেটা তারা সবসময়ই করে থাকে– বিভ্রান্তি ছড়ানো।

সত্য যখন উন্মোচিত আর দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত, বিভ্রান্তি আর মিথ্যে প্রচারণা–এটাই বোধহয় একমাত্র অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন। সাঈদীর ফাঁসির রায়ের পর চাঁদে সাঈদীর মুখচ্ছবি দেখা নিয়ে কী প্রচারণাটাই না চালানো হয়েছিল। অথচ পুরোটাই ছিল ফটোশপে এডিট করা খুব কাঁচা হাতের কাজ। যারা নিজেদের ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক মনে করেন, তাদের সাচ্চা সৈনিকেরা এভাবে ফটোশপে ছবি এডিট করে যাচ্ছে তাই প্রচারণা চালায়– ভাবতেও হয়তো অনেকের অবাক লাগবে।

কিন্তু যারা এই গোত্রটির কাজকর্মের নাড়ি-নক্ষত্রের হদিস জানেন, তারা অবাক হন না। শাহবাগ আন্দোলন শুরুর সময় একে কলঙ্কিত করতে নানা ধরনের রগরগে ছবি জোড়াতালি দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল– 'প্রজন্ম চত্বর' নাকি আসলে 'প্রজনন চত্বর'। ওখানে নাকি রাত্রিবেলা গাঁজা খাওয়া হয়, ফ্রি সেক্স হয়, তরুণীরা সেখানে গেলেই ধর্ষিত হতে হয়, আরও কত কী।

কী না করেছিল তারা! মুম্বাই মেডিকেলের স্ক্যান্ডালের ছবির সঙ্গে ইমরান এইচ সরকারের চেহারা জোড়া দেওয়া, শাহবাগের জমায়েতে নাইট ক্লাবের নগ্নবক্ষা নারীর ছবি কাট অ্যান্ড পেস্ট করে লাগিয়ে দিয়ে ফেসবুকে ছড়ানো, নামাজরত এক

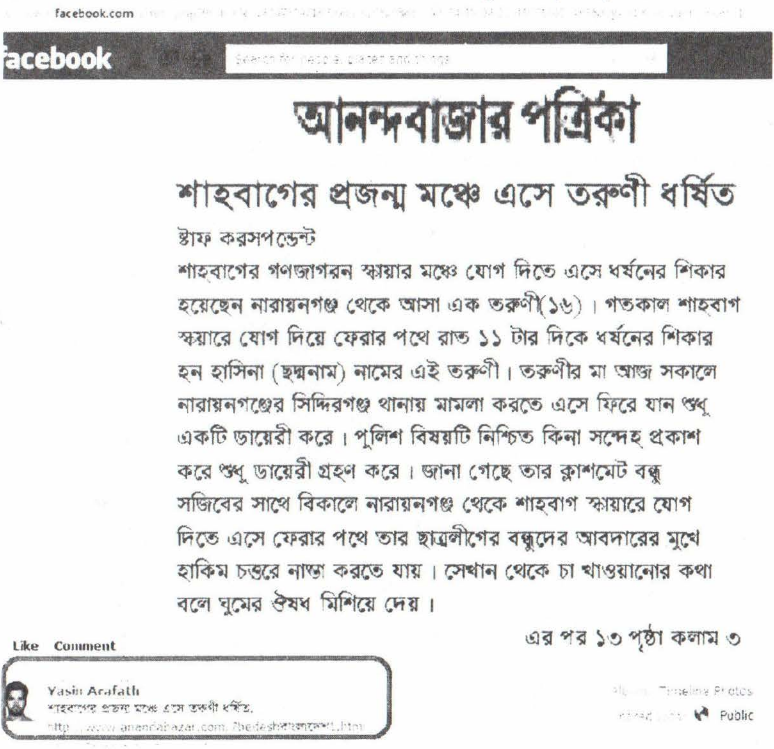

শাহবাগের প্রজন্ম মঞ্চে এসে তরুণী ধর্ষিত

স্টাফ করসপন্ডেন্ট

শাহবাগের গণজাগরন স্কয়ার মঞ্চে যোগ দিতে এসে ধর্ষনের শিকার হয়েছেন নারায়নগঞ্জ থেকে আসা এক তরুণী(১৬)। গতকাল শাহবাগ স্কয়ারে যোগ দিয়ে ফেরার পথে রাত ১১ টার দিকে ধর্ষনের শিকার হন হাসিনা (ছদ্মনাম) নামের এই তরুণী। তরুণীর মা আজ সকালে নারায়নগঞ্জের সিদ্দিরগঞ্জ থানায় মামলা করতে এসে ফিরে যান শুধু একটি ডায়েরী করে। পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত কিনা সন্দেহ প্রকাশ করে শুধু ডায়েরী গ্রহণ করে। জানা গেছে তার ক্লাশমেট বন্ধু সজিবের সাথে বিকালে নারায়নগঞ্জ থেকে শাহবাগ স্কয়ারে যোগ দিতে এসে ফেরার পথে তার ছাত্রলীগের বন্ধুদের আবদারের মুখে হাকিম চত্তরে নাস্তা করতে যায়। সেখান থেকে চা খাওয়ানোর কথা বলে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেয়।

এর পর ১৩ পৃষ্ঠা কলাম ৩

পাকিস্তানি পুলিশকে শিবিরের কর্মী হিসেবে চালিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রতীকী রশি নিয়ে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি সম্বলিত ছবির শিরোনাম বদলে 'ফাঁসির অভিনয় করতে গিয়ে শাহবাগে যুবক প্রাণ হারাল' টাইপ মিথ্যে নিউজ তৈরি করা–কোনো কিছুই বাদ যায়নি।

মুক্তমনা ব্লগে আমাদের সতীর্থ দিগন্ত বাহার 'কথিত ইসলামি দল জামায়াতে ইসলামীর মিথ্যাচার সমগ্র' শিরোনামের পোস্টে খুলে দিয়েছিলেন তাদের মিথ্যের মুখোশ; তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি ছবি পাঠকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া গেল:

"হঠাৎ একটা ছবি প্রচারিত হতে লাগলো! শাহবাগে তরুণী ধর্ষণ!

Yasin Arafath নিকের ভদ্রলোক এ ছবি (১৫৩ পৃষ্ঠায়) শেয়ার দিয়েছেন। এ খবরের সূত্র দেখলাম কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা। টাশকি খাওয়ার মতোই ব্যাপার! দেশের এতো পত্রিকা থাকতে, এমনকি শাহবাগ আন্দোলন যাদের বিরুদ্ধে তাদের পত্রিকা যেমন, দৈনিক সংগ্রাম, নয়া দিগন্ত, আমার দেশে এ খবর না প্রকাশ করে আনন্দবাজার প্রকাশ করতে যাবে কেন? ক্লিক করলাম ভদ্রলোকের দেয়া লিঙ্কে–http://www.anandabazar.com/7bedesh বাংলাদেশ1.html ভেসে উঠলো নিচের এই চিত্র–

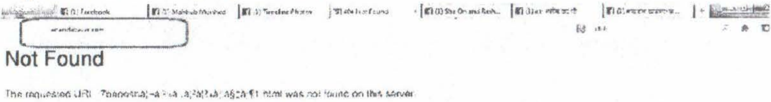

ভয়ংকর মিথ্যা কিছু কথাকে টাইপ করে ইমেজ বানিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার নামে ছেড়ে দেয়া হলো শাহবাগে আন্দোলনকারীদের ধর্ষক সাজিয়ে! "ধর্মীয় রাজনীতিবিদ" বলে কথা!

নিচের ছবিটা দেখুন, প্রথম আলোর বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে– সে শাহবাগ আন্দোলনে মারা গেছে–

কীসব প্রচণ্ড মিথ্যার বেশাতি খুলে বসেছে ইসলামী ভাবধারী বলে কথিত সংগঠন জামাত-শিবির চক্র। একই সময়ে পাবলিকের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নেয়ার উদ্দেশ্যে বানানো পাকিস্তান পুলিশের একটা ছবি পোস্ট দেখি–

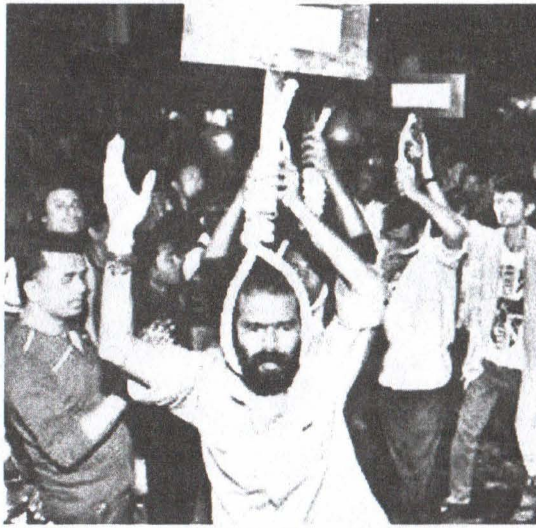

শাহবাগে গলায় প্রতিকী রশি দিয়ে রাজাকারদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছে প্রতিবাদী কিছু যুবক

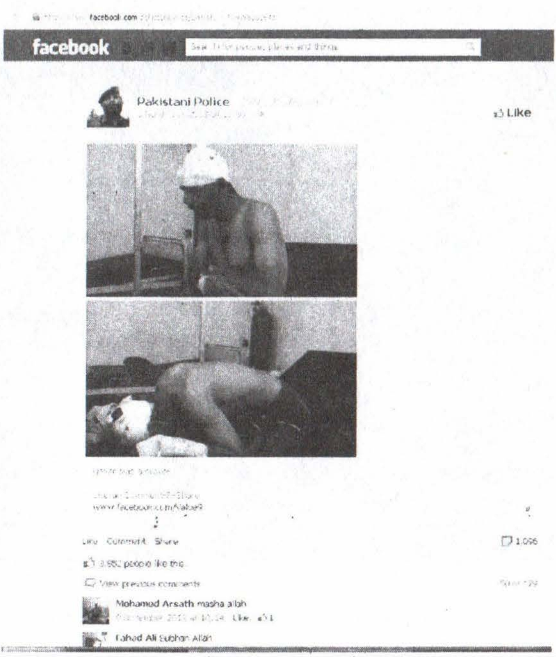

পাকিস্তান পুলিশের ওপরের ছবিটাকে মেরে দিয়ে ক্যাপশন যোগে বানানো হলো নিচের ছবি–

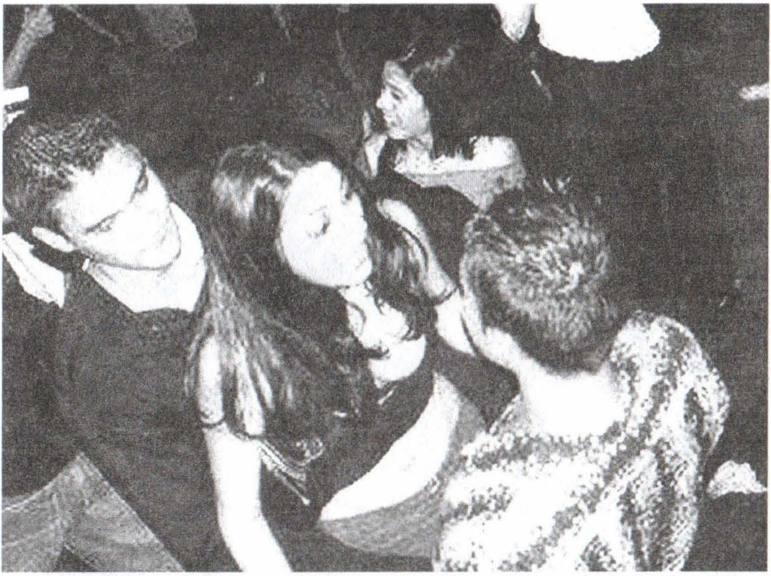

উপরের ছবিটির সাথে মেশানো হল এই ছবিটির অংশবিশেষ–

আপনার সন্তানকে এমন ফ্রী সেক্স উপভোগ করাতে চাইলে প্রজন্ম চত্বর ওরফে প্রজনন চত্বর শাহবাগে পাঠান, এখানে রাতে সেক্স মেলা হয়

উপরের দুটো ছবিকে ফটোশপে মিশিয়ে শাহবাগকে সেক্স-জোন বানানো হলো এ ছবিটিতে–

শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ইমরান এইচ সরকারের ছবি পাশে বসিয়ে পোস্ট করা হলো এ ছবিটি–

অথচ এটা একটি আপত্তিকর ভারতীয় সাইটে DR. SHEETAL AND ANAND SEX AT MUMBAI MEDICAL COLLEGE শিরোনামে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে পোস্ট হয়েছে, জামাত-শিবির এসব পর্ন সাইটে ভালোই নজর রাখে দেখা যায়, কাছাকাছি চেহারা মিলানোর জন্যে এসমস্ত ছবি বাছাই করতে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। ছবি দেখুন–

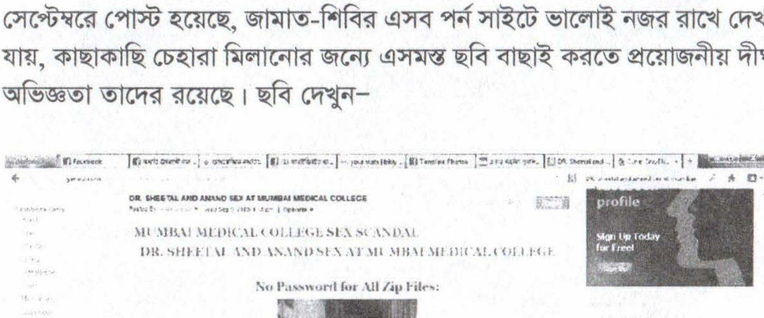

এবার ফিরে যাই মূল আলোচনায়।

কাদের মোল্লার ফাঁসির পরেও নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। ফাঁসির আগে থেকেই কাদেরের তথাকথিত 'অ্যালিবাই' উপজীব্য করে ছড়ানো হয়েছিল মিথ্যে। কাদের ট্রাইব্যুনালকে বলেছিল:

"আজ এই কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ১৯৭১ সালে মিরপুরে কসাই কাদের কর্তৃক যেইসব হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল তার একটি অপরাধের সঙ্গেও আমার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। কাদের মোল্লা বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি ১৯৭৩ সালের আগে কোনোদিন মিরপুরেই যাইনি।"

এই অ্যালিবাইকেই সত্য ধরে নিয়ে অনেকে জল ঘোলা করছেন। কিন্তু এটাই কি স্বাভাবিক নয় যে কাদের মোল্লার মতো এত বড় একটা পাষণ্ড এবং ঠাণ্ডা মাথার খুনি এ ধরনের অ্যালিবাই হাজির করেই নিজেকে আত্মরক্ষা করতে চাইবে? তার তো এটাই বলার কথা যে ঘটনার সময় সে ঘটনাস্থলে ছিল না।

এ নিয়ে সম্প্রতি ব্লগার নিঝুম মজুমদার কিছু গবেষণা করেছেন। মুক্তমনায় প্রকাশিত তার দি কিউরিয়াস কেইস অব কাদের মোল্লা এবং সাক্ষী মোমেনা শিরোনামের লেখাটি থেকে জানা যায়, এই কাদের মোল্লার একসময়ের সবচাইতে বড় ইয়ার দোস্ত 'আক্তার গুণ্ডা' ছিল কাদের মোল্লার মতোই এক ভয়াবহ খুনি। কাদের মোল্লা এই আক্তার গুণ্ডার সঙ্গে মিলেই মূলত ১৯৭১ সালে মিরপুরে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।

১৯৭২ সালের দালাল আইনে এই আক্তার গুণ্ডার বিচার হয় এবং বিচারে তাঁর ফাঁসিও হয়। মজার ব্যাপার হল, এই আক্তার গুণ্ডাও আজ থেকে ৪০ বছর আগে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে সেই একই ধরনের অ্যালিবাই হাজির করেছিল যে, সে ঘটনাস্থলে ছিল না, ছিল পাকিস্তানে। গণহত্যার সে কিছুই জানে না ['আক্তার গুণ্ডা ভার্সেস বাংলাদেশ রায়' দ্রঃ]।

> **6. The prosecution examined 16 witnesses. The defence called one. The principal defence was alibi and identity of the prisoner in that he was not present on the day of occurrence at Dacca, he being in Karachi at all material times. He returned to Dacca on 13th April, 1971. The other plea was that he is not that Akhtar who is known as Akhtar Goonda. There is another, person of the same name, who, in fact, indulges in rowdyism.**

ছবি : রায়ের ফটোকপি দ্রষ্টব্য

কিন্তু কেউ এ ধরনের 'ভেজা বিড়াল' সাজতে চাইলেই যে সেটা ঠিক তা তো নয়। বহু চাক্ষুষ সাক্ষীই আক্তার গুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং সে দোষী প্রমাণিত হয়েছিল।

কাদের মোল্লার বিয়াল্লিশ বছর পরে তার প্রিয় গুণ্ডা বন্ধুর মতোই অ্যালিবাই হাজির করতে গিয়ে বলেছে, সে কস্মিনকালেও মিরপুরে যায়নি, গণহত্যা তো কোন ছাড়! এমন একটা ভাব যে, কাদের মোল্লা ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। সহজ সরল এক ভালো মানুষকে যেন 'কসাই কাদের' ভেবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একই কাজ তারা অন্য আসামির বেলায়ও করেছে। এই 'সাকাচৌ' সেই সাকা চৌধুরী নয়, সে ছিল পাকিস্তানে। এই দেলু রাজাকার সেই 'দেইল্যা' নয়। একই ধারাবাহিকতায় এখন বলছে, এই কাদের মোল্লা সেই কসাই কাদের নয়। কিন্তু তাদের এই কথা ঠিক কতটুকু যৌক্তিক– এই প্রবন্ধে আমরা সেটা পুংখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখব।

একাত্তরে কাদের মোল্লার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারটা বহুভাবেই আসলে প্রমাণ করা যায়। শুরু করা যাক ইন্টারনেটে পাওয়া একটি বহুল প্রচারিত ছবি দিয়ে, যেখানে নিয়াজীর পেছনে আশরাফুজ্জামান এবং কাদের মোল্লাকে

সেই ঐতিহাসিক ছবি, নিয়াজীর পাশে কাদের মোল্লা

দেখা যাচ্ছে। আশরাফুজ্জামান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে মূল ভূমিকা পালন করেছিল, বর্তমানে ব্রিটেনে পলাতক আলবদর নেতা মুঈনুদ্দীনের সঙ্গে মিলে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান খ্যাত ১৮ জন বুদ্ধিজীবীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করে তারা। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মঈনুদ্দীনের সঙ্গে আশরাফুজ্জামান খানেরও ফাঁসির আদেশ হয়েছে সম্প্রতি। সেখানেই বীরদর্পে কাদের মোল্লা দণ্ডায়মান। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধ কোষ' বইয়ে ছবিটির হদিস পাওয়া যায়। ইউটিউবেও এর একটি ভিডিও আছে।

এই ছবি নিয়েও কম বিভ্রান্তি তৈরি হয়নি। শিবির প্রোপ্যাগান্ডা চালালো নিয়াজীর পাশে যে কসাই কাদেরের ফটো রয়েছে তা প্রায় নিয়াজীর মাথা সমান লম্বা। নিয়াজী

ছিলেন ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা; সে হিসেবে ফটোর কসাই কাদের ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা হবে। অথচ আবদুল কাদের মোল্লা মাত্র ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন। ফটোর কসাই কাদেরের বয়স ৪০-৪৫ এর কম নয়। ১৯৭১ সালে আবদুল কাদের মোল্লার বয়স ছিল মাত্র ২২-২৩ বছর।

সেই ছবির জের ধরে যারা মানতে নারাজ এই ছবির কাদের মোল্লা সেই কাদের মোল্লা না তাদের জন্য আরেকটি ছবি (ছবির কৃতজ্ঞতা "নিঝুম মজুমদার কে")

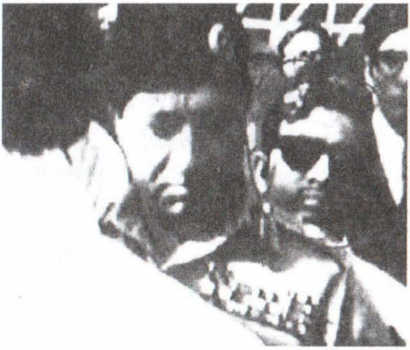

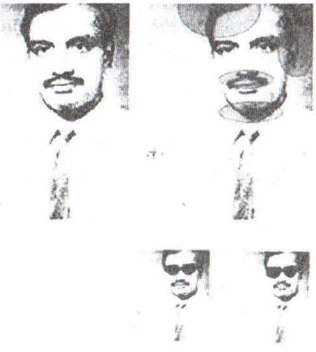

প্রথম ছবিতে ১৯৭১ সালে নিয়াজির পেছনে দাঁড়িয়ে কাদের মোল্লা। দ্বিতীয় ছবি কাদের মোল্লার ৭০ দশকের ফরমাল ছবি। এই ছবি উদ্ধার করে পাশা-পাশি দুইটি ছবির ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা কথা বলি কাদের মোল্লার বন্ধু "মোজাম্মেল খানে'র" সাথেও। তিনি আমাদের জানান :

"He was 1 and half year older than me. He was around 23/24 in 1971. The man behind Niazi does not look any older than the age I mentioned. Lookmg at his hair style he looks no doubt that he is Quader."

এর পরে কি আর কোন সন্দেহ থাকে এই ছবির ব্যাপারে ?

সেই বিয়াল্লিশ বছর আগের ছবিটির কথা যদি আমরা বাদও দিই, আজকের দিনের প্রসঙ্গ গোণায় ধরলেও, কাদের মোলার পরিচয় গোপন থাকে না। তার ফাঁসির পর পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলী খান বলেছেন–

"১৯৭১ সালের ঘটনার বিয়াল্লিশ বছর পর কাদের মোল্লার ফাঁসি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সংহতির জন্য কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মৃত্যুতে সকল পাকিস্তানি মর্মাহত এবং শোকাহত।"

তিনি আরও বলেন,

"এ ঘটনার মাধ্যমে পুরনো ক্ষত আবারও জাগিয়ে তোলা হয়েছে।"

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রধান মুনাওয়ার হাসান কাদের মোল্লাকে তাদের 'বাংলাদেশি সহচর' এবং 'পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধা' আখ্যায়িত করে তার ফাঁসিকে 'শোচনীয়' বলে মন্তব্য করেন। শুধু তাই নয়, কাদেরের ফাঁসি দেওয়ায় বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য নিজেদের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জামায়াত-ই-ইসলামী। 'কসাই কাদের' আর 'কাদের মোল্লা' এক ব্যক্তি না হলে পাকিস্তানি জামায়াতের এত শখ হল কেন এই বিবৃতি দেবার?

বারবারই বাংলাদেশের জামায়াত দাবি করে এসেছে কসাই কাদের আর কাদের মোল্লা এক ব্যক্তি নয়, তারা হাজির করে কাদেরের জবানবন্দি, যেখানে কাদেরের অ্যালিবাই ছিল:

"১৯৭১ সালের ১২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের আমিরাবাদ চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ই তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। গ্রামে অবস্থানকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও হাইস্কুলের প্রায় ৩০ জন ছাত্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ থেকে ১ মে পর্যন্ত (পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফরিদপুরে পৌঁছার দিন পর্যন্ত) অন্যদের সঙ্গে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যান। সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও) মফিজুর রহমান ডামি রাইফেল দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেন।" (ইত্তেফাক)

কাদের এবং তার দলবলের দাবি অনুযায়ী সে একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা ছিল; অথচ পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছেন–

"কাদের মোল্লা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন এবং তা তিনি নিজের মুখেই বলেছিলেন।"

নিজের মুখে কাকে এ কথা বলেছেন কাদের? তিনি বিরাট মুক্তিযোদ্ধা হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তো নিজেকে 'অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন' সেটা বলার কথা নয়। যেভাবে নিউজগুলো পত্রিকায় এসেছে তাতে মনে হয় নিসার সাহেবের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল এবং তিনি কাদেরের পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। না হলে নিসার সাহেব বলবেন কেন যে, পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সংহতির জন্য কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই?

এগুলো থেকে কী প্রমাণিত হয়? কসাই কাদের আর কাদের মোল্লা দুই ব্যক্তি? সেই হিন্দি সিনেমার মতো আসল কাদেরকে জীবিত রেখে তার 'জরুয়া' ভাইকে ঝোলানো হয়েছে? মোটেও তা নয়। বরং সম্প্রতি একটি পত্রিকায় ড. জিনিয়া জাহিদ যে কথাগুলো তার 'কাদের মোল্লা মরিয়া প্রমাণ করিল' শিরোনামের লেখায় উল্লেখ করেছেন সেটাই সত্য হিসেবে প্রকট হয়ে উঠেছে–

"সেই যে রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী গল্পে পড়েছিলাম, 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে, সে মরে নাই', ঠিক তেমনি কাদের মোল্লার ফাঁসিতে মৃত্যুর পর তাদের সমগোত্রীয় পাকি-জামায়াতের স্বীকারোক্তিতে এটাই প্রমাণ হল যে, এই কাদের মোল্লাই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী

াদের মোল্লা এবং এই কাদের মোল্লাই আমৃত্যু পাকি-সমর্থক ছিলেন। এই কাদের মোল্লা একাত্তরেও যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি াধীনতাবিরোধী ছিলেন।"

মিথ্যাচারী এবং মিথ্যার বেসাতি করা জামায়াত-শিবির কেবল কাদের মোল্লাকে কসাই াদের থেকে পৃথক করার মিশন নিয়েই মাঠে নামেনি, তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পর্যন্ত মাণ করতে চেয়েছে। সে নাকি একাত্তরের যুদ্ধে গ্রামে বসে কলেজ ও হাইস্কুলের প্রায় ০ জন ছাত্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ থেকে ১ মে র্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ চালিয়ে গেছে। মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে! অথচ এই কাদের মাল্লাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করেছিল চরম বিদ্রূপাত্মক উক্তি, যেটা ২০০৭ সালে দৈনিক ত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল:

"কেউ সুন্দরী নারীর লোভে, কেউ হিন্দুর সম্পদ লুণ্ঠন, কেউ ভারতীয় স্বার্থরক্ষায় ক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। কেউই আন্তরিকতা কিংবা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ ননি।" (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ অক্টোবর, ২০০৭)

বাংলাদেশ হয়েছে বলেই এতো মাতব্বরি'

ংলাদেশ হয়েছে বলে কারো কারো 'মাতব্বরি' বেড়ে গেছে সাংবাদিকদের রস্কার করে এজলাসে এমন মন্তব্য করেছেন যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জামায়াত নেতা ব্দুল কাদের মোল্লা।

ছবি : কাদের মোলার দম্ভোক্তি

এর বাইরেও বহুবারই কাদের মোল্লার বাংলাদেশ বিরোধিতা এবং বাংলাদেশের প্রতি অবজ্ঞার ব্যাপারটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন এ বছরের নভেম্বর মাসে বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকমে প্রকাশিত এই নিউজটি দ্রষ্টব্য:

কাদের মোল্লার দম্ভোক্তি লোক 'কসাই কাদের' না হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হবে, সেটা কি কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে?

এবার কিছু চাক্ষুষ সাক্ষীর বয়ান শোনা যাক।

এক: ফজর আলী

"মিরপুর ১১ নম্বর বি বকের বাসিন্দা ফজর আলী গণতদন্ত কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যে তার ছোট ভাই মিরপুর বাংলা কলেজের ছাত্র পল্লবকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন কাদের মোল্লাকে। ২৯ মার্চ নবাবপুর থেকে পল্লবকে তুলে নিয়ে আসে কাদের মোল্লার সাঙ্গপাঙ্গরা। এরপর তার নির্দেশে ১২ নম্বর থেকে ১ নম্বর সেকশনের শাহ আলী মাজার পর্যন্ত হাতে দড়ি বেঁধে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ছাত্রলীগ কর্মী পল্লবকে। এরপর আবার ১ নম্বর থেকে ১২ নম্বর সেকশনের ঈদগাহ মাঠে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে টানা দু'দিন একটি গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয় পল্লবকে। ঘাতকরা এরপর তার দু'হাতের সবকটি আঙুল কেটে ফেলে।

৫ এপ্রিল একটি মজার খেলা খেলে কাদের মোল্লা। সঙ্গীদের নির্দেশ দেওয়া হয় গাছে ঝোলানো পল্লবকে গুলি করতে, যার গুলি লাগবে তাকে পুরষ্কার দেওয়া হবে। পরে কাদের মোল্লার সঙ্গী আক্তার পল্লবের বুকে পাঁচটি গুলি করে পরপর। পল্লবের লাশ আরও দু'দিন ওই গাছে ঝুলিয়ে রাখে কাদের মোল্লা, যাতে মানুষ বোঝে ভারতের দালালদের জন্য কী পরিণাম অপেক্ষা করছে। ১২ নম্বর সেকশনে কালাপানি ঝিলের পাশে আরও ৭ জন হতভাগার সঙ্গে মাটিচাপা দেওয়া হয় পল্লবকে। অক্টোবরে মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে একজন মহিলা কবি মেহরুন্নেসাকে প্রকাশ্যে নিজের হাতে নির্মমভাবে হত্যা করে কাদের মোল্লা প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন সিরাজ এই নৃশংসতায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মূলত বিহারিদের নিয়ে একটি খুনে দল তৈরি করেছিল কাদের মোল্লা। আর বুলেট বাঁচাতে জবাই করা ছিল তার কাছে বেশি প্রিয়।"

দুই: ফিরোজ আলী

"ফিরোজ আলী তখন মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি, একাত্তর সালে সপরিবারে মিরপুরে থাকতেন। ২৫ মার্চের পর তার ভাই পল্লবকে শুধু 'জয় বাংলা'র অনুসারী হওয়ার অপরাধে কাদের মোল্লার নির্দেশে অবাঙালি গুণ্ডারা অকথ্য নির্যাতন করে নির্মমভাবে হত্যা করে। তখন সমগ্র মিরপুরে হত্যা আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে কাদের মোল্লা ও তার অনুসারী অবাঙালিরা। জবাই করে বাঙালি হত্যা ছিল তাদের

প্রতিদিনের রুটিন মাফিক কাজ। একেকটি জবাই'র আগে ঘোষণা দিত যারা বাংলাদেশ তথা 'জয় বাংলা'র অনুসারী, তারা বিধর্মী-নাস্তিক-ভারতের দালাল, এদের হত্যা করা সওয়াবের কাজ!

এমন জবাই'র নেশা বেড়ে যাওয়ায় কাদের মোল্লার নাম তখন এ তল্লাটে আতঙ্কের সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয়রা আবদুল কাদের মোল্লাকে 'কসাই কাদের' নামকরণ করে। গরু জবাই-এর মতো মানুষ জবাই-এ দক্ষতার নামডাকে (!) কসাই কাদের 'মিরপুরের কসাই' নামেও পরিচিতি লাভ করে ব্যাপক।

কসাই কাদের মোল্লার প্রতিহিংসার শিকার শহিদ পল্লবের ডাক নাম ছিল 'টুনটুনি'। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বেশ কিছু চলচ্চিত্রে পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করে প্রতিপক্ষের চক্ষুশূল হন পল্লব। এ কথা জানান ফিরোজ আলীর স্ত্রী।

পল্লব ছাড়াও কবি মেহেরুন্নেছা নামের এলাকায় খুবই শান্তি-নিরীহ প্রকৃতির বাঙালি গৃহবধূ কসাই কাদের মোল্লার প্রতিহিংসার বলি হন। মিরপুর ৬ নং সেকশন, ডি বক মুকুল ফৌজের মাঠের কাছাকাছি একটি বাড়িতে থাকতেন কবি মেহেরুন্নেছা। তিনি ছিলেন কবি কাজী রোজীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

কসাই কাদের মোল্লার নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে লেখালেখির অপরাধে মেহেরুন্নেছাসহ তার পুরো পরিবারকে বটি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল! এরপর টুকরো করা মাংস খণ্ডগুলো নিয়ে ফুটবলও খেলা হয়েছিল ৬ নং মুকুল ফৌজের মাঠে! কসাই কাদেরের নির্দেশে ৩০/৩৫ জনের একটি অবাঙালি ঘাতকের দল, মাথায় লাল ফিতা বেঁধে, ধারালো তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে অংশ নেয় কবি মেহেরুন্নেছা ও তার পরিবারের হত্যাযজ্ঞে!"

তিন: কাদের মোল্লার বন্ধু মোজাম্মেল এইচ খান

ড. মোজাম্মেল এইচ খান ছিলেন রাজেন্দ্র কলেজে কাদের মোলার সহপাঠী। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কাদের মোল্লার কাজকর্ম, একাত্তরে এবং তার পরবর্তী সময়। তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ দৈনিক জনকণ্ঠে একটি চমৎকার লেখা লিখেছিলেন, 'কাদের মোল্লাকে নিয়ে 'আমার দেশ' পত্রিকার আষাঢ়ে কাহিনী' শিরোনামে:

"কাদের মোল্লা হলেন আমাদের রাজেন্দ্র কলেজের ১৯৬৪-১৯৬৬ এইচএসসি ব্যাচের সবচেয়ে পরিচিত মুখ এবং তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমধিক পরিচিত ব্যক্তি, তা সে যে কারণেই হোক না কেন। এমনকি তিনি আমাদের সে সময়ের আরেক সহপাঠী বেগম জিয়ার বিগত শাসনামলের মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদকেও পরিচিতির দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন; যদিও মুজাহিদও একইভাবে ফাঁসিরকাষ্ঠে ঝোলার অপেক্ষায় রয়েছেন, যদি না সুপ্রীম কোর্ট তার দণ্ডকে উল্টে দেয়।"

ড. মোজাম্মেল খান তাঁর প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এমনকি কাদেরের পরিবারের দেওয়া বিবরণেও তিনি ১৯৭২ সালে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে 'তার ডিপার্টমেন্টে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন' এ ধরনের কোনো দাবি নেই; বরং তিনি যে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন সে কথাই বলা হয়েছে। এমনকি তিনি যে কোনো ডিগ্রি পেয়েছেন সেটার কোনো উল্লেখ নেই।

তেমনিভাবে 'যুদ্ধের পুরো সময় তিনি গ্রামেই অবস্থান করেন' সে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সেটার কোনো উল্লেখ নেই। 'শেখ মুজিবুর রহমান তাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকরিও দিয়েছিলেন'সেটাও কাদেরের পরিবার উল্লেখ করেনি; অথচ 'আমার দেশ'এবং 'বাঁশের কেল্লা'রা চাঁদে সাঈদীর মুখচ্ছবি দর্শনের মতো করে ঠিকই 'সত্যের সন্ধান'পেয়ে গেছে!

জামাতিদের পক্ষ থেকে আরও ছড়ানো হয়েছে যে, কাদের মোল্লা নাকি 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' হওয়া 'গোল্ড মেডেলিস্ট' ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা মোটেই সে রকমের নয়। মোল্লার 'ভালো ছাত্রত্বের' গুমোর ফাঁস করে দিয়েছেন মোজাম্মেল খান তাঁর কলামে:

'এইচএসসির ফলাফলে কাদের গড়পড়তা ছাত্রের থেকে নিচে ছিল যার ফলে সরাসরি সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। সে রাজেন্দ্র কলেজেই বিএসসি পড়ে (১৯৬৬ -১৯৬৮) এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস কোর্সে এমএসসিতে ভর্তি হয় যেটা তার পরিবারের দেওয়া সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে; যদিও তার পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী সে এসএসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অথচ কাদের আমাদের সঙ্গে এইচএসসি পাস করেছে ১৯৬৬ সালে।

তাহলে এর মাঝে দুই বছরের বেশি সময় সে কী করেছে? তার পরিবার বলেছে সে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করে। এ বক্তব্যের প্রথম অংশটুকু সত্য নয় এবং যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন দুই বছরের এমএসসি ডিগ্রির জন্য ৮ বছর (১৯৬৯-১৯৭১, ১৯৭২-১৯৭৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করার হিসেব মেলানো যায় না।"

বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী অধ্যাপক মোজাম্মেল খান সেই একই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন যখন তিনি ১৯৭৯ সালে দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কীভাবে কাদের মোল্লার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল এবং কীভাবে সে উল্লসিত হয়ে মোজাম্মেল সাহেবকে বলেছিল 'জয় বাংলা'কে সরিয়ে 'জিন্দাবাদ' রাজত্ব করে চলেছে:

"১৯৭৩ সালের প্রথমার্ধে আমি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে আসি তখন জানতাম না কাদের কোথায় আছে। ১৯৭৯ সালে আমি দেশে বেড়াতে গেলে একদিন যখন ঢাকার মগবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি তখন পেছন থেকে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুই কি মোজাম্মেল? আমি কাদের।' আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'কাদের, তুই বেঁচে আছিস?' কাদেরের উত্তর ছিল, 'হ্যাঁ, আমি

ভালোভাবে বেঁচে আছি এবং এখন আমি দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক। তোর জয় বাংলা এখন এদেশ থেকে নির্বাসিত; ফিরে এসেছে আমাদের জিন্দাবাদ এবং এটা এখন প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত।'যেহেতু কাদের সত্য কথাই বলেছিল, সেহেতু আমি ওর কথার কোনো জবাব দিতে পারিনি।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাই তখন সংবাদপত্রে পড়লাম প্রেসক্লাবে একটি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিল কাদের মোল্লা; একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!"

মোজাম্মেল এইচ খান ইংরেজিতেও এ নিয়ে একটি লেখা লিখেছেন Quader Mollah: fact versus fiction শিরোনামে যেটা মুক্তমনা সাইটের ইংরেজি ব্লগে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. মোজাম্মেল এইচ খান কাদের মোল্লার ফাঁসির পর স্ট্যাটাসও দিয়েছিলেন, 'বিদায় এককালের সহপাঠী কাদের মোল্লা। তোমার এ পরিণতিতে আমি শোক করতে পারছি না' বলেঃ

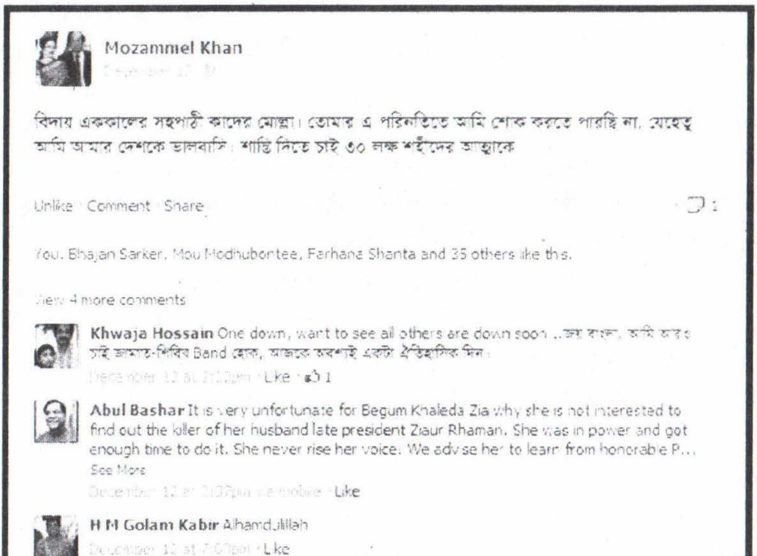

ছবি : মোজাম্মেল খানের ফেসবুক স্ট্যাটাস

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমরা এ লেখায় এখন পর্যন্ত মোমেনা বেগমের কথা আনিনি। এই নারী কাদের মোল্লার দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে চোখের সামনে মরতে দেখেছেন। বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকমে

প্রকাশিত তাঁর ভাষ্য থেকে জানা যায়, বেলা ডোবার আগে কাদের মোল্লার নেতৃত্বে মোমেনাদের বাড়িতে হামলা হয়। "আব্বা দৌঁড়াইয়া দৌঁড়াইয়া আসে এবং বলতে থাকে 'কাদের মোল্লা, মেরে ফেলবে'। আক্তার গুণ্ডা, বিহারিরা তারা ও পাক বাহিনীরা দৌঁড়াইয়া আসছিল। আব্বা ঘরে এসে দরজার খিল লাগায়ে দেয়।"

হযরত দরজা এঁটে সন্তানদের খাটের নিচে লুকাতে বলেন, মোমেনার সঙ্গে তার বোন আমেনা বেগমও খাটের নিচে ঢোকে। তখন দরজায় শোনেন কাদের মোল্লাসহ বিহারিদের কণ্ঠস্বর, 'এই হারামি বাচ্চা, দরজা খোল, বোম মার দেঙ্গা।' শুরুতে দরজা না খোলায় বাড়ির দরজার সামনে একটি বোমা ফাটানো হয়। এক পর্যায়ে হযরতের স্ত্রী একটি দা হাতে নিয়ে দরজা খোলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করা হয়।

"আব্বা তখন আম্মাকে ধরতে যায়। কাদের মোল্লা পেছন থেকে শার্টের কলার টেনে ধরে বলে, 'এই শুয়ারের বাচ্চা, এখন আর আওয়ামী লীগ করবি না? বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাবি না? মিছিল করবি না? জয় বাংলা বলবি না?' আব্বা হাতজোড় করে বলে, 'কাদের ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও'। আক্তার গুন্ডাকে বলল, 'আক্তার ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও'।" তবু না ছেড়ে হযরত আলীকে টেনে-হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় বিহারিরা।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এরপর কাঁদতে কাঁদতে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেন মোমেনা। "দাও দিয়ে আমার মাকে তারা জবাই করে। চাপাতি দিয়ে খোদেজাকে (বোন) জবাই করে। তাসলিমাকেও (বোন) জবাই করে। আমার একটি ভাই ছিল বাবু, বয়স ছিল দুই বছর, তাকে আছড়িয়ে মারে। বাবু মা মা করে চিৎকার করছিল," বলতে গিয়ে অঝোরে কাঁদেন মোমেনা।

বাবুর চিৎকার শুনে খাটের তলায় লুকানো আমেনা চিৎকার দিলে তার অবস্থান জেনে যায় হামলাকারীরা। মোমেনা বলেন, "আমেনাকে তারা টেনে বের করে, সব কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে। এরপর তাকে নির্যাতন করতে থাকে। আমেনা অনেক চিৎকার করছিল, একসময় চিৎকার থেমে যায়।"

কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অজ্ঞান মোমেনা এরপর শোনান নিজের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা।

মোমেনার সাক্ষ্য নিয়ে কম জল ঘোলা করেনি জামাতিরা। বলা হচ্ছে মোমেনা নাকি তিনবার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একেক জায়গায় নাকি তার একেক রকম বক্তব্য। তিনি নাকি মিরপুরের জল্লাদখানার জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে কাদের মোল্লার নাম ছিল না। তিনি নাকি বোরকা ও নেকাবে মুখ আবৃত করে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগুলো আসলে একেবারেই বানোয়াট প্রোপাগাণ্ডা। ব্লগার নিঝুম মজুমদার মুক্তমনায় প্রকাশিত দি কিউরিয়াস কেইস অব কাদের মোল্লা এবং সাক্ষী মোমেনা

প্রবন্ধে প্রতিটি যুক্তিই খণ্ডন করেছেন। পাঠকেরা প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

আসলে মোমেনা মূলত তার জীবনে একবারই সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর পিতা-মাতা আর ভাই-বোন হত্যা মামলায়। আর সারাজীবন যদি অন্য কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকেন তবে সেটি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি, হবার কথাও নয়।

মোমেনার যে জবানবন্দির কথা বলে জল ঘোলা করার চেষ্টা করা হয় যেটি তিনি মিরপুরের জল্লাদখানার জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন বলে 'বাঁশের কেল্লা'রা ক্রমাগতভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেটি কিন্তু মাননীয় আদালতের চোখে সম্পূর্ণভাবে অসাড় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। যে অভিযোগ আদালতে ধোপে টেকেনি, সেটা যদি 'কন্সপিরেসি থিওরি' হিসেবে কেউ ছড়িয়ে বেড়ায় তখন তার ঘাড়েই দায় বর্তায় সেটা প্রমাণ করার, আমাদের ওপর নয়।

নিঝুম মজুমদারের অনুসন্ধানী পোস্ট থেকে জানা যায়, 'কাদেরের আইনজীবী একটা কাগজ নিয়ে এসেছে ছবি ফরম্যাটে [ফটোস্ট্যাট] যাতে কোনো কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নেই, সাক্ষ্যদাতার স্বাক্ষর নেই, এটি কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটির ব্যাখ্যা নেই কিংবা বলতে পারেনি, এই বিচারের আইনের ধারা ৯, সাব সেকশন ৫-এর নিয়ম ফলো করা হয়নি, এটা কোনো স্বাক্ষ্য নয়।" [ট্রাইব্যুনাল-২ এর মামলার রায়, পৃষ্ঠা ১১৯, প্যারা ৩৯১-৩৯২ দ্র:]

আর কোনো জাদুঘরের সাক্ষাতকারে যদি মোমেনা কাদের মোল্লার নাম উল্লেখ না করে থাকেন কিংবা আদালতে যদি বোরকা পরে সাক্ষ্য দিতে এসে থাকেন তাতেই-বা কী সমস্যা ছিল? যে মানুষটি তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে চোখের সামনে নৃশংসভাবে খুন হতে দেখেছেন, যে ব্যক্তি গত বিয়াল্লিশটি বছর শোক-দুঃখ-হাহাকার নিয়ে বড় হয়েছেন, কাতর হয়েছেন অমানুষিক যন্ত্রণায়, তিনি কি নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রয়োজনমাফিক ব্যবস্থা নেবেন না? মোমেনা বেগম নিজ মুখেই তো বলেছেন যে, আদালতে সাক্ষ্যের আগে তিনি ভয় এবং নিরাপত্তার কারণে অনেক সময়ই নাম গোপন করে গেছেন:

"অনেক মানুষ আমার কাছে এসেছিল ও আমার ছবি নিয়েছিল; কিন্তু ভয়ের কারণে আমি কাউকে কাদের মোল্লা এবং আক্তার গুণ্ডার নাম বলি নাই।"

তাঁর ভয়ের ব্যাপারটা তো অমূলক নয়। জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস সম্বন্ধে কেউ তো অজ্ঞ নয়। সাঈদীর মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী গোলাম মোস্তফা নিহত হননি? তারা বোধহয় একই পরিণতি মোমেনা বেগমের জন্যও চেয়েছিল। সেটা বাস্তবায়িত না হওয়াতেই কি এত ক্ষোভ আর মিথ্যাচার?

আর এই মামলায় তো কেবল মোমেনা বেগম নয়, অনেক সাক্ষীই 'ক্যামেরা ট্রায়ালে' সাক্ষ্য দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এই জাতীয় ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো প্রচলিত রয়েছে, সে ধরনের নিয়ম মেনেই সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অথচ

হঠাৎ করেই মোমেনা বেগমের সাক্ষ্য কেন্দ্র করে গোয়েবলসীয় প্রচারণায় মেতে উঠেছেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মহল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেকেরই হয়তো জানা নেই– সাক্ষী নিয়ে বরং ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন কাদের মোল্লার পক্ষের আইনজীবীরাই। মোল্লার এক ভিকটিম পল্লবের ভাইয়ের স্ত্রী মোসাম্মৎ সায়েরাকে তারা হাত করতে চেষ্টা করেন, তাকে দিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলেছেন তিনি। (ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্যারা ১৮২-১৮৯ দ্রঃ)। মজা হচ্ছে এগুলো নিঁয়ে গোয়েবলস বাবাজি আর তার সাগরেদরা সব নিশ্চুপ।

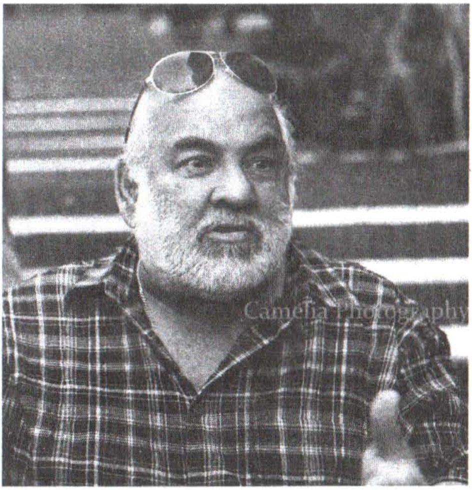

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, কেবল মোমেনা বেগম নয়, অনেকের সাক্ষ্য থেকেই জানা গেছে এই কাদের মোল্লাই আক্তার গুণ্ডা, নেহাল, হাক্কা গুণ্ডা যারা মীরপুরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল একাত্তরে– তাদের সহচর ছিল। এদের অনেকেই সরাসরি কাদেরকে নিজ চোখে শনাক্ত করেছিল। সেই চাক্ষুষ সাক্ষীর মধ্য থেকেই দু'জনের বয়ান উপরে এই লেখাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আছেন প্রধান সাক্ষী মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল হক মামা, যিনি আদালতে দাঁড়িয়ে কাদের মোল্লাকে শনাক্ত করেছিলেন। কাদের মোল্লার আসল-নকল নিয়ে প্রধান সাক্ষী শহিদুল হক মামা 'একাত্তর' টিভিতে ১৩.১২.২০১৩, ইউটিউব ভিডিও পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়ঃ http://www.youtube.com/watch?v=sGsTPnuHMPA

তারপরও বেশিরভাগ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, জামাত-সমর্থক গোষ্ঠীর ধারণা কাদের নির্দোষ ভালো মানুষ। কিছু “বিকৃত তথ্য” এবং তার সঙ্গে একগাদা নির্জলা ‘মিথ্যাচার’ জড়িয়ে সারাদিন এরা করে যাচ্ছে ধর্মব্যবসা। গোয়েবলসীয় কায়দায় তারা বলেই চলেছে কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের নাকি এক নয়। যারা এখনও বলে, কসাই কাদের আর মোল্লা কাদের এক নয়, তাদের কাছে আমাদের একটাই প্রশ্ন–

‘কসাই কাদের’টা তাইলে গেল কোথায়? রাতারাতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি?

আমরা মনে করি, কাদের আর কসাই একই লোক সেটা আদালতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে আর শাস্তিও দেওয়া হয়েছে, আমাদের নতুন করে আর কিছু প্রমাণের নেই। ‘বার্ডেন অব প্রুফ’টা তাদের কাঁধেই যারা মনে করেন দুই কাদের ভিন্ন ব্যক্তি। আমরা মনে করি, তারা সেটা প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে মোমেনার মতো চাক্ষুষ সাক্ষীরাই যথেষ্ট যাদের পরিবার কাদের মোল্লার হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। তাকে চিনতেন তার বন্ধু এবং সহপাঠীরাও, যেমন ড. মোজাম্মেল এইচ খানের মতো ব্যক্তিরা।

বিপরীত পক্ষ বরাবরই সেগুলো অস্বীকার করে ‘বাঁশের কেল্লার গোলাম মওলা রনির মতো লোকজনের কথাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। আসুন দেখি কতটা নির্ভরযোগ্য এই গোলাম মাওলা রনি, যে সরকার দলীয় সাংসদ অতীতে সাংবাদিক পেটানোসহ বহু কারণেই বিতর্কিত হয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়েছিলেন।

কাদের মোল্লার ফাঁসির আগ মুহূর্তে তিনি একটি চিরকুট প্রকাশ করেন ফেসবুকে এবং দাবি করলেন রনির সঙ্গে মোল্লা সাহেবের কারাগারে সাক্ষাত হয়েছিল এবং সেই সুবাদে মোল্লা রনিকে একটা চিঠি দেন, সেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে কাদের মোল্লার ‘একটু উস্তাভাজি খাওয়ার’ বাসনা ছিল আর মোল্লা নাকি রনিকে এও অনুরোধ করে বলেছিলেন, ‘আমার ফাঁসির পর একবার হলেও বল বা লিখ যে, কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের এক ব্যক্তি নয়’। এই সেই চিঠি:

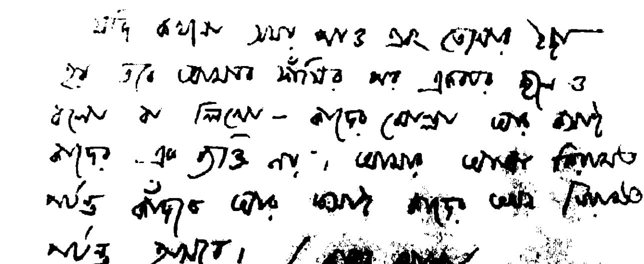

এই চিঠি পুঁজি করেই সহানুভূতির বাণিজ্য শুরু করেছিলেন গোলাম মওলা রনি ফেসবুকে। গোলাম শুরু করেছিলেন কাদেরের গোলামী।

কিন্তু আমরা যখন এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম তখন বেরিয়ে এল অন্য তথ্য, বিশেষ করে যখন কাদের মোল্লার স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি অনলাইনে প্রকাশিত হয়ে যায়:

স্ত্রীকে লেখা মোল্লার চিঠি

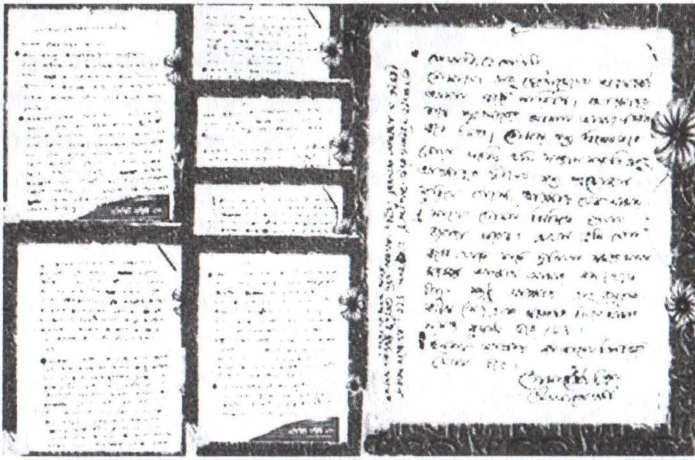

ব্যাপারটা কি লক্ষ্য করেছেন পাঠক?

পাঠকদের সুবিধার জন্য দুটো ছবি একসঙ্গে দেওয়া গেল। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়':

দুটো চিঠিতে হাতের লেখার পার্থক্য স্পষ্ট

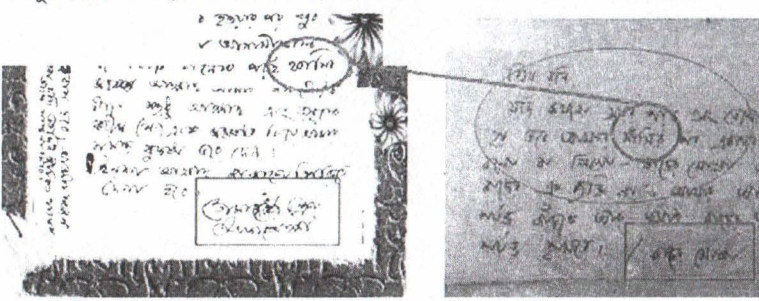

গোলাম মওলা রনি সাহেবের যে ফেসবুক স্ট্যাটাসটা নিয়ে এত চেঁচামেচি, এখন তো থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে; সেই চিরকুটের সিগনেচার আর কাদের মোল্লার পরিবারের কাছে লেখা চিঠির সিগনেচার ভিন্ন!

কাদের মোল্লার ব্যাপারে ছড়ানো আরও কিছু অপপ্রচারের কথা বলে নেই। বলা হচ্ছে কাদের মোল্লা যুদ্ধাপরাধী হলে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজের সিনিয়র শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারলেন এবং কি করে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে ২বার সাংবাদিকদের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন? তখনকার সব রিপোর্টার কি জামাত শিবির ছিলেন যে তাকে নির্বাচিত করলেন? এছাড়া বলা হচ্ছে কি করে তিনি ১৯৭২ সালের শেষের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদুলাহ হলের আবাসিক ছাত্র হিসাবে হলে অবস্থান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়ন অব্যাহত রাখতে পারলেন?

এক খোঁচায় এর উত্তর দেয়া যায়; ১৯৭৭ সালে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন রাজাকার, কেবিনেটে ছিলো ১৮ জন রাজাকার এমপি, ৫-৬ জন রাজাকার মন্ত্রী। সেখানে উদয়ন, রাইফেলসে কাজ করা এমনকি অসম্ভব কাজ... আরে প্রধানমন্ত্রী রাজাকার হলে সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হওয়া মোটেও অবাস্তব ব্যাপার নয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে যে কথা বলা হচ্ছে তা সত্য নয়। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে কাদের মোল্লা মোটেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না। কাদের রাজেন্দ্র কলেজেই বিএসসি পড়ে (১৯৬৬-১৯৬৮)। তার পরিবার বলেছে সে ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস কোর্সে এমএসসিতে ভর্তি হয়, স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করে।

এ বক্তব্যের প্রথম অংশটুকু সত্য নয় এবং যে কোন পাঠকই বুঝতে পারবেন দুই বছরের এমএসসি ডিগ্রীর জন্য ৮ বছর (১৯৬৯-১৯৭১, ১৯৭২-১৯৭৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করার হিসাব মেলানো যায় না। পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী সে এসএসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল পড়তে, কিন্তু আসল কাহিনী হল কাদের মোল্লার এইচএসসি পরীক্ষার ফল গড়পড়তা ছাত্রের থেকে অনেক নিচে ছিল যার ফলে সরাসরি সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। তার সহপাঠী মোজাম্মেল খানই তা ফাঁস করে দিয়েছেন। অথচ ছাগ-বান্ধব সাইটে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তিনি নাকি 'গোল্ড মেডেলিস্ট ছাত্র' ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের পর কাদের আত্মগোপন করে এবং ১৯৭৬ সালে সে আত্মগোপনতা থেকে বেরিয়ে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তি হয় এবং ১৯৭৭ অবধি সে ছাত্র ছিল। আরও বিস্তারিত জানতে মুক্তমনা থেকে পড়ুন– মোজাম্মেল এইচ খানের Quader Mollah: fact versus fiction প্রবন্ধটি।

লেখাটি শেষ করার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই। এই ট্রাইব্যুনাল যদি স্বচ্ছ না হয়, যদি কাদের সত্যই মনে করে যে তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, তাহলে ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ের পর কসাই কাদের

কেন দুই আঙুল দিয়ে জয়সূচক 'ভিক্টরি চিহ্ন'দেখিয়েছিল? যে ট্রাইব্যুনাল স্বচ্ছ নয়, নিরপেক্ষ নয়, আন্তর্জাতিক নয়– সেই ট্রাইব্যুনালে প্রথম রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়ার পরেও কেন কাদের নিজেকে জয়ী মনে করল?

যদি সে সত্যিই কসাই কাদের না হয়, কস্মিনকালেও যদি মিরপুরে না গিয়ে থাকে, একটি মানুষও হত্যা না করে থাকে, তবে কতবড় পাগল হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাবার পরেও হাত তুলে নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে? হিসেবটা কি মেলে?

আশা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি বিভ্রান্তি দূর করে হিসেবগুলো মেলাতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।

(এই নিবন্ধটিতে আমার সহ লেখক ছিলেন ড. অভিজিৎ রায়। নিবন্ধটি বিডিনিউজ২৪.কমে প্রকাশিত হয়েছিল।)

‘ভাষাসৈনিক গোলাম আযম’: একটি গোয়েবলসীয় প্রচারণার ব্যবচ্ছেদ

২১ শে ফেব্রুয়ারি। আমাদের আবেগের দিন, আমাদের গর্বের দিন। এদিন আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সালাম, রফিক, বরকত সহ সকল শহিদের আত্মত্যাগকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আবদুল মতিন, গাজীউল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, কামাল লোহানী প্রমুখ ভাষা সৈনিকদের অবদানকে। আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করি, পুষ্পমন্ডিত করে তুলি আমাদের প্রাণপ্রিয় শহিদ মিনারকে। কিন্তু এমন দিন এলেই আপনি যদি শোনেন এক কুখ্যাত রাজাকার, যার একাত্তরে কৃতকর্মের জন্য, তার মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নব্বই বছরের সাজা দিয়েছে মাননীয় আদালত, এমন একজন লোক ‘ভাষা সৈনিক’ সাজতে চাইছে, কেমন লাগবে শুনতে?

সেটাই কিন্তু করা হচ্ছে। এ প্রচারণা শুরু হয়েছিল সম্ভবত নব্বইয়ের দশকে। হঠাৎ করেই দেখা গেলো কিছু নামগোত্রহীন পত্রিকায় আসতে শুরু করল ‘ভাষা সৈনিক’ হিসেবে গোলাম আযমের নাম। ঢাকার দেওয়াল টেওয়ালেও জামাত শিবিরের কিছু শোগান দেখা যেতে শুরু করল– ‘ভাষাসৈনিক গোলাম আযম’। প্রথম দিকে কেউ তেমন গা করেনি। কিন্তু পরে যত দিন গেছে ততই গোয়েবলসীয় কায়দায় জাঁকিয়ে বসেছে এই প্রচারণা।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক :

“...ভাষা আন্দোলননিয়ে আজ যারা বড় বড় কথা বলছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন আবুল কাশেম ও অধ্যাপক গোলাম আযম।। প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর সামনে সাহস করে বাংলাকে রাষ্ট্র করার দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন গোলাম আযম । অথচ, ইতিহাস থেকে পরবর্তীতে তার নামটি মুছে ফেলা হয়েছে। দেশের বুদ্ধিজীবীরা তো অন্তত বলতে পারেন” লোকটা খারাপ, তবে এ ভাল কাজটা ভালো করেছে (ভাষা আন্দোলন)। গোলাম আযমকে গালি দিয়ে হলেও তো তারা কথাটি বলতে পারেন। অথচ, আজ ইতিহাস বিকৃত করে নতুন নতুন ভাষা সৈনিক সৃষ্টি করা হচ্ছে...”

(জনকণ্ঠ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১)

কথা গুলো বলছিলেন জামায়াতের আমীর মকবুল আহমাদ, জামায়াত আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে। জামাতের আমীরের এই বক্তব্য ছাড়াও প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সারা শহর ছেয়ে যায় নিচের পোস্টারের মত ভয়ঙ্কর পোষ্টারে।

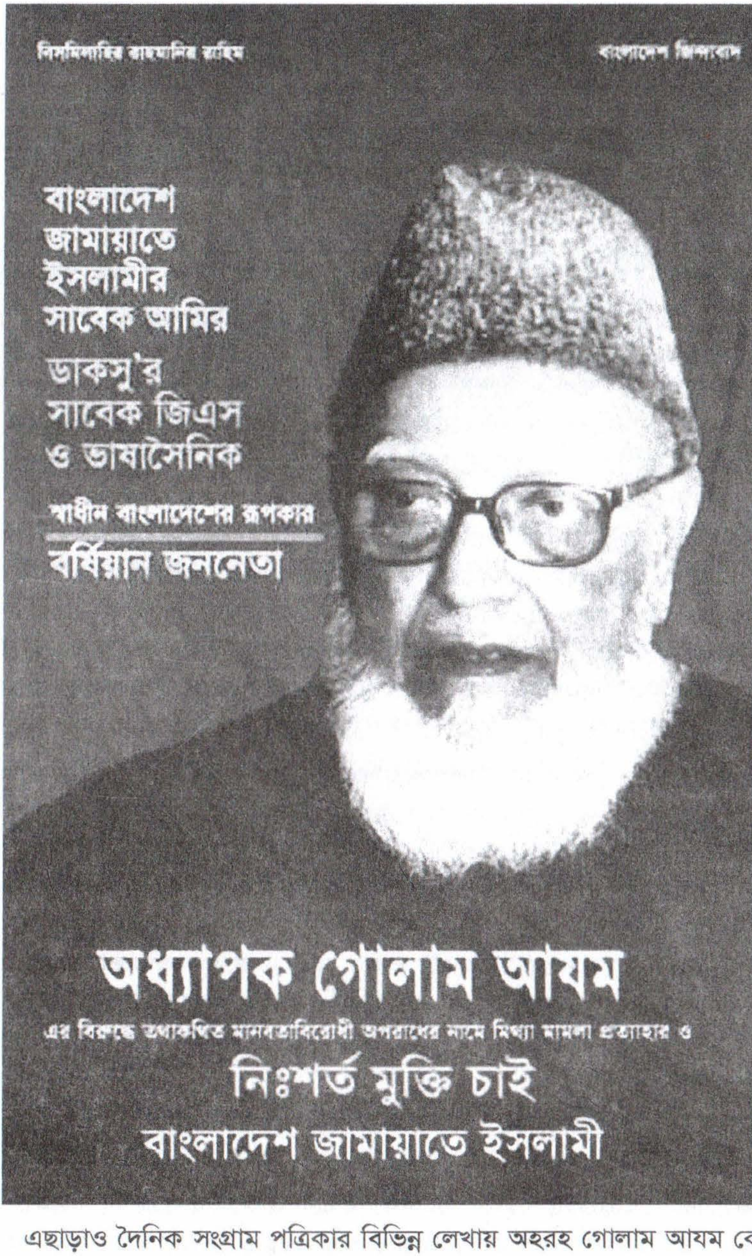

এছাড়াও দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় অহরহ গোলাম আযম কে ভাষা সৈনিক দাবী করা হয়। তারই একটি উদাহরণ,

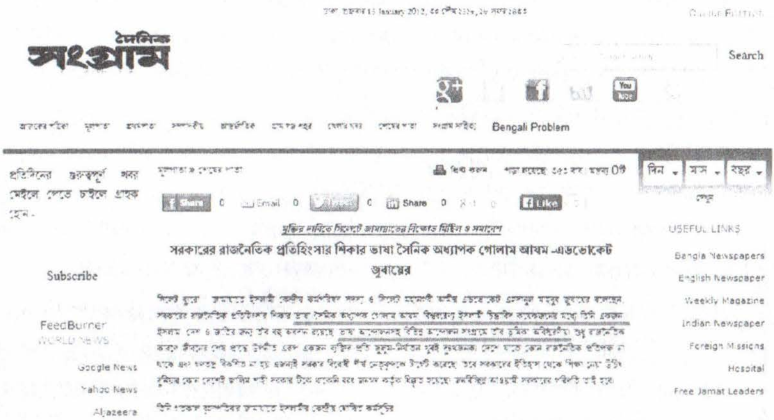

গোলাম আজমের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও তাকে ভাষা সৈনিক দাবী করা হয়েছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে,

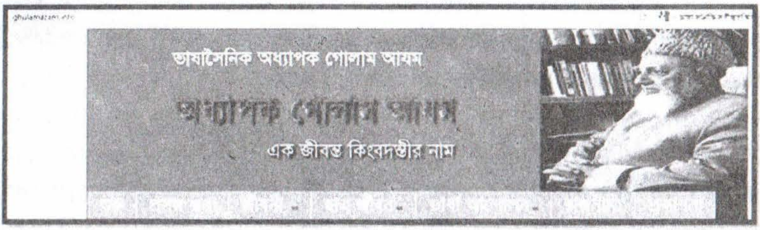

এছাড়াও জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের ওয়েবেও পাওয়া গেলো একই উচ্চারণ,

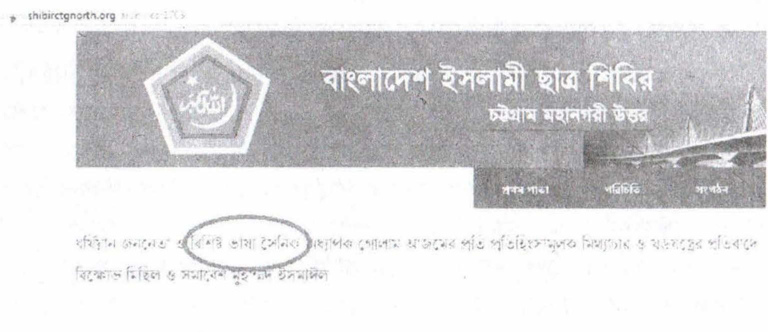

১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী'র আমীর এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড গোলাম আযমকে নিয়ে বরাবরই বিভিন্ন প্রোপ্যাগান্ডা শোনা যায় তার সমর্থকগোষ্ঠীর মুখে। এর মধ্যে সবচেয়ে রসালো প্রচারণাটি হচ্ছে গোলাম

আযমকে ভাষা সৈনিক প্রমাণ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। ফেব্রুয়ারি এলেই এই ইস্যু নিয়ে শুরু হয় নানা রকম রকমারি বাণিজ্য। আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য থাকবে সমস্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখা দাবীটির সত্যতা কতটুকু, এবং এই বিষয় নিয়ে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করার বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস।

প্রথমে উপরে দেয়া ছবিগুলোর দিকে তাকানো যাক। উপরের ছবি গুলো থেকে একটা কথা তো পরিষ্কার যে জামাত-শিবির এবং তাদের ঘরনার মিডিয়া গুলো প্রকাশ্যে প্রচার করে আসছে গোলাম আযম ভাষা সৈনিক। এখন দেখা যাক ভাষা আন্দোলনে গোলাম আযম কি কি অবদান রেখেছেন বলে দাবী করা হচ্ছে।

প্রথমেই আমরা দেখি গোলাম আযমের নিজের জবানী। তার আত্মজীবনী "জীবনে যা দেখলাম" বইটি ঘেঁটে পাওয়া গেলো ভাষা আন্দোলনে তার অবদান নিয়ে বিশাল এক ফিরিস্তি। তিন খণ্ডের বইটির প্রথম খণ্ডের একাধিক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে।

বিস্তারিত পড়ে জানা গেলো ১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি মানপত্র পাঠ করে। ঐ মানপত্রে বাংলা ভাষা নিয়েও কিছু দাবী জানানো হয়। এ মানপত্রটি পাঠ করেন ইউনিয়নের তৎকালীন সেক্রেটারি গোলাম আযম। যদিও এটি পাঠ করার কথা ছিল ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ বোসের। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে ভাষা আন্দোলনের দাবি সংবলিত মানপত্র পাঠ একজন হিন্দু ছাত্রকে দিয়ে করালে তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এবং মুসলিম লীগ সরকার এ নিয়ে নানা প্রকার বিরূপ প্রচার শুরু করবে, এ আশংকা থেকেই একজন মুসলমান ছাত্র হিসেবে সেক্রেটারি গোলাম আযমকে সেটা পাঠ করতে দেয়া হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে অগ্রগণ্য ভাষা সৈনিক কামাল লোহানী বলেন,

'গোলাম আযম ভাষা সৈনিক ছিলেন না। কখনই ছিলেন না। স্বাধীনতা বিরোধীরা তাকে ওটা বানাতে চেয়েছে। এই অপপ্রচারের একটি লাগসই জবাব ভাষা মতীন ভাই দিয়েছেন এভাবে। গোলাম আজমের পিঠে চড়ে আমার তখন ভাষার দাবির পোষ্টার দেয়ালে লাগিয়েছি। আসল ঘটনা হলো গোলাম আজম তখন ডাকসুর জিএস ছিলেন। অরবিন্দ নামে একজন ভিপি। ঢাকায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। ডাকসু থেকে বাংলা ভাষার দাবিতে তাকে একটা স্মারকলিপি দেওয়া হবে। কৌশলগত কারণে অরবিন্দকে বাদ দিয়ে গোলাম আজমকে দিয়ে স্মারকলিপিটি লিয়াকত আলী খানকে দেওয়া হয়েছিলো। এটুকুই তার ইতিহাস। তারপর আর গোলাম আজম ভাষার লড়াইয়ের ইতিহাসে নেই'।

অথচ, গোলাম আযম তার বইয়ে লিখেছেন,

(পাঠক লাল কালিতে আন্ডারলাইন করা জায়গা গুলোর কথা খেয়াল রাখবেন, আমরা পরবর্তীতে এ নিয়ে আলোচনা করবো।)

> '৪৮-এর ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করার জন্য একটি মেমোরেন্ডাম রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি আব্দুর রহমান চৌধুরীর উপর। তিনি [illegible] হিসেবে সুপরিচিত [illegible] ছিলেন। একটি কমিটি স্মারকলিপিটি চূড়ান্ত করে
>
> ইউনিভার্সিটি ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ [illegible] হোসেন তখন বিদেশে থাকায় ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর জনাব [illegible] আহমদকে সভাপতিত্ব করতে হয়। [illegible] বাংলা এ কে ফজলুল হকের পর তিনি [illegible] হয়েছিলেন
>
> ছাত্র মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর সামনে মেমোরেন্ডামটি কে পাঠ করে শোনাবে এ নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলো। ছাত্র ইউনিয়নের ভিপির উপরই এ দায়িত্ব দেওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু স্মারকলিপিতে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক দাবি-দাওয়ার অন্যতম হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ থাকায় সবাই একমত হলো যে, ঐ পরিস্থিতিতে একজন হিন্দুর হাতে প্রধানমন্ত্রীকে তা পেশ করা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ মুসলিম লীগ সরকার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পেছনে হিন্দুদের হাত আবিষ্কার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হিসেবে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ছাত্র ইউনিয়নের জিএস গোলাম আযমকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এর পর বইটিতে গোলাম আযমের মেমোরেন্ডাম পড়ে শোনানোর রগরগে বিবরণ...

এবার আপনাদের কাছে তুলে ধরছি সেই ঐতিহাসিক (!) মানপত্রের মূল কপিটির ভাষা সংক্রান্ত অংশ,

> যা পড়া হলো তাতে খুশি হয়ে প্রধানমন্ত্রী টেবিলে হাত চাপড়ালেন। চমৎকার ইংরেজিতে রচিত স্মারকলিপিতে ধীরগতিতে এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করে পড়ে শুনাচ্ছিলাম
>
> বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে লেখা প্যারাটি যখন পাঠ করলাম তখন সমাবেশের সবাই হাততালি দিয়ে জোর সমর্থন জানালেন। হাততালি দীর্ঘস্থায়ী করার সুযোগ দেবার জন্য আমি থামলাম। পেছন থেকে বেগম রানার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উর্দুতে কণ্ঠে বললেন, "[illegible]"। ভাষার বিষয়ে স্পষ্ট করে বলে দেবে।
>
> আবার পড়া শুরু করলাম। ভাষার দাবি সংক্রান্ত প্যারাটি আরও বলিষ্ঠকণ্ঠে দুবার পড়ে শুনালাম। সমাবেশে হাততালি আরও জোরে চললো এবং অনেকেই দাঁড়িয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করলো। হাততালি থেমে যাবার পর আবার দীর্ঘ মেমোরেন্ডামের বাকি অংশ পড়ে শুনালাম
>
> আয়নায় বাঁধাই করা ফ্রেমে স্মারকলিপিটি ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তিনি আমার সাথে হাত মিলিয়ে নীরবে তা গ্রহণ করলেন

We are happy to note that out Central Government, under your wise guidance, has given Bengali an honoured place. This is a step in the right direction which shall go a long way to further strengthen our cultural ties, with our brethren in West Pakistan. Interchange of thoughts and ideas and mutual understanding are essential if we have to develop a homogeneous and healthy national outlook. We have accepted Urdu as our Lingua Franca but we also feel very strongly that, Bengali by virtue of its being the official language of the premier province and also the language of the 62% of the population of the state should be given its rightful place as one of the state languages together with Urdu....

পাঠক লক্ষ্য করবেন এখানে কোন বলিষ্ঠ দাবী রাখা হয়নি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য। কোন রকমে দায়সারা ভাবে বাংলার কথা এসেছে। উর্দুকে আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যম হিসেবে (Lingua Franca) মেনে নেয়ার কথা এসেছে, আবার একথাও

বলা হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী' নাকি বাংলাকে সম্মানজনক অবস্থান দিয়েছেন অথচ বাংলাকে ওই মানপত্রে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিই জানানো হয়নি। কেবল করা হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারি কাজকর্মের ভাষা করার। আর তাই প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তব্যে বিষয়টি নিয়ে কিছুই বলেননি (তার স্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও)। গোলাম আযমের ভাষায়,

> আমি এ মানসিক অস্থিরতায় ভাষা বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম প্রধানমন্ত্রীর সুর বদলে গেছে তিনি অন্যান্য দাবি সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে লাগলেন। ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেবার পরামর্শ দিলেন জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য হবার আহবান জানালেন, কিন্তু ভাষা সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। তিনি বলতে পারতেন যে, একা আমার পক্ষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সম্ভব নয়, গণপরিষদ বা পার্লামেন্টই সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি সমাবেশের অবস্থা বিবেচনা করেই হয়তো ভাষার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া সমীচীন মনে করেননি। আমরা তার বক্তৃতায় সন্তুষ্ট না হলেও প্রতিবাদ করার মতো সুযোগও পেলাম না। একজন চতুর নেতা হিসেবে তিনি পরিস্থিতি সামলে নিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, গোলাম আযম এমনি বক্তব্য দিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী তার সব দাবিদাওয়া সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করলেন। তার বক্তব্য শুনে খুশীতে টেবিল চাপড়ে দিলেন আর ভাষার ব্যাপারে কিছুই বললেন না !!!

এবার আসুন একটু বিশেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখি কয়েকটি পয়েন্ট, গোলাম আযম তার একই আত্মজীবনীতে অনেকবার বাংলা ভাষা নিয়ে আক্রমণাত্মক, বিদ্রুপাত্মক এবং প্রচণ্ড বিদ্বেষ মূলক মন্তব্য করেছে। নিচে তার থেকে অল্প কয়েকটি উল্লেখ করা হলো,

বাংলা ভাষায় আপনি, তুই, তুমি এসবের জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যাপারটা গোলাম আযমের পছন্দ হয়নি; তিনি এটাকে চিহ্নিত করেছেন 'বিরাট সমস্যা' হিসেবে–

> বাংলায় তো আপনি, তুমি ও তুই-এর বিরাট সমস্যা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, নিজেকে ভাষা সৈনিক দাবী করলেও আপন নাতী-নাতনীদের কিন্তু তিনি বাংলা শিক্ষা দেননি; অবশ্য এ নিয়ে কিছুটা 'মেকি আপসোস'ও আছে তার–

> আমার আফসোস যে বিদেশে পড়ুয়া আমার নাতি-নাতনীরা বাংলা সাহিত্য পড়ার অযোগ্য হয়ে থাকলো।

কেউ হয়ত বলতে পারেন নাতি নাতনীদের বাংলা শিক্ষা না দেয়া নানা কিংবা দাদার অপরাধ হতে পারে না। কিন্তু নানা কিংবা দাদাটি যখন নিজেকে অগ্রগণ্য ভাষা সৈনিক দাবী করেন এবং সেই দাবীকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হন তখন তাঁর ক্ষেত্রে নিজের নাতি-নাতনিকে ভাষা শিক্ষা না দেয়াটা একটা অপরাধই বলা চলে। কারণ একজন ভাসা সৈনিক যিনি নিজে ভাষার জন্য জীবন দিতে চাইলেন। জীবন গেলেও যিনি বিদেশী ভাষায় কথা বলবেন না, তার বংশধরদের ভেতর যদি সেই চেতনা নাই পৌছায় তখন বুঝতে হয় সেই চেতনায় গণ্ডগোল আছে।

গোলাম আযমের জীবনীটি এই নিবন্ধটি লেখার আগে আমি একাধিকবার খুবই মনোযোগ দিয়ে পরেছি। তার ঐ জীবনীটির একটা অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে গোলামকে ভাষা সৈনিক প্রমাণ করা। আর তাই খুব সু-কৌশলে বাংলা ভাষার প্রসংসায় ভরা বইটি। বাংলা ভাষারর বিরুদ্ধে যায় এমন একটি বাক্যও এই বইতে পাওয়া অস্বাভাবিক। তারপরেও এই বইতেই যখন পাওয়া যায় 'বাংলাতে আপনি তুমি তুই একটা বিরাট সমস্যা' তখন এটা কি একটা স্ব-বিরোধী উক্তি হিসেবে বাঙলা নিয়ে তার মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ নয়।

তারপর একই ভাবে গোলাম যখন বলে সে ভাষা সৈনিক, শরৎচন্দ্র তার পছন্দের লেখক আবার এই একই মুখে সে বলেছে তার ছেলের বউরা হিজাব করে চলে, নাতি-নাতনিরা নামাজ পড়ে, এবং এসব অভ্যাস এসেছে তার (গোলাম আযমের) কারণেই। তখন স্বাভাবিক ভাবেই কি প্রশ্ন আসে না, বাংলা যখন তার এতই ভালোবাসার তখন নাতি নাতনীদের নামাজ শিক্ষা দানের সাথে সাথে বাংলা শিক্ষা দিলেন না কেনো?

এছাড়া বিভিন্ন খ্যাতিমান বাংলাভাষী সাহিত্যিকদের প্রতি তিনি ছড়িয়েছেন চরম বিদ্বেষ; বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজের বইয়ে 'ইসলাম বিদ্বেষী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও তার অনেক জ্বালা। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে' ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি ছিলেন স্রেফ 'পৌত্তলিক হিন্দু' ইত্যাদি; তাই 'বাঙালি জাতীয়তায়' বিশ্বাসীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণযোগ্য হলেও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের কাছে তিনি হবেন সর্বদাই পরিত্যাজ্য:

> রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে যে মুসলিম বিদ্বেষ রয়েছে তা হিন্দু হিসেবে তার ভারতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তার পিতার ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। তাই যারা বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী তারা তাকে জাতীয় কবি মানতে পারে; বাংলাদেশী জাতীয়তায় বিশ্বাসীরা তা করে না।

বাংলা এবং বাঙালি জাতি নিয়ে বিদ্বেষ তার পরবর্তীকালের অনেক উক্তিতেই পাওয়া যাবে। যেমন ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বলেছিলেন, 'জয় বাংলা শে-াগান ইসলাম ও পাকিস্তানবিরোধী'। তিনি সেসময় আরো বলেছিলেন, 'বাঙালিরা কখনো জাতি ছিল না' (দৈনিক পাকিস্তান, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭০)। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই যার বাংলা ভাষা আর বাঙালি জাতির প্রতি এতো প্রেমের নমুনা,তিনি কেনইবা প্রধানমন্ত্রীর সামনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবী করলেন।

আমাদের বুঝতে হবে সেদিনের ঘটনাপ্রবাহ।

তিনি নিজেই বলেছেন তিনি সে সময়ের অনির্বাচিত জি এস ছিলেন, এবং মানপত্রটা পড়ার বিষয়টি ছিলো একটা আকস্মিকঘটনা মাত্র। এমনকি, তিনি সেই মানপত্র নিজে লিখেননি, লিখেছিলেন তৎকালীন সলিমুলাহ মুসলিম হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরী তারপর একটি কমিটি স্মারকলিপিটি চূড়ান্ত করে। সেদিন

সেইদিন স্মারকলিপি পাঠ করা ছাড়া তার কাছে আর কোন রাস্তা ছিলো না। যদি সেদিন তিনিস্মারকলিপি পাঠ করা থেকে বিরত থাকতেন, কিংবা অনাগ্রহী হতেন তাহলে সাধারণ ছাত্রদের হাত থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারতো না। কারণ ছাত্ররা তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর ওপর মারাত্মক বিরক্ত ছিলো। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, সেই বছরের মার্চেই কায়েদে আজম কার্জনে যখন বলে ওঠেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" তখনই সেখানকার ছাত্ররা "না না" বলে প্রতিবাদ করে ওঠে। ধীরে ধীরে এটা হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের দাবী। কাজেই ছাত্রদের জনপ্রিয় দাবী অস্বীকার করা কিংবা এড়িয়ে যাবার মতো সাহস বা সুযোগ কোনটাই গোলাম আযমের সেদিন ছিল না।

আর তাই ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে গোলাম আযম যতটা সম্ভব বাধ্য হয়েই 'যথেষ্ট নম্র ভাষায়'এই দাবী প্রকাশ করেছিলেন, যদিও উর্দুকেই মনে প্রাণেরাষ্ট্র ভাষা মনে করতেন গোলাম আযম। তিনি ভাষা সৈনিক মোটেই নন। সে সময়কার ঘটনা বিশে-ষণ করতে গিয়ে আব্দুল গাফফার চৌধুরী তার একটি সাম্প্রতিক কলামে বলেছেন–

'১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার আগে পর্যন্ত ১৫ মার্চ ছিল ভাষা আন্দোলন দিবস। এই আন্দোলনে কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ সকলকেই গ্রেফতার বরণ করতে হয়েছে। আবদুল মতিনকে হুলিয়া মাথায় করে আন্ডারগ্রাউন্ডেও পালিয়ে থাকতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ভাষার দাবির স্মারকলিপি নিয়ে গিয়েছিলেন সলিমুলাহ হলের ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরী (পরে বিচারপতি হয়েছিলেন)। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের এই প্রথম পর্যায়েও গোলাম আযমকে কোথাও দেখা যায়নি। তাকে গ্রেফতার হতে হয়নি। ভাষা আন্দোলনকারীদের সচিবালয় ঘেরাও বা রাজপথের মিছিলেও গোলাম আযমকে দেখা যায়নি। ১৫ মার্চের ভাষা দিবস উদযাপনের কোনো বছরের সভায় তাকে দেখা যায়নি। ভাষাসংগ্রাম কমিটিতেও (কেন্দ্রীয় অথবা ছাত্র কমিটি) তার নাম দেখা যায় না। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আরোপিত ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য ভাষা আন্দোলন-সংযুক্ত প্রবীণ ও নবীন নেতাদের কোনো গোপন ও প্রকাশ্য সভাতেই তাকে অংশ নিতে দেখা যায়নি। তাহলে তিনি ভাষাসৈনিক হলেন কীভাবে? কেবল ১৯৪৮ সালে লিয়াকত আলীর ঢাকা সফরের সময় এক্সিডেন্টলি একটি মানপত্র পাঠ দ্বারা ভাষাসংগ্রামী, ভাষাসৈনিক হয়ে গেলেন? ইতিহাস বিকৃতি এবং মিথ্যা দাবি করারও একটা সীমা থাকা দরকার'।

এখন উপরের আলোচনা থেকে তাহলে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে আসার মতো জায়গায় পৌঁছুতে পারছি এখন–

১) প্রধানমন্ত্রীর সামনে পাঠ করা মনপত্রটি গোলাম আযম নিজের হাতে লেখেন নি।

২) তার ভাষায়, এই মানপত্র পাঠ করা ছিলো একটা আকস্মিক ব্যাপার এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এই মানপত্র তার নিজের পড়ার কথা না, এটা তিনি একটা বিশেষ "সিচুয়েশনে" পড়েছিলেন মাত্র।

৩) মানপত্রটি পাঠ করার কথা ছিলো ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ বোসের।

৪) তার আগেই (মার্চেই) জিন্নার সামনে ছাত্ররা ভাষার দাবীতে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায়।

৫) গোলাম আযম ভাষার প্রশ্নে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি, ফলে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

৬) বাংলাকে ওই মানপত্রে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়নি। দাবী করা হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারি কাজকর্মের ভাষা করার।

সব শেষে আমরা দেখবো ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়গুলোতে গোলাম আযমের ভূমিকা।

১৯৭০ সালের ২০ জুন একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায়।

"বাংলা ভাষার আন্দোলন করা ভুল হইয়াছে" শিরোনামের সেই লেখায়গোলাম আযমের বক্তব্য প্রকাশিতহয়। সেই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, "বাংলা ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই সঠিক কাজ হয়নি।" (দৈনিক আজাদ, ২০ জুন, ১৯৭০)

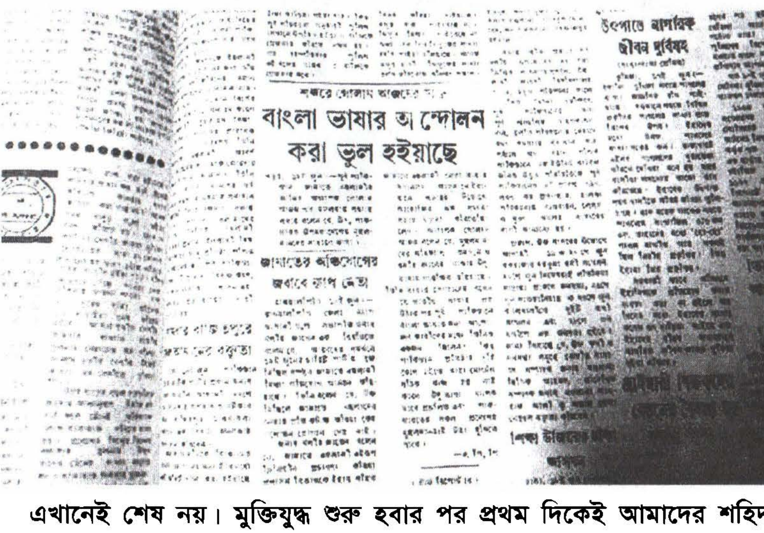
বাংলা ভাষার আন্দোলন করা ভুল হইয়াছে

এখানেই শেষ নয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর প্রথম দিকেই আমাদের শহিদ মিনারটি গুঁড়িয়ে দেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। সেটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন

আমাদের 'ভাষা সৈনিক' গোলাম আযম। তার বরাত দিয়ে মুখপাত্র দৈনিক সংগ্রাম খবর প্রকাশ করে ১৬ জুলাই।

"ইতিহাস কথা বলে" সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল আইয়ুব খানের গভর্নর আজম খান ছাত্রদের খুশী করার জন্য যে শহিদ মিনার তৈরি করলেন তাকে পূজামণ্ডপ বলা যেতে পারে কিন্তু মিনার কিছুতেই না। যাহোক সেনাবাহিনী সেই কুখ্যাত মিনারটি ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ গড়ে শহিদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন জেনে দেশবাসী খুশী হয়েছে। (দৈনিক সংগ্রাম ১৬ জুলাই, ১৯৭১)

তারপরেও অনেকে বলতে পারে ভাষার প্রশ্নে যে আন্দোলন হয়েছিল সেখানে তার অবদান পজেটিভ ছিলো।এই লেখাটা শুরু করার সময় আমার কাছে একটাই মূল উপাদান ছিলো। শুক্কুরের ঐ সমাবেশের পর বের হওয়া দৈনিক আজাদের কপি গোলাম যেখানে বলে, "বাংলা ভাষার আন্দোলন করা ভুল হইয়াছে" এই একটা ডকুমেন্টই যথেষ্ট গোলাম যে ভাষা সৈনিক না সেটা প্রমাণ করার জন্য।

একবার ভাবুন তো কোন মুক্তিযোদ্ধা যিনি সদম্ভে যুদ্ধ করেছেন এরপর আবার সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছে

"মুক্তিযুদ্ধ করা ভুল হইয়াছিলো বটে, তবে আমি কিন্তু ভাই মুক্তিযোদ্ধা"

কোন মুক্তিযোদ্ধা যদি নিজেই স্বীকার করে যে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ভুল করেছিল তবে তাকে অস্বীকৃতির পর আর মুক্তিযোদ্ধা বলা যায় না। সে সৎ হয়ে থাকলে এরপর নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন প্রিভিলেজ নেবে না, মুক্তিযোদ্ধা তালিকা থেকেও নাম কাটিয়ে নেবে। শুক্কুরের ঐ ঘটনা যদি সত্য হয় (শুধু তাই না এর পরেও সম্প্রতিকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কে দেয়া এক সাক্ষাতকারেও গোলাম বলেছে "ভাষা আন্দোলন করা ছিলো ভুল সিদ্ধান্ত") তাহলে সেই দিনের পর থেকেই ভাষা সৈনিকদের নাম থেকে তার নাম কাটা পড়ে গ্যাছে।

কাজেই গোলাম আযম কোনক্রমেই ভাষা সৈনিক নন। এটা যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে মহিমান্বিত করার জামাতি অপকৌশলমাত্র।

সূত্র :

http://ghulamazam.info/

http://www.amarblog.com/eskimo/posts/10365

http://www.shodalap.org/zia1307/8854/

http://blog.priyo.com/abdul-gaffar-chowdhury/2012/03/10/13094.html

http://www.somewhereinblog.net/blog/heslaseba/29778227

http://www.mediafire.com/download/9xk9on4csi53095/jibone+ja+dekhlam.zip

(এই নিবন্ধটিতে আমার সহ লেখক ছিলেন ড. অভিজিৎ রায়। নিবন্ধটি বিডিনিউজ২৪.কমে প্রকাশিত হয়েছিল।)

কেন আজও পাকিস্তানকে ঘৃণা করতে হয়

"আপনি কিংবা আপনারা পাকিস্তানকে ঘৃণা করেন ভালো কথা, কিন্তু আজকে সকালেই পাকিস্তানের যে শিশু আলোর মুখ দেখল, ১৯৭১ সালের গণহত্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? কিংবা যে শিশু এখনও জন্ম নেয়নি, হয়তো কাল জন্ম নেবে পাকিস্তানের মাটিতে, তার অপরাধ কী? পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। তাহলে একাত্তর-পরবর্তী পাকিস্তানি প্রজন্মকে কেন আমাদের ঘৃণা করতেই হবে?"

খুব সরল, স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক কিছু প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো আছে আমাদের অনেকের মনেই এবং এমন একটা প্রশ্ন যে কারও মনে আসতেই পারে।

এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি:

সাধারণত ইসরায়েলি অথবা ইহুদিদের খ্রিস্টান-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক মানুষই ঘৃণা করেন। কিন্তু আজকে সকালে যে ইহুদি শিশু জন্ম নিল তার অপরাধ কী? কিংবা যে শিশু এখনও জন্ম নেয়নি, হয়তো কাল সকালে জন্ম নেবে কোনো ইহুদি পরিবারে, তার অপরাধ কী? নিশ্চয়ই ভাগ্যক্রমে কোনো ইহুদি পরিবারে জন্ম নেওয়া অপরাধ নয়, তাহলে কেন সকল ইহুদিকে ঘৃণা করতেই হবে?

সত্যি বলতে কী, ইহুদিদের ঘৃণা করতে হবে, এটা একটা অবান্তর কথা।

প্রতি বছর সাড়ে সাত লাখ শিশু পোলিওতে আক্রান্ত হচ্ছে, অবশেষে আলো নিয়ে এলেন এক বিজ্ঞানী

আপনার বুকে বড়সড় একটা ধাক্কা লাগার আগে আসুন হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিই ব্যাপারটা। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষকে হত্যা করার জন্য যে লোকটাকে এককভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে তার নাম হিটলার। তিনি কিন্তু ইহুদি নন, বরং তার ঘাড়ে আছে ষাট লাখ ইহুদি হত্যাকাণ্ডের দায়।

ঢালাওভাবে ইহুদি বলে কাউকে গালি দেওয়ার আগে আসুন কয়েক জন মানুষ সম্পর্কে জেনে নিই। উনিশশ চলিশ পঞ্চাশ দশকের কথা। দুনিয়াজুড়ে পোলিও রোগের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। প্রতি বছর সাড়ে সাত লাখ শিশু আক্রান্ত হচ্ছে এতে। বিজ্ঞানীরা প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছেন রোগটির ভ্যাকসিন, ওষুধ বা টিকা বের করতে। লাভ হচ্ছে না, মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে এই রোগ। অবশেষে আলো নিয়ে এলেন এক বিজ্ঞানী, নাম তাঁর Jonas Edward Salk, যাঁর নিরন্তর গবেষণায় বের হয়ে এল একটি টিকা। হাজার মানুষের দুঃখ ঘুচল। আজ পৃথিবী থেকে পোলিও নির্মূলের পথে।

Jonas Edward Salk নামের মানুষটা একজন ইহুদি।

পারমাণবিক বোমা ও পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতার কথা কে না জানে। বলা হয়ে থাকে, পাঁচটা বালতি সাইজ পারমাণবিক বোমা দিয়ে নাকি পুরো পৃথিবী একসঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এই বোমার করুণ ব্যবহার আমরা দেখেছি হিরোশিমায়। আমরা তো ভালো করেই জানি এইসব বোমা যারা তৈরি করে তারাও মানুষ। শুধু মানুষই নয়, বড় মাথাওয়ালা মানুষ। হাজার হাজার বিজ্ঞানী মিলেই তৈরি করেছেন এই মারণঘাতী প্রযুক্তি। শক্তি প্রদর্শনের এই আদিম খেলায় পৃথিবী কিন্তু চুপচাপ।

বলা হয়ে থাকে, পাকিস্তানকে আত্মসমর্পণের টেবিলে বসানোর পিছনের এক নায়ক ভারতীয় জেনারেল জ্যাকব

প্রথমবারের মতো যে মানুষ বিশ্ব বিবেকের ঘুম ভাঙিয়ে এর প্রতিবাদে কাজ করেন তাঁর নাম Sir Joseph Rotblat, যিনি তাঁর কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ১৯৯৫ সালে। এই মানুষটাও কিন্তু ইহুদি ছিলেন। কাল সকালে আপনার মাথার ওপর পারমাণবিক বোমা পড়বে না, এই নিশ্চয়তা দিতে আজীবন কাজ করেছিলেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় আসন্ন, কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। তারা শান্তিচুক্তি করতে চায়, পরাজিত হতে রাজি নয়। বাংলার বিজয়কে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় আত্মসমর্পণ। বিশ্ব বিবেকেরও তেমন

আপত্তি নেই শান্তিচুক্তিতে। ভুট্টো জাতিসংঘে শান্তিচুক্তির পক্ষে কাজ করছেন। বলা হয়ে থাকে, পাকিস্তানকে আত্মসমর্পণের টেবিলে বসানোর পিছনের এক নায়ক ভারতীয় জেনারেল জ্যাকব। বাংলার পরম বন্ধু। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব ইহুদি ছিলেন।

বোরের পরমাণুবাদ পড়েছেন? নিলসন বোর ইহুদি।

পাওলির বর্জননীতি পড়েছেন? পাওলিও ইহুদি।

আলবার্ট আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন? আচ্ছা, স্টিফেন স্পিলবার্গ? উনারাও ইহুদি।

স্টিফেন স্পিলবার্গের নাম শুনেছেন? ইনিও ইহুদি

উপরে যাদের কথা বললাম, তাদের মধ্যে জেনারেল জ্যাকব ও স্পিলবার্গ ছাড়া সবাই নোবেল বিজয়ী। তবে এখানে আমি আজ ইহুদিদের গুণগান করতে বসিনি। একটু ঘাঁটলে হাজারটা 'ভালো' খ্রিস্টান পাওয়া যাবে; পাওয়া যাবে 'ভালো' মুসলমানও। যাদের অনেকের অবদান হয়তো এদের চাইতেও বেশি। তাহলে এই লেখার উদ্দেশ্য কী?

এবার আসুন একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি। কেন ইহুদিদের কথা বলছি সেটি তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরুন, আপনি ইসরায়েল আর গাজার সাম্প্রতিক সংঘাতের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ইসরায়েলের অন্যায্য হত্যাযজ্ঞের কিছু ছবি আপনার কাছে আছে, একেবারে বলতে পারেন প্রামাণ্য দলিল। আজকের ইসরায়েলের ইহুদিরা গাজার নিরপরাধ সাধারণ মানুষদের ওপর যে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করছে, সেই ঘটনার তিরিশ-চলিশ বছর পর সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

তখন আপনি ইসরায়েল গিয়ে যদি একজন ইহুদি যোদ্ধার ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুকে দেখান তার পূর্বপুরুষের নির্মমতার প্রামাণ্য দলিল এবং তারপরও যদি সেই প্রজন্ম চোখ উল্টে সব কিছু অস্বীকার করে বসে– মনে করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ গাজার নিরপরাধ মানুষদের সঙ্গে যা করেছিল তা আসলে 'উচিত কাজ' ছিল, তাহলে ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার কেমন লাগবে? তাদের পাঠ্যপুস্তকে যখন প্রতিপক্ষকে

সন্ত্রাসী-দালাল বলে অসম্মান করা হবে তখন কেমন লাগবে আপনার? তবে ইজরায়েলের পরবর্তী প্রজন্ম যদি এই গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাহলে অবশ্যই তা প্রশংসার দাবি রাখবে।

ঠিক একইভাবে প্রত্যেক পাকিস্তানিকে ঘৃণা করতে হবে এটাও অবান্তর। অনেক পাকিস্তানি নাগরিক বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়, লজ্জিত হয়। পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গে। পাকিস্তানি অনেক সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীও বাংলাদেশে তাদের পূর্বপুরুষের আচরণের কারণে লজ্জিত। কিন্তু সেই দেশের বড় অংশের মানুষ ভুল ইতিহাস জানে। ভুল জানা মানুষদের ঠিকটা জানিয়ে দিলেও যদি তারা অস্বীকার করে বসে, তাহলে তারা অবশ্যই তাদের পূর্বপুরুষদের মতো ঘৃণার পাত্র।

অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্যকারী দুজনই অপরাধী। এ দায় যেমন তাদের ইতিহাস-প্রণেতাদের, ঠিক তেমনি সেই মানুষদেরও বটে।

একটু ব্যাখ্যা করি। ধরুন, আমি একজন মানুষের বিরুদ্ধে আপনাকে একগাদা ভুল তথ্য দিয়ে, উসকানি দিয়ে, বিভ্রান্ত করে তাকে খুন করতে পাঠালাম। আপনি কথামতো খুনটা করে আসলেন এবং ঘটনাক্রমে এক সময় পুলিশের কাছে ধরাও পড়লেন। আদালতে গিয়ে আপনি হড়হড় করে বললেন, খুনটা আপনি করেছেন আমার প্ররোচনায়, উসকানিতে। পুলিশ আমাকে ধরে আদালতে নিয়ে গেল। ধরুন বিচারে আমার ফাঁসি হয়ে গেল। এখন আপনার কি ধারণা আদালত আপনাকে বেকসুর খালাস করে দেবে?

কোর্ট হয়তো আমাকে ফাঁসি ঠিকই দেবে, কিন্তু আপনাকেও ছেড়ে দেবে না। ভুল জেনে আপনি যাচাই বাছাই না করে একটা খুন করে ফেলবেন আর তারপর দোষ চাপিয়ে কেটে পড়বেন সেটা হবে না।

একইভাবে ভুল ইতিহাস জেনে পাকিস্তানে যে নির্বোধ প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে, তারা প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জন্ম, পৃথিবীর অন্যতম বড় একটা গণহত্যা, এসব অস্বীকার ও অপমান করছে। তাদের পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকে ধর্ষক। তারা আমার মা, আমার বোনকে ধর্ষণ করেছে। আমার ভাই, আমার পিতাকে হত্যা করেছে। বিরানব্বই হাজার সৈন্য ছয় লাখ ধর্ষণ করলে সেই অপরাধের মাত্রা আপনারা বুঝতে পারেন। অথচ কোনো দিন শুনেছেন কোনো পাকিস্তানি সৈনিকের সন্তান বলছে এটা তাদের পিতাদের কৃত অপরাধ ছিল?

এবার আসুন আরেকটু নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে চিন্তা করি। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসগুলো কীভাবে তৈরি হয় আর আমাদের যুদ্ধের ইতিহাসই-বা কীভাবে এসেছে?

আমাদের মানতেই হবে, যে কোনো যুদ্ধের পর সেই যুদ্ধ নিয়ে যুদ্ধে বিজয়ীদের দেশে এক রকম ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে আর পরাজিত দেশের ইতিহাসে লেখা থাকে অন্য

সেই দলিল দেখানোর পরও যদি সেই প্রজন্ম মনে করে, তাদের পূর্বপুরুষরা গাজার নিরপরাধ মানুষদের সঙ্গে যা করেছিল তা 'উচিত কাজ' ছিল

রকম কথা। স্বাভাবিকভাবেই দুটো ইতিহাসের বয়ানে পরস্পরকে দোষারোপ করা হয়। দুটো ইতিহাসেই থাকতে পারে অনেক ভুল তথ্য, মিথ্যাচার। কিন্তু অনেক অনেক বছর পর যখন একাডেমিকভাবে ইতিহাসবিদদের হাতে ইতিহাস লেখা হবে, তখন সব গল্পের জট খুলে সত্যটা ঠিকই বেরিয়ে আসে। এটাই ইতিহাসের নিয়ম।

এবার একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু দুটো পরাশক্তি কিংবা দুটো সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ ছিল না। যুদ্ধটা হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিরীহ সাধারণ জনগণের। সুতরাং এই যুদ্ধে আমরা একই সঙ্গে নির্যাতিত ও বিজয়ী গোষ্ঠী। অন্য সব যুদ্ধের সঙ্গে এই যুদ্ধ মিলিয়ে ফেলার আগে বিষয়টা বোঝা খুবই জরুরি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মূলত পাকিস্তানে লিখেছেন পাকিস্তানি জেনারেল ও রাজনীতিবিদরা। এদিকে বাংলাদেশেও অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে একেবারে নির্মোহভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য-উপাত্ত যাচাই করতে আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে আন্তর্জাতিক মিডিয়া। পাকিস্তানি বাহিনীর রক্তচক্ষুর ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ আর গণহত্যার অনেক কম খবরই দেশের বাইরে যেতে পেরেছে। তবু যতটুকু বেরিয়েছে, সে সব বিশ্বময় পৌঁছে যায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। পৃথিবীর বড় অংশ জানতে পারে পাকিস্তানিদের নির্মমতার কথা।

সারা পৃথিবীর জনমত চলে আসে বাঙালিদের পক্ষে। আর এইসব খবর সরবরাহ করেছেন যেসব সাংবাদিক ও বিদেশি পর্যবেক্ষক, তারা ঘটনাগুলো নিরপেক্ষ ও

নির্মোহভাবেই লিখেছেন। এইসব টেলিভিশন আর সংবাদপত্রের প্রচারণার কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী ও পাকিস্তানিদের নির্মমতা পৃথিবীর মানুষদের কাছে পরিষ্কার। বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষেরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করেন।

যুদ্ধটা হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিরীহ সাধারণ জনগণের
উচ্চ মাধ্যমিক

অন্যদিকে, পাকিস্তান তাদের পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য ইতিহাস দাঁড় করাতে পারেনি। তাদের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে তারা নিয়মিত মিথ্যাচারিতা, বাংলাদেশি সাধারণ নাগরিকদের প্রতি বিনা কারণে বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। অথচ বাংলাদেশের সমস্ত পাঠ্যবইতে নিয়মমাফিক পাকবাহিনীর নির্মমতার কথাই বলা আছে। কখনও কোনো পুস্তকে পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের প্রতি কোনো হিংসার বাণী ছড়ানো হয়নি, পাকিস্তানিদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়নি।

কেউ দেখাতে পারবেন না আমাদের কোনো শ্রেণির কোনো পাঠ্যপুস্তকে পাকিস্তানের সাধারণ জনগণদের প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে কোনো কথা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের স্কুল-কলেজে পাঠ্যপুস্তকগুলোর মোটিভ মূলত একটাই– বাংলাদেশ এবং বাঙালি-বিদ্বেষ। যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্বেষের ওপর দাঁড় করানো তাদের কাছে আর কী আশা করা যায়? বারবার রেফারেন্স ছাড়া 'ভুল ইতিহাস', 'ভুল ইতিহাস' কথাটার পুনরাবৃত্তি উচিত হচ্ছে না। তাই কথা না বাড়িয়ে আসুন দেখে নেওয়া যাক পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ১৯৭১, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কী লেখা আছে:

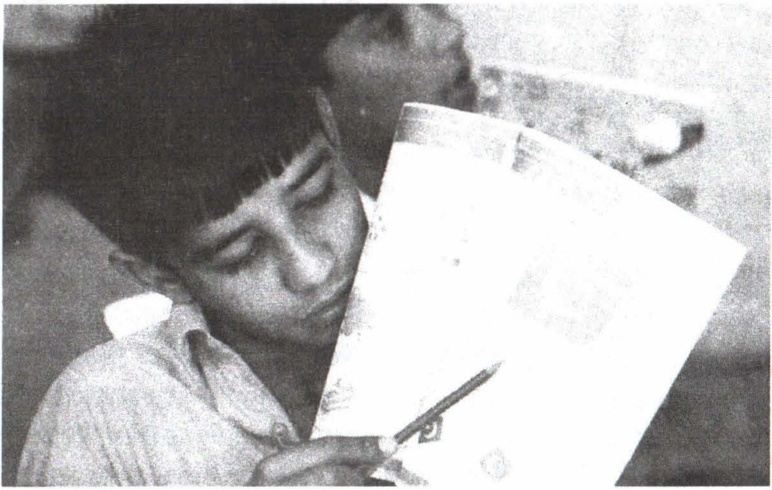

পঞ্চম শ্রেণি:

–১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের সহযোগিতায় সেখানকার অধিবাসীদের পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে। পরে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে। ভারতের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যায়।

নবম-দশম শ্রেণি:

–পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহু সংখ্যক হিন্দু শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। হিন্দু শিক্ষকেরা বাঙালিদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে।

–পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক কোটি হিন্দু বাস করত। ভারত তাদের স্বার্থ বাস্তবায়নে এই হিন্দুদেরকে ব্যবহার করে। ভারত পূর্ব পাকিস্তান পৃথক করতে চেয়েছিল। অনেক হিন্দুই ভারতের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তান আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেওয়ায় রাশিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল। ফলে রাশিয়া ভারতের সামরিক আগ্রাসনে সমর্থন দেয়। অন্যদিকে আমেরিকাও পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা চেয়েছিল।

–আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পতন হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক

-মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ পুর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অভিযানে জামায়াতে ইসলামী সশস্ত্র সেচ্ছাসেবক দিয়ে অংশগ্রহণ করে। সামরিক

অভিযানের মুখে আওয়ামী লীগের অনেক কর্মী ভারতে পালিয়ে যায় এবং শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত তাদেরকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ডিসেম্বর ৩, ১৯৭১ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। স্থানীয় জনগণের সমর্থনের অভাব, সামরিক বাহিনী ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানের সৈন্যরা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সাহসিকতার এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করে।

উপরের অল্প কিছু উদাহরণ থেকেই দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত প্রত্যেক মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভুল তথ্য জেনে আসছে। কোনো কিছু ভুল জেনে একটা দেশ সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ফলে দিনের শেষে তারা তাদের পূর্বপুরুষের হাতে এই মাটিতে সংঘটিত এত বড় একটা গণহত্যা অস্বীকার করছে; কিছু হাস্যকর খোঁড়া যুক্তি দিয়ে নিজেদের জাতির বর্বরতার ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। এহেন প্রতিহিংসামূলক ইতিহাস জেনে পাকিস্তানে বছরের পর বছর আত্মাভিমানী, নির্বোধ, অথর্ব প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে যারা প্রতিনিয়ত আমাদের দেশ, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যার অপমান করছে।

তবু পাকিস্তানকে ঘৃণা করা বলতে পাকিস্তানের সদ্য জন্ম নেওয়া কোনো নিষ্পাপ শিশুকে বোঝানো হয় না। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা তরুণ দলকে বোঝানো হয় না। 'বাংলাদেশ' নামের উর্দু কবিতা লেখা কবি কাইফি আজমীকে বোঝানো হয় না। বোঝানো হয় যে, আদর্শের ওপর পাকিস্তান ১৯৭১ সালে দাঁড়িয়েছিল এবং ২০১৫ সালেও দাঁড়িয়ে আছে, সেই আদর্শ ঘৃণা করার কথা।

ফিলিস্তিনের ওপর আগ্রাসন চালানো ইসরায়েলকে ঘৃণা করি। ইরাকে আক্রমণকারী আমেরিকাকে ঘৃণা করি। ফেলানিকে সীমান্তের কাঁটাতারের মাঝখানে লাশ করে দেওয়া ভারতের আগ্রাসনের প্রতিও রয়েছে আমাদের ঘৃণা।

কিন্তু যে ইসরায়েলের মানুষেরা, মার্কিন নাগরিকেরা, আফগানিস্তানের জনগণ তাদের দেশে চলতে থাকা এইসব রীতিনীতির সমালোচনা করেন, তাদের বুকে টেনে নিই। যে ভারতীয় মানবাধিকার কর্মীরা ফেলানির ন্যায়বিচারের জন্য রাজপথে মিছিল করে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন তাদের জন্য টুপি খুলে রাজপথে বিছিয়ে দিই। যে পাকিস্তানি নাগরিক বাংলাদেশের কাছে তার রাষ্ট্রকে ক্ষমা চাইতে বলে– তাকে 'ভাই' বলে সম্ভাষণ জানাই।

যত দিন না তিরিশ লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যার বিচার হচ্ছে, ছয় লাখ নারীকে ধর্ষণের বিচার হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ না পাচ্ছি, প্রত্যেক পাকিস্তানি নাগরিক

তাদের পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইছে নতজানু হয়ে– ততদিন পর্যন্ত একজন যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবেই দৃঢ় উচ্চারণ করি হুমায়ুন আজাদ স্যারের সেই কথাটি–

"পাকিস্তানকে আমি ঘৃণা করি, যখন তারা গোলাপ নিয়ে আসে তখনও...

সবশেষে গণহত্যার দুটো গল্প শোনাই। প্রথম গল্পটা রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের লেখা 'মুক্তির সোপান তলে' বই থেকে নেওয়া।

"মালতিয়া গ্রামের সীমানা থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গাড়ির গতি মন্থর হয়ে যায়। রাস্তায় এত মৃতদেহ, ওগুলো না সরালে গাড়ি নিয়ে এগুনোই যাচ্ছে না। পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়েকজন লোক ডেকে আনে এবং অস্ত্রের মুখে তাদের বাধ্য করে ওখান থেকে চৌরাস্তা ও চৌরাস্তা থেকে ডুমুরিয়ার দিকে কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার উপরের লাশগুলো টেনে একপাশে সরিয়ে ফেলতে; যেন জিপ নিয়ে পাকিস্তানিরা ঐ পর্যন্ত যেতে পারে।

সেই গাড়ি আস্তে চলতে চলতে চৌরাস্তায় এসে থামে। কেশবপুর হয়ে যশোরের রাস্তায় এত লাশ যে, ওগুলো সরিয়ে যেতে অনেক সময় লাগবে। ডুমুরিয়া-খুলনা কাঁচা রাস্তার অবস্থাও একই। কিছু লাশ টেনে সরিয়ে জিপ ডুমুরিয়ার পথে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে কয়েক মিনিট। তারপর থেমে যায়। আবার ফিরে এসে চৌরাস্তায় থামে। ওদিকেও লাশের স্তূপ। যাওয়া যাবে না।

খেয়া পারাপারের জন্য কোনো লোক নেই। ভদ্রা নদীর বুকে ডুবে আছে অনেক নৌকা, বহু মৃতদেহ। ভদ্রার তীরে পড়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ছুটছে চৌরাস্তার দিকে। পাকি ক্যাপ্টেন এসেছে জিপ নিয়ে, সঙ্গে কয়েকজন। হুকুম দিয়েছে, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্য স্থানীয় নেতারা যেন অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করে।

রুমাল নাকে চেপে জিপে বসে আছে ক্যাপ্টেন। কড়া হুকুম তার, আজ সন্ধ্যার মধ্যে সব লাশ নদীতে ফেলতে হবে। সবাই একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কিছু বলার সাহস পায় না কেউ। একজন সাহস অর্জন করে বলে ফেললেন–

'স্যার, এই অল্প সময়ে এত লাশ নদীতে ফেলা সম্ভব নয়।'

'কিঁউ', বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ওঠেন। কতজন লোক পাওয়া যাবে জানতে চান ক্যাপ্টেন সাহেব। 'পুরো এলাকা খুঁজে একশ জন।'

'একশ লোকই যথেষ্ট। কাজ শুরু কর।'

'চার পাঁচদিন লাগবে স্যার। দুইজনের এক একটা দল দিনে বড়জোর ৮ ঘণ্টা কাজ করতে পারবে। ঘণ্টায় গড়ে ৬টা লাশ সরাতে পারে। ৮ ঘণ্টায় ৪৮ বা ৫০। খুব চেষ্টা করলে না হয় ৬০। এর বেশি কোনোমতেই সম্ভব না।'

'ক্যায়া বক বক করতা হ্যায়', ক্যাপ্টেন রেগে ওঠে।

'লাশগুলো টেনে নদী পর্যন্ত নিয়ে যেতে সময় লাগবে। ২ জনের একটা দল বয়স্কদের ১টার বেশি লাশ নিতে পারবে না, ছোট ছেলে মেয়ে না হয় ৪/৫টা নিতে পারবে। নদীর লাশগুলো না হয় বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভাটার টানে ছেড়ে দিলে সমুদ্রে চলে যাবে। কিন্তু ডাঙার লাশ সরাতে খাটুনি অনেক।

'তব তো কাল তক হোনা চাহিয়ে?

'না, সাহেব, লাশ অনেক।'

'কিতনা?'

মালতিয়া গ্রামের আশপাশ, রাস্তাঘাট, চুকনগর বাজার, পাতাখোলার মাঠ, বিল– এখানেই প্রায় ১০/১২ হাজার। নদীতে ৩/৪ হাজার। গাড়িতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আসা দোভাষী বিষয়টা বুঝিয়ে বললে ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করতে চায় না। জিপের সিটের উপর দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন দেখতে থাকে চারপাশ, আসলে লাশের সংখ্যা কত? কিছুক্ষণ দেখার পর ক্যাপ্টেন শান্ত কণ্ঠে বলল, সে সোমবার বিকালে অথবা মঙ্গলবার সকালে আসবে।'

এবার শেষ গল্পটি।

'দিনটা ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের আট তারিখ। রাওয়ালপিণ্ডির সিএমএইচে এক তরুণ পাকিস্তানি অফিসারকে আনা হয়েছে মানসিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য যে একাই প্রায় ১৪,০০০ মানুষকে হত্যা করেছে। এত এত লাশ দেখতে দেখতে সে পাগল হয়ে গেছে। যুদ্ধের কথা মনে পড়লেই তার ক্রমাগত খিঁচুনি হচ্ছে এবং ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্ন দেখছে। তাকে ফিরে যেতে হবে এবং হিন্দুদের শেষ করতে হবে।'

আমাদের জানা মতে, অফিসিয়ালি একজন মানুষের হাতে সর্বোচ্চ হত্যা-সংখ্যা ২,৭৪৬ এবং এই বিশ্ব রেকর্ডটির মালিক যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট ডিলার্ড জনসন। এই যোদ্ধা তার সৈনিক জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে ইরাকে।

সে হিসেবে উপরের ঘটনা সার্জেন্ট ডিলার্ড জনসনকেও ছাড়িয়ে যায়। বলে নেওয়া ভালো যে, উপরের গল্পটি কোনো বাঙালি লেখক নিজের বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্য লেখেননি। এটা লিখেছেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, Diaries of Field Marshal Mohammad Ayub Khan বইতে। তার বইটার ৪৯৮ ও ৪৯৯ নং পৃষ্ঠা খুললেই এ অংশটুকু খুঁজে পাবেন।

তথ্যসূত্র:

১. 'মুক্তির সোপানতলে', রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম

২. 'Diaries of Field Marshal Mohammad Ayub Khan', ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান

৩. মুক্তিযুদ্ধ-ই-আর্কাইভ

৪. 'পাকিস্তানি জেনারেলদের মন', মুনতাসীর মামুন

‘কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি’ বনাম ‘কাকে হত্যার দায়ে মুজাহিদের ফাঁসি?’

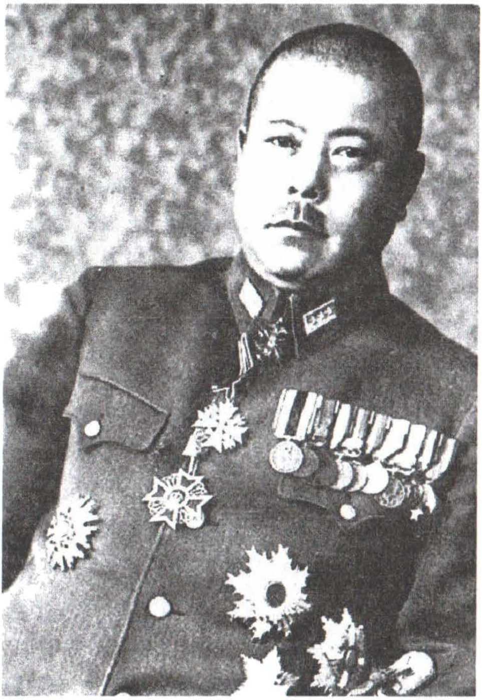

এক.

১৯৪৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর ফিলিপাইন। ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের এক রায় অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃস্থানীয় জাপানি জেনারেল ‘তময়উকি ইয়ামাশিতা’-র ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয় এই দিনে। তার উপর আনিত মানবতা বিরোধী অপরাধ ছিলো ‘সুপিরিয়র রেসপন্সিবলিটি’ অথবা ‘কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি’। আজ আলোচনা করবো তার অপরাধের মাত্রা নিয়ে।

জি হ্যাঁ, মুজাহিদের অপরাধের মাত্রা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারনা দেয়ার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা।

শিং মাছ যেমন ছাই দিয়ে চেপে ধরতে হয় বদর কমান্ডার মুজাহিদকেও তেমন ছাই চাপা দিয়ে ধরতে হবে আমাদের। আমার বন্ধু মহলে অনেককে বলতে শুনি ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে হতাশাপূর্ণ কথা, এসব কথা যারা বলেন তারা সবাই যে জামাতি-হেফাজতি এমন নয় বরং দেশের বিভিন্ন সমস্যা থেকে তৈরি হতাশা, সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মে বিরক্তি সর্বোপরি ক্ষোভ কিংবা বিরক্তি থেকেই অনেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে, ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক আজেবাজে মন্তব্য করে বসেন। তবে সমস্যাটা হচ্ছে এইসব মন্তব্যের/সমালোচনার পেছনে যুক্তি আর তথ্যের রসদ যোগায় বাঁশেরকেলা। ফলশ্রুতিতে প্রকারন্তে জামাত-শিবির বিরোধী মানুষই কিন্তু জানার অভাবে দিনের শেষে জামাতের পারপাস সার্ভ করে থাকেন।

একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই জামাত-শিবির প্রত্যেকটা রাজাকারের বিচারের পর রায়ের খণ্ড খণ্ড অংশ আউট অফ কনট্যাক্স তুলে নিয়ে এসে নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে চায়। আদালতে দেয়া সাক্ষিরা নাকি মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে এই কথা প্রচার করে নিজেদের সাক্ষীদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চায়।

আমরা যারা আইনের মানুষ নই তাদের পক্ষে আদালতের নিয়মকানুন তেমন একটা জানা সম্ভব হয় না। সাক্ষীদের সাক্ষ্য কেমন করে নেয়া হয়, কেমন করে সাক্ষির সাক্ষ্য সত্য নাকি মিথ্যা যাচাই করা হয়, সেটা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের অজানা, এই না জানার সুযোগ নিয়েই ক্রমাগত মিথ্যাচার করে বেড়ায় এই 'বাঁশেরকেল্লা' চক্র।

এই পর্যন্ত তিনজন যুদ্ধাপরাধীর পরিচয় পরিবর্তন করে মামলা পরিচালনা করেছে তারা। কাদের মোল্লা, সাইদি এবং সাকা চৌধুরী এই তিনজনের ক্ষেত্রে একই নিয়মে মামলা পরিচলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'এই কাদের/সাইদি/সাকা নাকি যুদ্ধকালীন গণহত্যায় নেতৃত্ব দেয়া সেই কাদের/সাইদি/সাকা নয়' অন্য কোন (একই নামের) মানুষের অপরাধের দায়ে তাদের মক্কেলদের ফাঁসানো হচ্ছে!!! (মজাটা হচ্ছে একই ঘটনা একজন না দুইজন না তিনজনের ক্ষেত্রে মেনে নেয়া একটু কষ্টকর বৈ কি)

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কাদের মোল্লা, সাইদি এবং সাকা চৌধুরী তিনজনই ১৯৭১ সালে তেমন পরিচিত কেউ ছিলো না কিন্তু অন্যদিকে মুজাহিদ, নিজামি, গোলাম আযম এরা যথাক্রমে থানা, জেলা, শহর, দেশ এমনকি আন্তর্জাতিক ভাবেও সুপরিচিত ছিলো ১৯৭১-এর আগে থেকেই, এরা সবাই একেবারে কেন্দ্রে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলো রাজাকার-আলবদর-আলশামস কিলিং স্কোয়াডদের। আর তাই তাদের পরিচয় গোপন করে অন্য কাউকে মুজাহিদ/নিজামি/গোলাম বানানোর নাটক জামাত করতে পারেনি জামাত। আর তাই তাদের ক্ষেত্রে একটা কমন যুক্তি হচ্ছে "পারলে আমাদের নেতারা কাকে খুন করেছে দেখান?"। সম্প্রতি প্রায় প্রতিটি শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে 'মুজাহিদ মুক্তি পরিষদ'-এর নামে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে যেখানে বড় বড় করে লেখা আছে-

"কাকে হত্যার দায়ে জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো??"

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ- ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রেসিডেন্ট, পদাধিকার বলে কিলিং স্কোয়ার্ড আলবদরের কমান্ডার। তার নেতৃত্বে এই দেশের শত শত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এই নরপশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। পরবর্তীতে আপিল বিভাগও এই রায় বহাল রেখেছে।

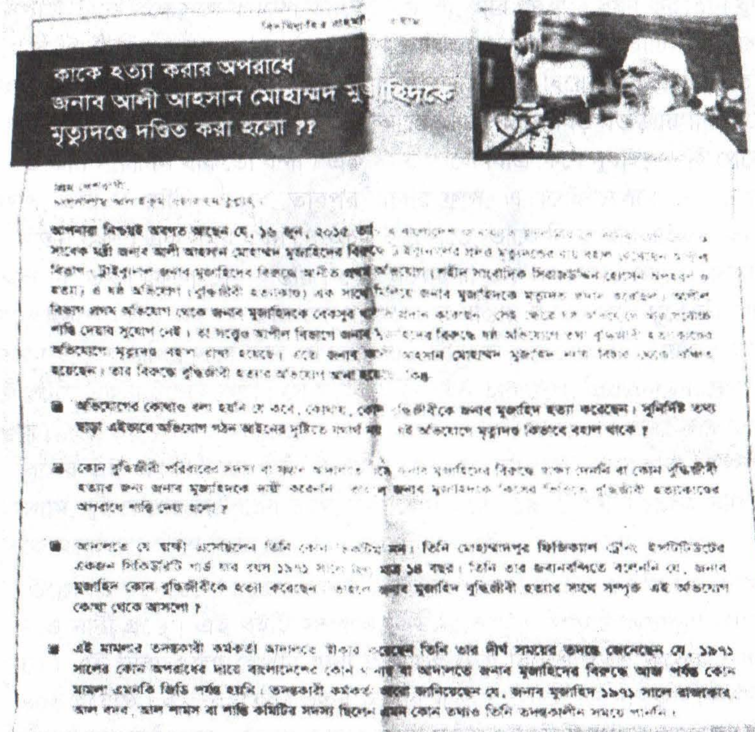

কাকে হত্যা করার অপরাধে জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো ??

প্রিয় দেশবাসী,
[illegible]

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ১৬ জুন, ২০১৫ [illegible] সাবেক মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে [illegible] ট্রাইবুনাল জনাব মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনীত [illegible] অভিযোগ। [illegible] শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন [illegible] হত্যা, ৬ষ্ঠ অভিযোগ (বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড) এক সাথে [illegible] জনাব মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ড [illegible] আপীল বিভাগ প্রথম অভিযোগ থেকে জনাব মুজাহিদকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। [illegible] শাস্তি দেয়ার সুযোগ নেই। এর সত্ত্বেও আপীল বিভাগে জনাব মুজাহিদের বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ অভিযোগে তথা বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। এতে জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ [illegible] হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে [illegible]

- অভিযোগের কোথাও বলা হয়নি যে কবে, কোথায়, কোন বুদ্ধিজীবীকে জনাব মুজাহিদ হত্যা করেছেন। সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া এইভাবে অভিযোগ গঠন আইনের দৃষ্টিতে [illegible] এই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কিভাবে বহাল থাকে ?

- কোন বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্য [illegible] জনাব মুজাহিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেননি বা কোন বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য জনাব মুজাহিদকে দায়ী করেননি [illegible] জনাব মুজাহিদকে [illegible] বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের অপরাধে শাস্তি দেয়া হলো ?

- আদালতে যে সাক্ষী এসেছিলেন তিনি কোন [illegible] নন। তিনি মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের একজন সিকিউরিটি গার্ড যার বয়স ১৯৭১ সালে ছিল মাত্র ১৪ বছর। তিনি তার জবানবন্দিতে বলেননি যে, জনাব মুজাহিদ কোন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছেন। তাহলে জনাব মুজাহিদ বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সম্পৃক্ত এই অভিযোগ কোথা থেকে আসলো ?

- এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে স্বীকার করেছেন তিনি তার দীর্ঘ সময়ের তদন্তে জেনেছেন যে, ১৯৭১ সালের কোন অপরাধের দায়ে বাংলাদেশের কোন [illegible] বা আদালতে জনাব মুজাহিদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন মামলা এমনকি জিডি পর্যন্ত হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা আরো জানিয়েছেন যে, জনাব মুজাহিদ ১৯৭১ সালে রাজাকার, আল বদর, আল শামস বা শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন এমন কোন তথ্যও তিনি তদন্তকালীন সময়ে পাননি।

প্রশ্ন হলো, সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও এবং কোন প্রত্যক্ষ ভিকটিমের সাক্ষ্য ছাড়াই কোন্ কারণে জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সম্পৃক্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো? তাহলে কি আইনীভাবে নয় বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশতঃ জনাব মুজাহিদকে মিথ্যা অভিযোগে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে ? সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী দলে সক্রিয় ভূমিকা রাখাই কি জনাব মুজাহিদের অপরাধ?

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে হত্যার সরকারী এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
এই মুহূর্তে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মুক্তি চাই, দিতে হবে।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মুক্তি পরিষদ

বিচারের রায় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এই লোকটার পক্ষে এত এত এত দালিলিক প্রমাণ আছে যে কোন সুস্থ মানুষ সুস্থ মস্তিস্কে তাঁকে 'ভালো মানুষ' বলতে পারবে না। সম্ভবত এই রায়ের কার্যকরের মধ্যে দিয়ে দেশে প্রথম আল-বদরের কোন কমান্ডারের 'সুপিরিয়র রেস্পন্সিবলিটি' অর্থাৎ 'প্রধান হিসেবে অপরাধের দায়' নিয়ে ফাঁসির দড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং সেই অপরাধের প্রমাণ যতটানা সাক্ষ্য ভিত্তিক তারচেয়ে অনেক বেশী তথ্য ভিত্তিক, কেউ এই রায় কে 'ভাড়া করা সাক্ষী' বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

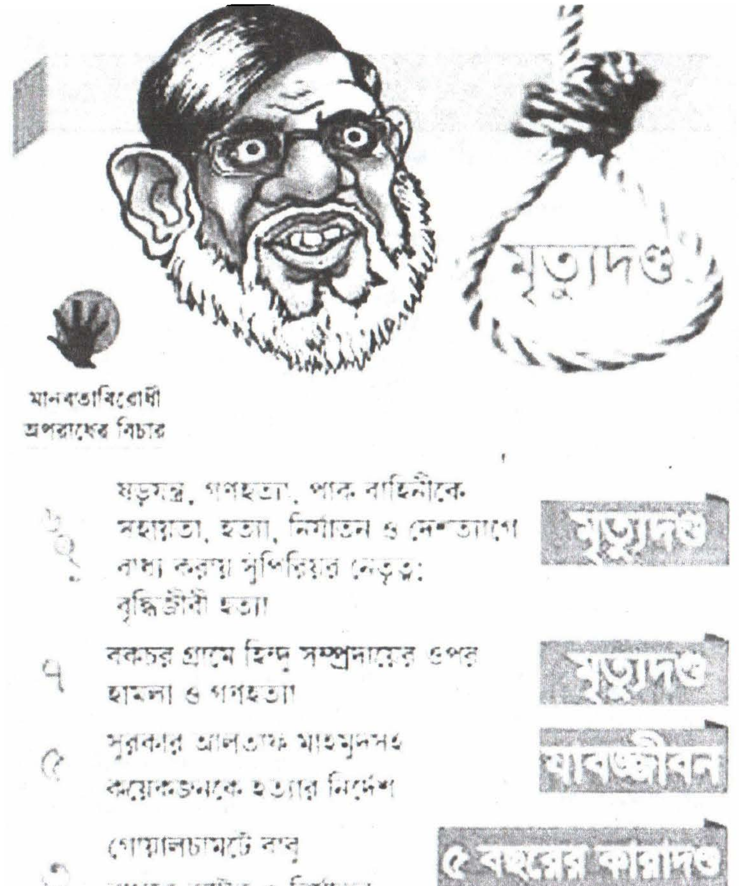

এই মামলার রায় পড়লে দেখা যায় ডিফেন্স এক কথায় এবারের এই মামলার বেলায় প্রায় সবকিছুই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে বা মেনে নিয়েছে। তারা মেনে নিয়েছে ১৯৭১ সালে মুজাহিদ পুরো পাকিস্তানের ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রেসিডেন্ট ছিলো। তারা মেনে নিয়েছে যে ১৯৭১ সালে আলবদর নামের একটা সংগঠন বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলো। তারা মেনে নিয়েছে যে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আলবদর হেড কোয়ার্টার ছিলো এবং সেখানে বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে অত্যাচার করা হতো, হত্যা করা হতো। তারা এটাও মেনে নিয়েছে যে মুজাহিদ মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে নিয়মিত যাতায়ত করতো।

কিন্তু তারা মানতে নারাজ যে আলবদর প্রধান মুজাহিদ একজন খুনি। এবং তাদের একটাই কথা যে আদালত রায়ে উল্লেখ করেনি মুজাহিদ আসলে কাকে হত্যা করেছে।

দুই.

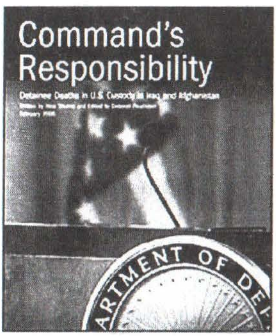

Human Rights First's report on deaths in custody

সুপিরয়র রেস্পন্সিবলিটি কিংবা কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি নিয়ে এই লেখার শুরুতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি জেনারেল 'তময়উকি ইয়ামাশিতা' সম্পর্কে যেটা বলছিলাম সেই কথায় আবার ফিরে আসি। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখ ম্যানিলার এক আদালতে জেনারেল তময়উকি ইয়ামাশিতার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো ম্যানিলা গণহত্যা সংগঠনে ভূমিকা, সিংগাপুর এবং ফিলিপাইনে নিরীহ মানুষদের হত্যার অভিযোগ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে জেনারেল ইয়ামাশিতার বিরুদ্ধে আনিত সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিলো যে জাপানি সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার হিসেবে সে তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেনি। জাপানি সৈন্যরা যখন গণহত্যা চালাচ্ছিলো তখন জেনারেল ইয়ামাশিতা নৈতিকতার জায়গা থেকে তাদের এরকম কর্মকাণ্ড করতে বাধা দেননি কিংবা দিতে পারেননি। জেনারেল ইয়ামাশিতার আইনজীবীরা জাপানি বাহিনীর হাতে গণহত্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে যুক্তি দেখায় যে যুদ্ধের ভেতর যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো এবং জাপানি সেনাদের ভেতর চেইন অফ কমান্ড পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো আর তাই ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও জেনারেল ইয়ামাশিতা তার সৈন্যদের হত্যা, ধর্ষণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

সেই বিচারে কেবল মাত্র সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ব্যর্থতার কারণে জেনারেল ইয়ামাশিতাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আদালত, সেই রায় সুপ্রিম কোর্ট এবং আপিল

কোর্টের পর রাষ্ট্রপতির ক্ষমা বঞ্চিত হয়ে ১৯৪৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর কার্যকর করা হয়।

ফাঁসিকাঠের তেরটি সিঁড়ি অতিক্রম করার পর যখন তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তার কোন শেষ বক্তব্য আছে কি না, তখন জেনারেল ইয়ামাশিতা যা বলেছিলেন তার চুম্বক অংশ পাঠকের উদ্দেশ্যে- "আমি ম্যানিলা সুপ্রিম কোর্টে যেই কথা বলেছিলাম সেটাই বলবো যে আমি আমার সাধ্যমত কাজ করেছি তাই আমি ঈশ্বরের সামনে লজ্জিত হব না। কিন্তু তোমরা হয়তো বলতে পারো 'আপনার জাপানি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ছিলো না' আসলে আমার বলার কিছুই নেই, এটাই আমি। আমি সব সময়ই বিচার বাবস্থার প্রতি আস্থাশীল। যখন আমাকে ম্যানিলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিলো তখন আমার ভালো চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা হয়েছিলো, আমার সাথে ভালো ব্যাবহার করা হয়েছিলো। তোমাদের ভালো এবং ভদ্র অফিসারেরা সব সময়ই আমার সাথে ভালো ব্যাবহার করেছে এবং আমাকে রক্ষা করেছে। আমার মৃত্যুর কারণে আমি তোমাদের দোষারোপ করবো না। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুণ।"

–

–

–

–

–

তিন.

BG PAUL W TIBBETS JR

কর্নেল পল ওয়ারফিল্ড টিবেটস জুনিয়র পৃথিবীময় বিখ্যাত শুধু একটা কারণে এবং এই একটা কারণ জনপ্রিয় হবার জন্য যথেষ্ট। তিনি পরিচিত জাপানের হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম আনবিক বোমা নিক্ষেপকারী হিসেবে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট নিক্ষিপ্ত সেই বোমায় তাৎক্ষনিক এক লাখ বিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, এবং পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটে আরও প্রায় দ্বিগুণ-তিনগুণেরও বেশী মানুষের। সেই

আনবিক বোমা নিক্ষেপের ৯ দিনের মাথায় জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে মিত্র বাহিনীর কাছে।

আসুন ঐতিহাসিক এই আনবিক বোমা নিক্ষেপ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

সবাইকে উল্লেখিত নামগুলোর দিকে একটু লক্ষ রাখতে অনুরোধ করবো।

তর্কের খাতিরে ধরে নেই এই আনবিক বোমার বিস্ফোরণ একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ (!!)। এই আনবিক বোমা- লিটল বয় নির্মাণ করা হয় জেনারেল লেসলি গ্রোভের নেতৃত্বে ম্যানহাটান প্রকল্পে। এই প্রকল্পের সাথে আমাদের কর্নেল টিবেটস সংশিষ্ট হন ১৯৪৪ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর। সেই প্রকল্পের প্রধান ছিলেন এয়ার ফোর্সের কমান্ডার মেজর জেনারেল উজাল ইন্ট এছাড়া ছিলেন আরও তিন জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সেখান থেকে কর্নেল টিবেটস কে ঐতিহাসিক ৫০৯ তম কম্পোজিট গ্রুপের দায়িত্ব দেয়া হয়। যেখানে ছিলো ১৮০০ জনবল এবং ১৫টি বি-২৯ বোমারু বিমান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় আনবিক বোমা- 'লিটেল বয়' ও এরকম একটি বি-২৯ বিমান থেকেই নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

এবার একটু বিমানের দিকে তাকাই, আমাদের আলোচনার বি-২৯ বিমানটি কিন্তু ছোটখাটো কোন বিমান নয়। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে আমি ছোটবেলা থেকেই কল্পনা করে এসেছি যে ছোট একটা পেনেই বুঝি সেই বোমাটাকে একজন নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে

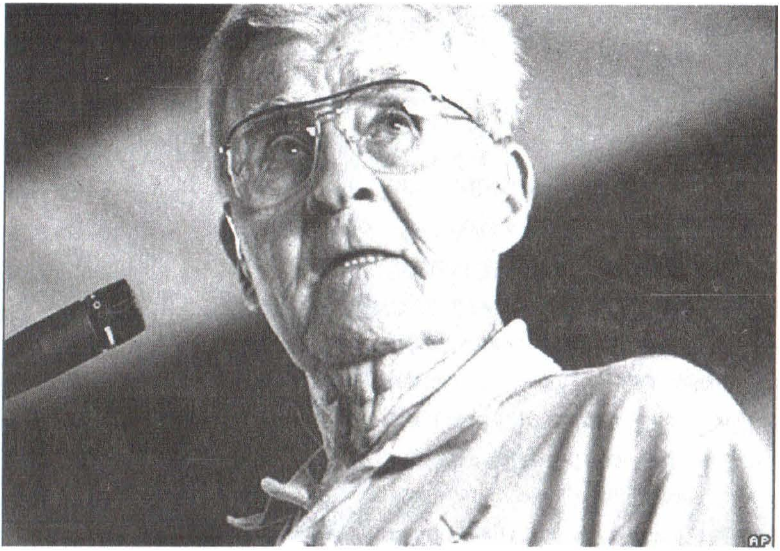

আসে, এমনও শুনেছি যে বোমাটা মারার পর বৈমানিক নাকি নিচের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠেছিলো 'এ আমি কি করলাম'। যদিও বাস্তবতা সেদিন অন্যরকম ছিলো, এই বিমানে সেদিন ৯ জন যাত্রী ছিলেন এবং সবাই তারপরের বাকি জীবন হেসে খেলে কাটিয়ে গেছেন। তাদের বোমার আঘাতে কোন প্রার্থনারত বৃদ্ধ কিংবা সদ্য জন্ম নেয়া শিশু মারা গেলো কি না সেটা তাদের ভাবনায় কখনোই আসে নাই। বরং তারা আজীবন বুক ফুলিয়ে খুশী মনে বড়াই করে বলে বেড়িয়েছে নিজের কাজের কথা।

তো সেই বিমানের আমাদের কর্নেল টিবেটস উপস্থিত থাকলেও তিনি কিন্তু প্লেনেও চালান নাই আবার সুইচ টিপে দিয়ে বোমাটাও হিরোশিমার বুকে ফেলেন নাই। তিনি কেবল এই গ্রুপটার নেতৃত্ব দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন রবার্ট লুইস ছিলেন পাইলটের আসনে, ক্যাপ্টেন ভেন ক্রিক জায়গাটা নিশ্চিত করেছেন আর বোম্বার মেজর থমাস ফেরেবি বোমাটা ছুঁড়েছেন।

চার.

আশা করছি আমার পাঠকরা বুঝতে পারছেন 'সুপিরিয়র রেসপন্সিবলিটি' কিংবা 'কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি' কি ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। প্রথম ঘটনায় উল্লেখিত জেনারেল ইয়ামাশিতা কোন একজন মানুষকে হত্যা করেননি, কাউকে এমন কি হত্যা করতে হুকুম দেননি, সুপারিশ করেননি। কেবল তার নিচের অধিনস্ত সৈন্যদের অপরাধ থেকে দূরে রাখতে পারেননি। আর অন্য দিকে মুজাহিদ কিলিং ফোর্স আলবদরের কমান্ডার। তার নেতৃত্বে/নির্দেশে খুন হয়েছিলো এদেশের

শত শত বুদ্ধিজীবী। মুজাহিদের 'সুপিরিয়র রেসপন্সিবলিটি' কিংবা 'কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি' বিচারের জন্য কেন আমাদের নির্দিষ্ট একজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যার দায় প্রমাণ করতে হবে?

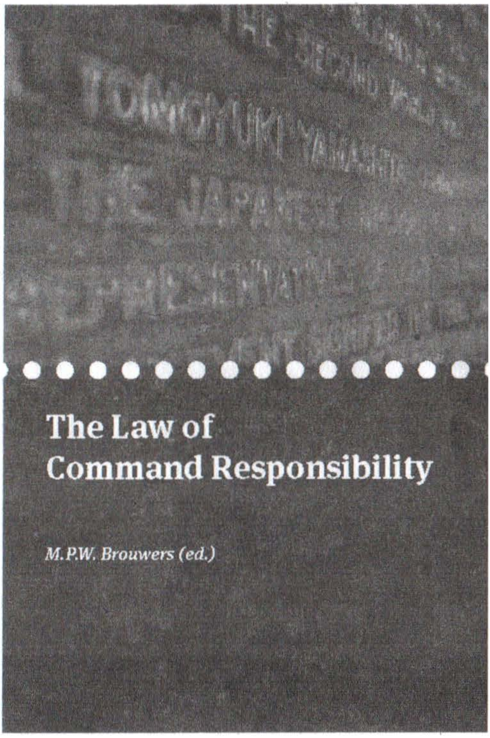

কেউ যদি ধারনা করে থাকেন 'সুপিরিয়র রেসপন্সিবলিটি' অথবা 'কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি'তে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান কেবল সামরিক অফিসারদের জন্য- তাদের বলতে চাই জাতিসংঘের রুয়ান্ডা ট্রায়ালে করা স্কুল শিক্ষক জেন পল আকায়াশুর বিচারের কথা।

Jean-Paul Akayesu, handcuffed and surrounded by U.N. security personnels, arrives for his trial at the International Criminal Tribunal for Rwanda in Arusha, Tanzania Thursday Jan. 9, 1997. Akayesu, a former village mayor and Hutu is charged with genocide for allegedly leading a massacre of 2,000 people three years ago. Akayesu is one of 21 people the tribunal has indicted, but only six other suspects are in the tribunal s custody; the others are being held in other countries. (AP PHOTO/SAYYID AZIM)

নিজের গ্রামের তুতসিদের যখন নির্মমভাবে হত্যা করার পরিকল্পনা করে সংখ্যাগুরু হুতুরা তখন আকায়াশু উসকানি মূলক বিভিন্ন কথাবার্তা, ঘৃণার বাণী ছড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয়দের ধর্ষণ ছাড়াও তুতসি জীবিত মানুষদের তালিকা তৈরি করে প্রচার করে হুতুদের কাছে। জাতিসংঘ পরিচালিত সেই আদালত জেন পল আকায়াশুকে তাদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তিতে দণ্ডিত করে। সে আজ পর্যন্ত তার যাবত জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি খেটে যাচ্ছে। উল্লেখ্য জাতিসংঘ পরিচালিত কোন আদালতেই মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই।

আশা করি সবার কাছে পরিষ্কার হয়েছে কেন আল বদর কমান্ডার মুজাহিদের ফাঁসি কোন একক ব্যাক্তিকে হত্যার জন্য দেয়া হয়নি বরং দেয়া হয়েছে তার 'সুপিরিয়র রেসপন্সিবলিটি' কিংবা 'কমান্ডার রেস্পন্সিবলিটি'র কারণে।

এখন আনবিক বোমা নিয়ে লেখা দ্বিতীয় ঘটনার শিকার একই ভাবে হিরোশিমার কোন পরিবার তার স্বজনের হত্যাকারীকে খুঁজতে যায় তাহলে দয়টা কার উপরে এসে পড়বে বলতে পারেন কি। আমাদের কমান্ডার কর্নেল টিবেটস সাহেব তো কোন একজন মানুষকে হত্যা করেননি। এখন যদি টিবেটস সাহেব জানতে চান "কাকে হত্যার দায়ে আমাকে সাব্যস্ত করা হচ্ছে?" তাহলে কি উত্তর দেবেন? কারণ টিবেটস সাহেব নিঃসন্দেহে গুলি করে কাউকে হত্যা করেননি, আনবিক বোমাটা হয়তো স্পর্শও করেননি, এমনকি বলেনওনি 'kill them…', শুধু অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

শুধু এটার জন্যই সেইদিনের তিন লক্ষ মৃত্যুর দায় কর্নেল পল ওয়ারফিল্ড টিবেটস জুনিয়রের, সমান ভাবে সেই দায় এয়ার ফোর্সের কমান্ডার মেজর জেনারেল উজাল ইন্টের, এবং জেনারেল লেসলি গ্রোভের। এরা কেউই নিজ হাতে একজন মানুষকে হত্যা করেনি, কিন্তু এরা প্রত্যেকে এই শতাব্দীর সবচেয়ে জঘন্যতম খুনি।

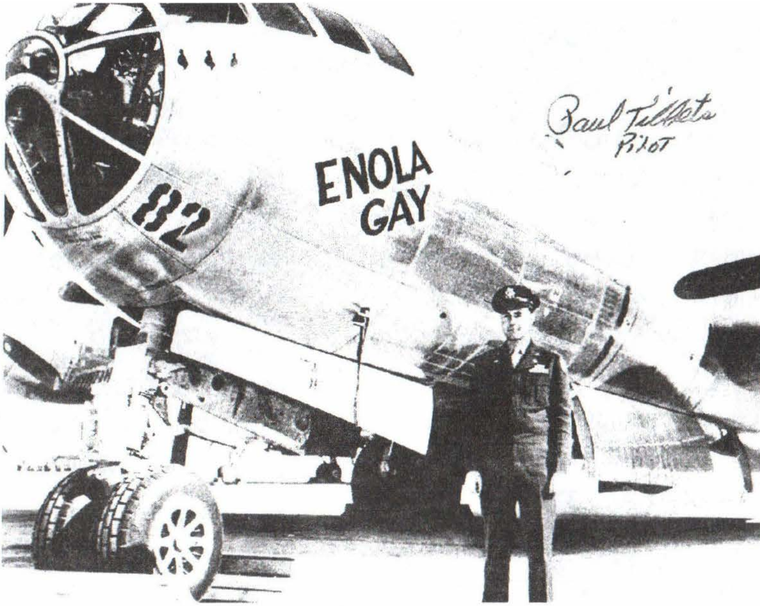

এটাকে সুপিরিয়র রেস্পন্সিবলিটি বলে

একই ভাবে, আল বদর কমান্ডার আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, আল বদর প্রধান মতিউর রহমান নিজামি, আল বদরের মাতৃ সংগঠন জামাতের আমির গোলাম আযম। এরা শতাব্দীর জঘন্যতম খুনি। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড।

আলবদরের কথা বলতে গিয়ে মুনতাসির মামুন স্যার একবার লিখেছিলেন:

আলবদরের নিষ্ঠুরতার কথা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয়, আলবদর হোক, রাজাকার হোক, মানুষ কি মানুষের ওপর এমন অত্যাচার করতে পার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হামিদা খানের বিবরণটার কথা বারবার মনে পড়ে ।

'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।...'

'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের ল্যাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা । মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই, কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা.. মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।...

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

হামিদা রহমান ডা. ফজলে রাব্বীর লাশ দেখে লিখেছিলেন-

'ডা. রাব্বীর লাশটা তখনও তাজা, জল্লাদ বাহিনী বুকের ভিতর থেকে কলিজাটা তুলে নিয়েছে। তারা জানত যে, তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তাই তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাত হয়ে দেহটা পড়ে আছে। পাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। রাব্বী সাহেবের পা দুখানা তখনও জ্বলজ্বল করে তাজা মানুষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাক, মুখ কিছুই অক্ষত ছিল না। দস্যু হায়েনার নখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।... সামনে চেয়ে দেখি, নিচু জলাভূমির ভিতর এক ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয় একেবারে বারো/তেরোজন সুস্থ সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে।'

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বলেছিলেন-

'হানাদার পাক বাহিনীর সহযোগী আলবদররা পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন পালিয়ে যায় তখন তাদের হেড কোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা বোঝাই চোখ। এ দেশের মানুষের চোখ। আলবদরের খুনীরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।'

-[দৈনিক পূর্বদেশ, ১৯.১.১৯৭২]

ডা. আলীম চৌধুরীর চোখও আলবদররা উৎপাটন করেছিল। মওলানা তর্কবাগীশ আরও বলেছিলেন, 'খুনীদের নামে এই বাহিনীর নাম দেয়া হলো আলবদর বাহিনী। এ কি কোন মনঃপূত নাম? যে বদর যুদ্ধ ছিল আদর্শের জন্য, ইসলামের প্রথম লড়াই, সেই যুদ্ধের সঙ্গে কি কোন সংযোগ এই নৃশংসতার মধ্যে ছিল? হানাদারদের সহযোগী এই বদর বাহিনী শুধু ইসলামের শত্রু নয়। এরা হলো জালেম।'

সবশেষে কিছু পেপার কাটিং জুড়ে দিলাম,

তাদের জন্য যারা 'আল বদর' বাহিনীকে অস্বীকার করতে চায়...

১৪ নভেম্বর

পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বদর বাহিনী গঠিত হয়েছে

—মতিউর রহমান নিজামী

এই বদর বাহিনীর গুণকীর্তন করে তৎকালীন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী ১৪ নভেম্বর 'বদর দিবসঃ পাকিস্তান ও আলবদর' শীর্ষক শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেঃ

......বিগত দুবছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সূচনা করেছে। ....আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে পাক সেনাবাহিনীর সহযোগিতার এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তারাও ৩১৩ জন যুবকের সমন্বয়ে এক-একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।....আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় যে দিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাড়িয়ে হিন্দুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে। আর সেদিনই পূরণ হবে বিশ্ব মুসলমানের অন্তরের অপূর্ণ আকাঙ্খা।

শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে 'আল-বদর' বর্বর বাহিনী

বহু লাশ উদ্ধার

কোন ভাষায় প্রকাশ করব 'আল-বদর' পশুদের এই নৃশংসতা।

Outside powers behind killing of intellectuals

Absconding Al-Badr gangster

By A Staff Correspondent

Chowdhury Mainud-din, a member of the banned fanatic Jamaat Islami Party, has been described as the "Operation-in-Charge" of the killing of intel...

Announ...

Intellectuals murdered in cold blood

The New York Times Published: December 19, 1971

125 Slain in Dacca Area Believed Elite of Bengal

Following is the text of a pool report received in Washington from the American press corps in Dacca

DACCA, Pakistan, Dec. 18 —At least 125 persons, believed to be physicians, professors, ... peared to have been killed just before Pakistani commanders in the East surren-

বদর বাহিনীর মাস্টার প্ল্যান

নভেম্বর

নরঘাতক আল-বদররা কিভাবে হত্যার হুমকি পাঠাতো তার একটি বিশেষ নমুনা ঃ

শয়তান নির্মূল অভিযান

"শয়তান,

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যে সব পাচাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা সুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তম আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চালচলন ও কাজকর্ম কোনটাই আমাদের অজানা নেই। অবিলম্বে হুঁশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।"

--শনি

(এ ধরনের চিঠিগুলো নভেম্বরের শেষের দিকে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে পাঠানো হত)

জনতার পার্লামেন্ট

বদর দিবস ঃ পাকিস্তান ও আলবদর

মতিউর রহমান নিজামী

এবারের সতেরই রমজান ইসলামের হারানো স্মৃতি পুনরুজ্জীবনের তারিখ হিসাবে ইতিহাসের পাতায় সোনালী আখরে লিখে রাখার মত দিন। এই দিনে পাকিস্তানের তরুণ সমাজ ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে নতুন করে তুলে ধরেছে নিজেদের মনে। এবারে এইদিনে ঢাকার সমুদ্রসৈকত থেকে খাইবারের দুর্গম পর্বত সর্বত্র মহাসমারোহে উদযাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক বদর দিবস।

ভেতরের ও বাইরের শত্রু [illegible] আমাদের বর্তমান অবস্থা বদর যুদ্ধের পটভূমিকার সাথে মিলিয়ে দেখলে সম্পূর্ণ অভিন্নই মনে হবে। মক্কার কাফেরদের নিকট মুসলমানদের একটি জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র টিকে থাকা যেমন ছিল অসহ্য, অনুরূপ পাক-ভারতের বুক চিরে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ হিন্দুস্তানের কোন নেতার [illegible]

নিকট বরদাশত যোগ্য হবে না। কিন্তু বদরে ঈমানের বলে বলিয়ান মুসলমান বীর যোদ্ধারাই সেখানে কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করে ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

হিন্দু বাহিনীর সংখ্যাশক্তি আমাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশী। তাছাড়া আধুনিক সমরাস্ত্রেও তারা পাকিস্তানের চেয়ে অধিক [illegible]

দৈনিক সংগ্রাম

দুনিয়ার কোন শক্তি পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেনা

জনতার পার্লামেন্ট
বদর দিবস ঃ পাকিস্তান ও আলবদর
মতিউর রহমান নিজামী

মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করার হুকুম দিয়েছিলেন নিজামী

নরপিশাচ আল-বদরের আরেকজন গ্রেফতার: অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত

১০ জন সাংবাদিক

প্রতিকার দাবী

শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে 'আল-বদর' বর্বর বাহিনী

বহু লাশ উদ্ধার

কোন ভাষায় প্রকাশ করব 'আল-বদর' পশুদের এই নৃশংসতা।

Intellectuals murdered in cold blood

The bodies of intellectuals, professors writers, doctors and journalists, who had fallen victim of selective killing by the surrendering military junta of Pakistan were found in different brick kilns and ditches in and around the marshy land near Rayerbazar on the outskirts of Dacca reports ENA.

The victims of the ghastly act, some of whom were found blind-folded and handcuffed with bullet and bayonet injuries in the chest and head, were lying exposed in shallow water in the kilns and ditches. In some cases carnivores had attacked the bodies.

This reporter who visited one such death scene and identified the bodies of Professor Abul Kalam Azad, Dr. Fazle Rabbee and Dr. Abul Khair on Friday evening, recovered the body of Dr Azad and telephonically informed the relatives of the other victims on Saturday morning.

The world news T.V. and radio network representatives visited the spot and came across the harrowing scene of brutality. They also located the prison camp at the Physical Training Institute where rooms are still blood-stained and instruments for torturing the victims scattered around.

Towards the end of the Liberation War of Bangladesh the Army junta, para military unit called Razakar, Al-Badar and Al-Shams drawn from fanatic right wing parties, particularly Jamaat-e-Islami, kidnapped these victims. Those picked up also included Mr. Sirajuddin

Serajuddin Hossain

A N M Mustafa

Shahidullah Kaiser

(Continued on page 4 col. 8)

Report to

GOVT. OFFICES

সংগ্রাম

আলবদর

হতভাগী ভাগরীরথী...

এক.

ছবিতে নিচে যাকে দেখছেন, মানুষটার নাম ন্যান্সি গ্রেস অগাস্টা ওয়েক। তিনি পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম নারী গুপ্তচর হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্স রেজিসটেন্সের গেরিলা বাহিনী মাকিস এর একজন নেতৃস্থানীয় এজেন্ট ছিলেন। ১৯৪০ সালে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করলে তিনি ফ্রান্স রেজিসটেন্সের বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেন ও পরে ক্যাপ্টেন আইয়ান গ্যারোর নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেন।

১৯৪২ সালের পর গেস্টাপো বাহিনীর মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে ছিলেন ন্যান্সি ওয়েক এবং সেই সময় তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয় ৫ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। জার্মানরা তাকে 'হোয়াইট মাউস' বলে ডাকত। তাকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে লাগে পুরো গেস্টাপো এলিটফোর্স। যুদ্ধের প্রথম তিন বছর তিনি যুদ্ধাহতদের সেবা শুশ্রূষা করতেন, তাদের পালাতে সাহায্য করতেন এবং বার্তাবাহকের কাজ করতেন। তিনি সৈন্যদের বিভিন্ন ধরনের নকল কাগজপত্র যেমন পাসপোর্ট, ভিসা, পরিচয়পত্র ইত্যাদি

তৈরি করে দিতেন। অতঃপর তিনি ফ্রান্স রেজিসটেন্স ও পরে আইয়ান গ্যারোর এস্কেপ নেটওয়ার্কে যোগ দেন।

জার্মানির গেস্টাপো বাহিনীর অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দেন ওয়েক। রেজিসটেন্সের সৈন্যরাও তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতো; কারণ তারা জানতো গেস্টাপো বাহিনী ওয়েকের টেলিফোন ও মেইল টেপ করছে। জার্মান একজন সার্জেন্ট হ্যারোল নামে ইংরেজ স্পাই ছিলেন, যার কাছ থেকেও তারা ওয়েক সম্পর্কে তথ্য পেয়েছিলো। যখন তার নিজের দলের লোকেরা তার সাথে প্রতারণা করলো তখন ওয়েক মার্সিলিতে তার স্বামীর কাছে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

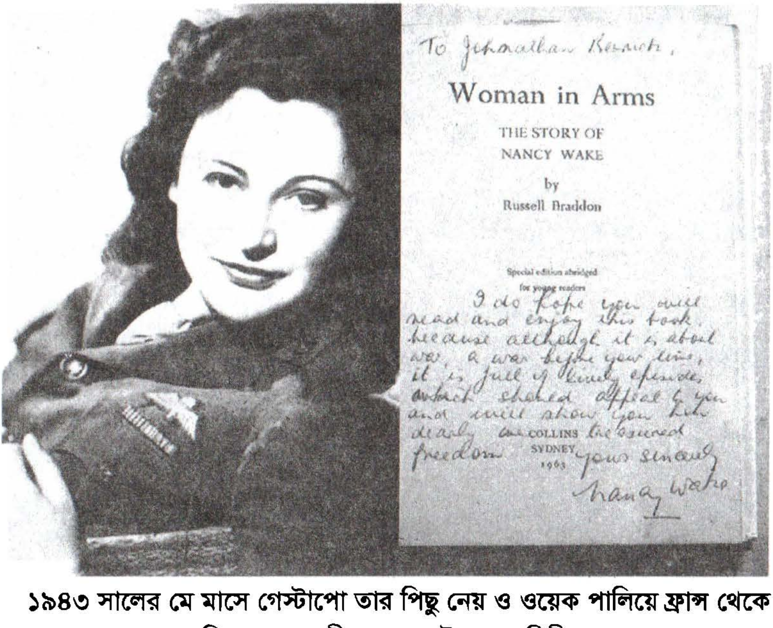

১৯৪৩ সালের মে মাসে গেস্টাপো তার পিছু নেয় ও ওয়েক পালিয়ে ফ্রান্স থেকে স্পেন চলে আসেন। কিন্তু তার স্বামী পরে গেস্টাপো বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন ও তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। এজন্য ওয়েক সবসময় নিজেকে দোষ দিতেন। তিনি বলতেন, তার কারণেই তার স্বামী খুন হয়েছেন। তার সাথে দেখা না করলেই তার স্বামী বেঁচে যেতেন।

ন্যান্সি যুদ্ধের সময়কার তার কৌশল সম্পর্কে বলেন, 'আমি যখন জার্মান বাহিনীর তল্লাশি চৌকি পার হতাম তখন মুখে পাউডার মেখে, মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার ভান করতাম এবং জার্মানদের বলতাম, তোমরা আমাকে সার্চ করতে চাও?'

যুদ্ধের পরপরই ওয়েক অনেক পুরস্কারে ভূষিত হন। তার মধ্যে আছে জর্জ মেডেল, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা পুরস্কার, মেদেলি দে লা রেজিসটেন্স এবং তিনবার

ক্রোইস ডি গ্যারে। ওয়েক ১৯৭০ সালে ক্যাভালিয়ার (নাইট) অফ দ্য লিজি'য়ন অফ অনার লাভ করেন এবং অফিসার অফ দ্য লিজি'য়ন অনার লাভ করেন ১৯৮৮ সালে ফেব্রুয়ারি। ২০০৪ সালে তিনি কম্পেনিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়া গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের এপ্রিলে ওয়েক রয়্যাল নিউজিল্যান্ড রিটার্ন্ড অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'আরএসএ স্বর্ণ ব্যাজ' লাভ করেন।

দুই.

বরিশালের বীরাঙ্গনা শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ভাগীরথীর বীরত্বের ইতিহাস অনেকে জানে না, অথচ সেই বীরত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি তাই ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টাও করলাম না। ন্যান্সি গ্রেস ওয়েকের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করলাম। এবারে শুনুন স্বাধীনতার পর দৈনিক আজাদ পত্রিকায়, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে ছাপা হওয়া এই বীরাঙ্গনার বীরত্বের ইতিহাস। তারপর তুলনা করে দেখুন বিশ্বশ্রেষ্ঠ নারী যোদ্ধাদের সাথে। রিপোর্টটি হুবুহু তুলে ধরা হলো'

"মহাদেবের জটা থেকে নয় বাংলা মায়ের নাড়ী ছিঁড়ে জন্ম নিয়েছিলেন যে সোনার মেয়ে সে ভাগীরথীকে ওরা জ্যান্ত জীপে বেঁধে শহরের রাস্তায় টেনে টেনে হত্যা করেছে। খান দস্যুরা হয়তো পরখ করতে চেয়েছিলো ওরা কতখানি নৃশংস হতে পারে। বলতে হয় এক্ষেত্রে ওরা শুধু সফল হয়নি, বর্বরতার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। অষ্টাদশী ভাগীরথী ছিল বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার বাঘমারা কদমতলীর এক বিধবা পল্লীবালা। বিয়ের এক বছর পর একটি পুত্র সন্তান কোলে নিয়েই তাকে বরণ করে নিতে হয় সুকঠিন বৈধব্য। স্বামীর বিয়োগ ব্যাথা তখনও কাটেনি। এরই মধ্যে দেশে নেমে এল ইয়াহিয়ার ঝটিকা বাহিনী। মে মাসের এক বিকালে ওরা চড়াও হল ভাগীরথীদের গ্রামে। হত্যা করলো অনেক কে, যেখানে যেভাবে পেলো। এ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও ভাগীরথীকে ওরা মারতে পারল না। ওকে ট্রাকে তুলে নিয়ে এলো পিরোজপুরে। তারপর ক্যাম্পে তার উপর চালানো হল হিংস্র পাশবিক অত্যাচার।

সতী নারী ভাগীরথী। এ পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে তিনি একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতেই এক সময় এলো নতুন চিন্তা, হ্যাঁ মৃত্যুই যদি বরণ করতে হয় ওদেরই বা রেহাই দেব কেন? ভাগীরথী কৌশলের আশ্রয় নিলো এবার। এখন আর অবাধ্য মেয়ে নয়, দস্তুরমত খানদের খুশি করতে শুরু করলো, ওদের আস্থা অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগালো। বেশি দিন লাগলো না অল্প কদিনেই নারীলোলুপ সেনারা ওর প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করলো। আর সেই সুযোগে ভাগীরথী ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে শুরু করলো পাকবাহিনীর সব গোপন তথ্য। এক পর্যায়ে বিশ্বাসভাজন ভাগীরথীকে ওরা নিজের ঘরেও যেতে দিতো। আর কোনো বাধা নেই। ভাগীরথী এখন নিয়মিত সামরিক ক্যাম্পে যায় আবার ফিরে আসে নিজ গ্রামে। এরই মধ্যে চতুরা ভাগীরথী তার মূল লক্ষ্য অর্জনের পথেও এগিয়ে গেল অনেকখানি। গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে গড়ে তুললো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এরপরই এলো আসল সুযোগ। জুন মাসের একদিন ভাগীরথী খান সেনাদের নিমন্ত্রণ করলো তার নিজ গ্রামে। এদিকে মুক্তিবাহিনীকেও তৈরি রাখা হল যথারীতি। ৪৫ জন খানসেনা সেদিন হাসতে হাসতে বাঘমারা কদমতলা এসেছিলো কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকজনই ফিরতে পেরেছিলো।

এরপর আর ভাগীরথী ওদের ক্যাম্পে যায় নি। ওরা বুঝেছে এটা তারই কীর্তি। কীর্তিমানরা তাই হুকুম দিলো জীবিত অথবা মৃত ভাগীরথীকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

কিন্তু ভাগীরথী তখনও জানতো না ওর জন্য আরও দুঃসহ ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে। একদিন রাজাকারদের হাতে ধরা পরলো ভাগীরথী। তাকে নিয়ে এল পিরোজপুর সামরিক ক্যাম্পে। খান সেনাদের এবার ভাগীরথীর উপর হিংস্রতার পরীক্ষার আয়োজন করলো। এক হাটবারে তাকে শহরের রাস্তায় এনে দাঁড় করানো হলো জনবহুল চৌমাথায়। সেখানে প্রকাশ্যে তার অঙ্গাবরণ খুলে ফেললো কয়েকজন খান সেনা। তারপর দু'গাছি দড়ি ওর দুপায়ে বেঁধে একটি জীপে বেঁধে জ্যান্ত শহরের রাস্তায় টেনে বেড়ালো ওরা মহাউৎসবে। ঘণ্টা খানিক রাজপথ পরিক্রমায় পর আবার যখন ফিরে এলো সেই চৌমাথায় তখনও ওর দেহে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে।

এবার তারা দুটি পা দুটি জীপের সাথে বেঁধে নিল এবং জীপ দুটিকে চালিয়ে দিল বিপরীত দিকে। ভাগীরথী দু ভাগ হয়ে গেল। সেই দুভাগে দুই জীপে আবার শহর

পরিক্রমা শেষ করে জল্লাদ খানরা আবার ফিরে এলো সেই চৌমাথায় এবং সেখানেই ফেলে রেখে গেল ওর বিকৃত মাংসগুলো। একদিন দুদিন করে মাংসগুলো ঐ রাস্তার মাটির সাথেই একাকার হয়ে গেল এক সময়। বাংলা মায়ের ভাগীরথী এমনি ভাবেই আবার মিশে গেলো বাংলার ধূলিকণার সাথে।"

তিন.

নাহ আমাদের ভাগীরথী কোনো পদক পান নাই ন্যান্সি ওয়েকের মত।